পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন

শান্তিময় চট্টোপাধ্যায় মনোজ দত্ত অশোক সিংহ

বিজ্ঞান পরিচয়

নবম শ্রেণী

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ অনুমোদিত পাঠক্রম অনুযায়ী
নবম শ্রেণীর জন্য লিখিত।

বিজ্ঞান পরিচয় গ্রন্থমালা

পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন

৩
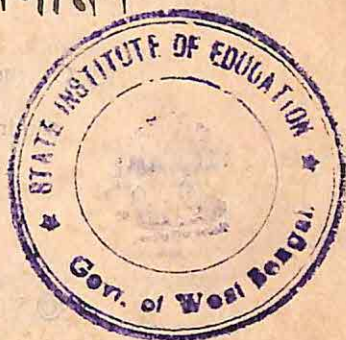
শান্তিময় চট্টোপাধ্যায়
এম্. এস্-সি, পি. আর. এস্., ডি. ফিল্

মনোজ দত্ত
বি. এস্-সি., এম্. এ, বি. টি

অশোক সিংহ
এম্. এস্-সি

কলকাতা
অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস
দিল্লী বোম্বাই মাদ্রাজ
১৯৭৫

PADARTHAVIDYA O RASAYAN 3 (Bengali)

(Physics and Chemistry)

by

Santimay Chattopadhyay, Manoj Datta and Asok Sinha

First published 1974
Second edition 1975

প্রচ্ছদ : রামকৃষ্ণ দত্ত
ছবি এঁকেছেন : রঞ্জন কুণ্ডু

Printed in India by letterpress by P. C. Roy at Sonnet Printing Works, 19, Goabagan Street, Calcutta 6, and Published by C. H. Lewis, Oxford University Press, Faraday House, P-17 Mission Row Extension, Calcutta 13.

ভূমিকা

স্কুলের সর্বস্তরের ছাত্রদের জন্য বিজ্ঞান পাঠ ১৯৭৪ সাল থেকে আবশ্যিক বিষয় বলে গণ্য হয়েছে। বিজ্ঞানকে কেবল জীবিকা নির্বাহের উপায় মনে না করে সাধারণ শিক্ষার অঙ্গ হিসেবে গণ্য করা উচিত। এটাই আধুনিক শিক্ষাবিদদের দৃঢ় ধারণা। জাতীয় পর্যায়েও এই নীতি স্বীকৃত। বিজ্ঞান যে জীবনযাত্রার সঙ্গে সম্পর্করহিত ক্লাসে পড়ার বিষয়মাত্র নয় এই ধারণার উপর ভিত্তি করে নতুন বিজ্ঞান পাঠক্রম রচিত হয়েছে। নতুন পাঠক্রম ও নতুন দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করে এই বই লেখার চেষ্টা করা হয়েছে।

ছাত্রদের বোঝার সুবিধের জন্য এই বইয়ের ভাষা কথ্য এবং যত দূর সম্ভব পরোক্ষ উক্তিবর্জিত রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। এক্সপেরিমেন্টগুলিও প্রাত্যহিক জীবন থেকে নেওয়া। যত দূর সম্ভব বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সর্বাধুনিক মতামতগুলি উপস্থাপিত করা হয়েছে। এককের ক্ষেত্রে আমরা আন্তর্জাতিক ভাবে স্বীকৃত এস আই ইউনিট ব্যবহার করেছি।

বইটি ক্লাসে পড়ানোর উপযোগী হয়েছে কিনা তার বিচার শিক্ষক মহাশয়রাই করবেন। তাঁদের মতামত সাদরে গৃহীত হবে।

কলকাতা
১লা জানুয়ারী ১৯৭৪

শান্তিময় চট্টোপাধ্যায়
মনোজ দত্ত
অশোক সিংহ

সূচীপত্র

১ মাপের পদ্ধতি

প্রতিদিনই বিভিন্ন কারণে নানা ধরনের মাপের প্রয়োজন হয়। জামা তৈরি করাতে জানতে হয় কতটা কাপড় লাগবে, জিনিস কিনতে দরকার হয় ওজনের, ইস্কুলে বা অফিসে যাওয়ার আগে বার বার সময় দেখতে হয়। অনেক সময় বলা হয়, কাপড়টা দেড় হাত লম্বা বা দোকানটা বিশ পা দূরে। কিন্তু তাতে মাপ ঠিকমত বোঝা যায় না। কার হাত বা কার পায়ের সমান লম্বা ? তেমনি ইট বা পাথর দিয়ে ওজন করা বা আন্দাজে সময় মাপা চলে না। বিজ্ঞান সব সময়েই চায় সঠিক মাপ।

রাশি কী ?

মাপ শুরু করার আগে জানা দরকার রাশি কাকে বলে। যা মাপা সম্ভব তাকেই রাশি বা সঠিকভাবে **ভৌত রাশি** বা ফিজিকাল কোয়াণ্টিটি বলে। একটা পেন্সিল নাও। দেখ এর দৈর্ঘ্য স্কেল দিয়ে মাপা সম্ভব। দৈর্ঘ্য একটি ভৌত রাশি। তেমনি এর ওজন দাঁড়িপাল্লা বা নিক্তি দিয়ে মাপতে পারবে। ওজনও তাহলে একটি ভৌত রাশি। সময়ও একটি ভৌত রাশি, কারণ সময় ঘড়ি দিয়ে মাপা যায়। পরে এ ধরনের অনেক রাশির নাম শুনতে পাবে।

ভৌত রাশিকে দু ভাগে ভাগ করা হয়—স্কেলার রাশি ও ভেক্টর রাশি। যে সব রাশির মান আছে কিন্তু মানটি কোন নির্দিষ্ট দিকের উপর নির্ভর করে না তাদের বলা হয় **স্কেলার রাশি**। যেমন কোন বস্তুর দৈর্ঘ্য, ক্ষেত্রফল, আয়তন বা ভর জানতে হলে দিকের কোন প্রশ্ন ওঠে না। যাদের মান আছে ও মান নির্দিষ্ট দিকের উপর নির্ভরশীল তাদের বলে **ভেক্টর রাশি**। কোন চলমান বস্তুর গতিবেগ বলতে বস্তুটি প্রতি সেকেণ্ডে কোন একটি নির্দিষ্ট দিকে কত দূরত্ব যাচ্ছে বোঝায়। তাই গতিবেগ একটি ভেক্টর রাশি। বস্তুর ওজনও একটি ভেক্টর রাশি। কেননা, ওজন বলতে বস্তুর উপর পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে আকর্ষণের পরিমাণ বোঝায়। স্কেলার ও ভেক্টর রাশির পার্থক্য আরো ভালভাবে জানবার সুযোগ পরে পাবে।

মাপের একক

প্রায়ই শুনে থাকবে কোন লোকের উচ্চতা দেড় মিটার বা পেন্সিলটি দশ সেন্টিমিটার। তেমনি এক কিলোগ্রাম মাছ বা পাঁচ কিলোগ্রাম আলু বাড়িতে কিনে আনার কথাও শুনেছ। তাহলে মিটার কী ? কিলোগ্রামই বা কাকে বলে ?

যখন পাঁচ কিলোগ্রাম আলুর কথা শুনছ তখন নিশ্চয় বুঝতে পারছ যে কিলোগ্রাম হল ওজনের একটি নির্দিষ্ট মাপ আর আলুর পরিমাণ এই কিলোগ্রাম ওজনের পাঁচ গুণ। দৈর্ঘ্যের বেলায় একই কথা খাটে। তাহলে যে কোন ভৌত রাশির মান জানতে হলে সেই রাশির একটি সুবিধাজনক নির্দিষ্ট মাপের দরকার এবং সেই সুবিধাজনক নির্দিষ্ট মাপকে সেই রাশির **একক** বা **ইউনিট** বলে।

প্রাথমিক একক ও লব্ধ একক

প্রতিটি রাশিরই একক আছে। দৈর্ঘ্য একটি রাশি যার এককের নাম মিটার। ভরের একক কিলোগ্রাম। সময়ের একক সেকেণ্ড। পদার্থবিদ্যায় এমন কয়েক শত রাশি আছে। দেখা গেছে, সমস্ত রাশির একক কয়েকটি রাশির এককের উপর নির্ভর করে। কিন্তু এই রাশিগুলির একক একে অন্যের সম্পর্কহীন। এই রাশিগুলির একককে বলা হয় **প্রাথমিক একক** বা ফাণ্ডামেণ্টাল ইউনিট ; দৈর্ঘ্য, ভর ও সময় হচ্ছে প্রাথমিক একক। অন্য অনেক রাশির একক এই তিনটি রাশির এককের উপর নির্ভর করে। তাই তাদের বলে **লব্ধ একক** বা ডিরাইভ্‌ড্‌ ইউনিট।

প্রাথমিক এককের বিভিন্ন পদ্ধতি

গত কয়েক শত বছর ধরে নানান দেশে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের প্রাথমিক একক পদ্ধতির ব্যবহার প্রচলিত আছে। যেমন ইংলণ্ডে ও তার প্রভাবে সমস্ত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে ব্যবহার হত ফুট-পাউণ্ড-সেকেণ্ড বা এফ পি এস পদ্ধতি। আবার ফ্রান্সে এবং অধিকাংশ ইউরোপীয় দেশগুলিতে ব্যবহার হত সেন্টিমিটার-গ্রাম-সেকেণ্ড বা সি জি এস পদ্ধতি। আমাদের দেশে ব্রিটিশ আমলে ফুট-পাউণ্ড-সেকেণ্ড এবং তার সঙ্গে আমাদের নিজেদের পদ্ধতি বিশেষ করে হাত, কাঠা, সের প্রভৃতি এককগুলি প্রচলিত ছিল। দেশ স্বাধীন হবার পর 1961 সাল

থেকে আমাদের দেশে মাপের জন্য মেট্রিক পদ্ধতি ও টাকা পয়সার জন্য দশমিক পদ্ধতি চালু হয়েছে।

(1) **মেট্রিক একক পদ্ধতি :** ফরাসী বিপ্লবের সময় প্যারি শহরে 1791 খ্রীস্টাব্দে লাগ্রাঁজ, লাপলাস প্রমুখ কয়েকজন প্রখ্যাত বিজ্ঞানী মাপ পদ্ধতির সংস্কারের জন্য ফ্রেঞ্চ আকাদেমিতে এক প্রস্তাব করেন। সেই প্রস্তাব অনুযায়ী সে দেশে মেট্রিক একক পদ্ধতি চালু হয়। মেট্রিক পদ্ধতিতে দৈর্ঘ্যের একক মিটার, ভরের একক গ্রাম, এবং সময়ের একক সেকেণ্ড। এই পদ্ধতির এককগুলির গুণিতক বা ভগ্নাংশগুলি প্রাথমিক এককের দশগুণ বা দশভাগ। হিসাবের সুবিধার জন্য এই পদ্ধতি বর্তমানে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রচলিত। মেট্রিক পদ্ধতিতে তিনটি বিশিষ্ট ধারার চলন আছে।

(i) **সি জি এস একক পদ্ধতি**—এটি সবচেয়ে প্রচলিত পদ্ধতি। সি জি এস পদ্ধতিতে দৈর্ঘ্যের একক সেন্টিমিটার। সেন্টিমিটার এক মিটারের একশো ভাগের এক ভাগ। এই পদ্ধতিতে ভরের একক গ্রাম ও সময়ের একক সেকেণ্ড। সি জি এস পদ্ধতিতে তড়িৎবিদ্যায় বিভিন্ন রাশির পরিমাপের জন্য তিনটি ভিন্ন একক প্রচলিত আছে। এগুলি হচ্ছে—(ক) সি জি এস ইলেকট্রো-ম্যাগনেটিক একক, (খ) সি জি এস ইলেকট্রোস্ট্যাটিক একক এবং (গ) ব্যবহারিক একক বা প্র্যাকটিকাল ইউনিট। একই রাশির পরিমাপের জন্য তিনটি আলাদা একক চালু থাকায় বেশ অসুবিধার সৃষ্টি হয়।

(ii) **এম কে এস এ পদ্ধতি বা জর্জি পদ্ধতি**—উপরে লিখিত অসুবিধা দূর করার জন্য অধ্যাপক জর্জি এক নতুন পদ্ধতির প্রচলন করেন। এই পদ্ধতিকে এম কে এস এ বা জর্জি পদ্ধতি (M K S A বা Georgi unit) বলে। 1938 খ্রীস্টাব্দে এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে এই পদ্ধতি বিজ্ঞানীরা গ্রহণ করেন। এই পদ্ধতিতে দৈর্ঘ্যের একক মিটার, ভরের একক কিলোগ্রাম, সময়ের একক সেকেণ্ড এবং তড়িৎ প্রবাহের একক অ্যাম্পিয়র। সি জি এস ব্যবহারিক পদ্ধতিতে অ্যাম্পিয়রের যে মান প্রচলিত ছিল এখানেও সেই মান ধরা হয়।

(iii) **এস আই একক**—এম কে এস এ পদ্ধতিতে ব্যবহৃত এককগুলি যেমন দৈর্ঘ্যের জন্য মিটার, ভরের জন্য কিলোগ্রাম, সময়ের জন্য সেকেণ্ড ও তড়িৎ প্রবাহের জন্য অ্যাম্পিয়র ছাড়া আরও তিনটি রাশির প্রাথমিক এককের

প্রয়োজন হয়—দীপন শক্তির এককের জন্য **ক্যাণ্ডেলা,** তাপমাত্রার জন্য **কেলভিন** এবং বস্তুর পরিমাণ বোঝাতে **মোল**। 1967 সালে বিজ্ঞানীদের এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যে পদ্ধতি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় তার নাম আন্তর্জাতিক একক পদ্ধতি বা এস আই একক পদ্ধতি (ফরাসীতে Le Système International d'Unités)। ভারত এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেছিল। এখনও ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে সবগুলি একক পদ্ধতি ব্যবহার হয়। তবে চেষ্টা হচ্ছে সবদেশেই একেবারে স্কুল থেকে এস আই একক ব্যবহার করার।

(2) **ব্রিটিশ পদ্ধতি বা এফ পি এস পদ্ধতি :** এই পদ্ধতিতে দৈর্ঘ্যের একক ফুট, ভরের একক পাউণ্ড ও সময়ের একক সেকেণ্ড। ইংল্যাণ্ড ও অন্য কয়েকটি দেশে এই পদ্ধতি চলে। আমাদের দেশে বেসরকারী ক্ষেত্রে আংশিকভাবে এই পদ্ধতি চালু আছে।

বিভিন্ন পদ্ধতিতে প্রাথমিক একক

(1) **মেট্রিক পদ্ধতি :** (i) **মিটার**—মেট্রিক পদ্ধতিতে দৈর্ঘ্যের একক মিটার। ফরাসী ভাষায় মিটারের অর্থ মাপ। 1791 খ্রীস্টাব্দে ফরাসী আকাদেমির প্রস্তাব অনুযায়ী মিটারের প্রথম সংজ্ঞা দেওয়া হয়। ফ্রান্সের রাজধানী প্যারি শহরের ভিতর দিয়ে যে দ্রাঘিমা রেখা উত্তরমেরুর দিকে গিয়েছে, পৃথিবীর বিষুবরেখা থেকে সেই দ্রাঘিমা বরাবর উত্তরমেরুতে যেতে যে দূরত্ব অতিক্রম করতে হবে তার এক কোটি ভাগের এক ভাগকে বলা হয় এক মিটার। দৈর্ঘ্যের এই এককের ব্যবহারিক সুবিধার জন্য 1799 খ্রীস্টাব্দে প্ল্যাটিনমের একটি প্রামাণিক দণ্ড বা স্ট্যাণ্ডার্ড তৈরি করা হয়। পরে অবশ্য দেখা যায় যে বিষুবরেখা থেকে উত্তরমেরুর দূরত্ব এই মিটারের এক কোটি গুণের চেয়েও কিছু বেশি। তখন এই ভুল শোধরান আর সম্ভব ছিল না কারণ মিটার ততদিনে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়ে গেছে। 1875 খ্রীস্টাব্দে ইন্টারন্যাশনাল ব্যুরো অফ ওয়েট্স্ এ্যাণ্ড মেজার্স্ প্রতিষ্ঠিত হয় প্যারির কাছে সেভরেতে। প্ল্যাটিনম ও ইরিডিয়মের এক সংকর ধাতুর (প্ল্যাটিনম 90% ও ইরিডিয়ম 10%) তৈরি দণ্ডকে বরফের গলনাঙ্কে প্রমাণ বায়ুচাপে রেখে তার দুই প্রান্তের দুইটি দাগের মধ্যের ব্যবধানকে **প্রমাণ মিটার** হিসেবে ধরা হয়েছে। এটিই আন্তর্জাতিক প্রমাণ মিটার। সদস্য রাষ্ট্রগুলিকে এর এক-একটি নকল

দেওয়া হয়েছে। ভারতের প্রমাণ মিটার নতুন দিল্লীর ন্যাশনাল ফিজিকাল ল্যাবরেটরিতে আছে।

বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অনেক সময় সূক্ষ্ম মাপের প্রয়োজন পড়ে। দৈর্ঘ্য কত সূক্ষ্মভাবে মাপা সম্ভব ? সূক্ষ্ম মাপের জন্য মিটারের এক নতুন আন্তর্জাতিক সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্যের হিসাবে। এই সংজ্ঞা অনুযায়ী 'এক মিটার বায়ুশূন্য স্থানে 86 পারমাণবিক ভরসংখ্যাসম্পন্ন ক্রিপটন পরমাণুর দুটি বিশিষ্ট শক্তিস্তরের মধ্যে বিকিরিত কমলা রশ্মির তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের 1 650 763·73 গুণের সমান'।

(ii) **গ্রাম**—সি জি এস পদ্ধতিতে ভরের একক গ্রাম। দেখা গেছে 4°C উষ্ণতায় এক ঘন সেন্টিমিটার জলের ওজন এক গ্রাম। এম কে এস এ ও এস আই পদ্ধতিতে ভরের একক কিলোগ্রাম। এক কিলোগ্রাম এক গ্রামের হাজার গুণ। কিলোগ্রামের আন্তর্জাতিক মানটি ইণ্টারন্যাশনাল ব্যুরো অফ ওয়েটস অ্যাণ্ড মেজারসের দপ্তরে রাখা আছে। প্লাটিনম ও ইরিডিয়মের সংকর ধাতু বা স্টেনলেস স্টীলের তৈরি নকল কিলোগ্রাম ভিন্ন ভিন্ন দেশে রাখা আছে। মূল কিলোগ্রামের সঙ্গে নকলের ভর একেবারে এক। ভুলের পরিমাণ দশ কোটি ভাগের এক ভাগ। ভারতের নকল কিলোগ্রামটি রাখা আছে ন্যাশনাল ফিজিকাল ল্যাবরেটরিতে। প্রমাণ মিটার ও কিলোগ্রামের ছবি 1.1 চিত্রে দেখান হল।

চিত্র 1.1
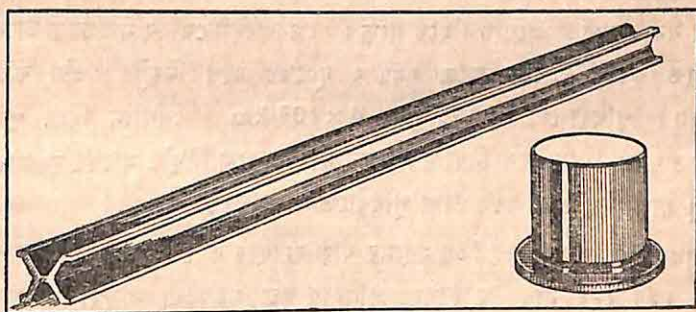
(iii) **সেকেণ্ড**—সময়ের একক সেকেণ্ড। ব্রিটিশ ও মেট্রিক সবরকম পদ্ধতিতেই সেকেণ্ড ব্যবহার করা হয়।

সাধারণত এক সূর্যাস্ত থেকে আর এক সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময়কে বলা হয় এক

দিন। এই দিনকে 24 ভাগ করলে এক ভাগকে বলে ঘণ্টা। এক ঘণ্টার 60 ভাগকে এক মিনিট ও এক মিনিটের 60 ভাগকে এক সেকেণ্ড বলে। এক সেকেণ্ড এক দিনের $\frac{1}{86400}$ অংশ। লক্ষ্য করা গেছে যে বছরের সব দিন সমান হয় না। এই অসুবিধা দূর করার জন্য 1960 সালে এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে ক্রান্তীয় বছরের হিসাবে সময় গণনার প্রস্তাব নেওয়া হয়। মহাবিষুব বিন্দু থেকে নিজ কক্ষপথে যাত্রা করে সূর্যের মহাবিষুব বিন্দুতে ফিরে আসতে যে সময় লাগে তাকে এক ক্রান্তীয় বছর বলে। এক সেকেণ্ড হচ্ছে এক ক্রান্তীয় বছরের 1/315 569 259 747 অংশ।

1956 সালে পারমাণবিক ঘড়ি আবিষ্কার হয়। এই ঘড়িতে অতি সূক্ষ্মভাবে সময় জানা যায়। 133 পারমাণবিক ভরসংখ্যাবিশিষ্ট সিজিয়ম-পরমাণু থেকে 9 192 631 770 তরঙ্গ বার হতে যে সময় লাগে তা এক সেকেণ্ডের সমান। এটাই বর্তমানে সেকেণ্ডের স্বীকৃত সংজ্ঞা।

এই বড় বড় সংখ্যাগুলি মুখস্থ করার দরকার নেই।

তোমাদের মনে হতে পারে যে এত সূক্ষ্মভাবে দৈর্ঘ্য বা এত সূক্ষ্মভাবে সময় মাপার প্রয়োজন কি ? সাধারণত আমরা ঘড়িতে এক সেকেণ্ডের কম সময় দেখতে পারি না এবং সাধারণ ক্ষেত্রে মিলিমিটারের ছোট মাপের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু বিজ্ঞানের অনেক ক্ষেত্রে অতি সূক্ষ্মভাবে দৈর্ঘ্য, ভর ও সময়ের মাপের দরকার হয়ে পড়ে। কোন কোন ক্ষেত্রে কোটি কোটি ভাগেরও এক ভাগের সমান সূক্ষ্মতা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। ভেবে দেখ যে সব নভশ্চররা চাঁদে যাতায়াত করেন তাঁদের ক্ষেত্রে সময় বা দূরত্বের মাপ নিখুঁত হওয়া কত প্রয়োজন। পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরত্ব 4×10^5 km। সেখানে গিয়ে পূর্ব নির্ধারিত সময়ে ফিরে এসে নির্ধারিত স্থানে নামতে হলে নিখুঁত মাপের দরকার বৈকি ! মাপ নিখুঁত না হলে তাঁরা পৃথিবীতে নাও ফিরতে পারেন।

আমরা প্রত্যেকেই ভিন্ন ভিন্ন ধরনের ঘড়ি ব্যবহার করি। তার কোনটাই নির্ভুল সময় দেয় না। তাই সময় জানবার জন্য সরকারী ব্যবস্থা আছে। দিল্লীতে ন্যাশনাল ফিজিকাল ল্যাবরেটরিতে যে পারমাণবিক ঘড়ি আছে তা থেকে প্রতিদিন রাত ন'টার সময় রেডিওর মাধ্যমে সংকেত পাঠানো হয়— পিপ্ পিপ্ পিপ্। ভারতবর্ষের যে কোন স্থান থেকে রেডিও শুনে তোমরা ঘড়ি মিলিয়ে নিতে পার।

(2) **ব্রিটিশ পদ্ধতি :** (i) **ফুট**—ব্রিটিশ বা এফ পি এস পদ্ধতিতে দৈর্ঘ্যের একক ফুট। ফুট এক গজের তিন ভাগের এক ভাগ। লণ্ডনের স্ট্যাণ্ডার্ড ডিপার্টমেণ্ট অফ দি বোর্ড অফ ট্রেডে 62°F তাপমাত্রায় রাখা একটি ব্রোঞ্জের তৈরি দণ্ডের দুই প্রান্তের দুটি দাগের মধ্যের ব্যবধানকে এক গজ বলা হয়। ছোট বা বড় মাপের জন্য গজের ভগ্নাংশ বা গুণতকগুলি তোমরা জান এবং সেগুলি মেট্রিক প্রথার মত দশ বা অন্য কোন নির্দিষ্ট সংখ্যা দিয়ে ভাগ বা গুণ করে পাওয়া যায় না। মেট্রিক প্রথার সঙ্গে ইঞ্চি বা ফুটের সম্পর্ক : 1 ইঞ্চি = 2.54 সেন্টিমিটার ; 1 ফুট = 30.48 সেন্টিমিটার।

(ii) **পাউণ্ড**—এফ পি এস পদ্ধতিতে ভরের একক পাউণ্ড। প্রমাণ পাউণ্ড প্ল্যাটিনমের তৈরি একটি স্তম্ভ, লণ্ডনের স্ট্যাণ্ডার্ড ডিপার্টমেণ্ট অফ দি বোর্ড অফ ট্রেডে রাখা আছে। পাউণ্ডের ছোট বড় মাপ তোমাদের নিশ্চয় জানা আছে। মনে রেখো 1 পাউণ্ড = 453.59 গ্রাম।

(iii) **সেকেণ্ড**—ব্রিটিশ ও মেট্রিক উভয় পদ্ধতিতেই সময়ের একক সেকেণ্ড।

রাশি ও প্রাথমিক এককের প্রতীক

বিভিন্ন পদ্ধতিতে ব্যবহৃত রাশি ও প্রাথমিক এককের প্রতীক চিহ্ন নিচে দেওয়া হল। ভৌত রাশির প্রতীক লেখা হয় ইটালিকস হরফে (হেলান) এবং একক রোমান হরফে (খাড়া)।

রাশি	রাশির প্রতীক চিহ্ন	সি জি এস		এম কে এস এ		এস আই	
		একক	এককের প্রতীক চিহ্ন	একক	এককের প্রতীক চিহ্ন	একক	এককের প্রতীক চিহ্ন
দৈর্ঘ্য	l	সেন্টিমিটার	cm	মিটার	m	মিটার	m
ভর	m	গ্রাম	g	কিলোগ্রাম	kg	কিলোগ্রাম	kg
সময়	t	সেকেণ্ড	s	সেকেণ্ড	s	সেকেণ্ড	s
তড়িৎপ্রবাহ	I			অ্যাম্পিয়র	A	অ্যাম্পিয়র	A
তাপমাত্রা	T					কেলভিন	K
দীপনশক্তি	I_v					ক্যাণ্ডেলা	cd
বস্তুর পরিমাণ	n					মোল	mol

তড়িৎ প্রবাহ, দীপনশক্তি ও বস্তুর পরিমাণের কথা তোমরা পরে জানবে। তাপমাত্রার বিষয় জান। লক্ষ্য কর—(1) কেলভিনের প্রতীক K হবে, °K হবে না। তাপমাত্রার একক হিসেবে যদিও বিজ্ঞানীরা কেলভিন ব্যবহার পছন্দ করেন তবু এখনও ডিগ্রি সেলসিয়াস (°C) সর্বত্র প্রচলিত। আবার ডাক্তারদের থার্মোমিটারে ডিগ্রি ফারেনহাইট (°F) প্রচলিত। মনে রেখো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড কথাটি এখন আর চলে না। (2) সেন্টিমিটার, মিলিমিটার প্রভৃতির প্রতাক cm, mm ইত্যাদি হবে, c. m বা m. m হবে না। (3) কোন এককের বহুবচনে s যোগ হবে না। অর্থাৎ cms, mms, kgs হবে না।

মেট্রিক পদ্ধতিতে ভগ্নাংশ ও গুণিতক

মেট্রিক পদ্ধতিতে কোন এককের গুণিতক ও ভগ্নাংশগুলিকে দশের ঘাতে দেখান হয়। নিচে গুণিতক ও ভগ্নাংশগুলি দেখান হল। মূল এককের নামের আগে এগুলি বসিয়ে এককটি প্রকাশ করা হয়, যথা—সেন্টিমিটার, সেন্টিগ্রাম বা মিলিমিটার, মিলিগ্রাম ইত্যাদি।

গুণিতক বা ভগ্নাশের নাম	প্রতীক	দশের ঘাতে সংখ্যাটি	গুণিতক বা ভগ্নাংশের নাম	প্রতীক	দশের ঘাতে সংখ্যাটি
টেরা (tera)	T	10^{12}	সেন্টি (centi)	c	10^{-2}
গিগা (giga)	G	10^{9}	মিলি (mili)	m	10^{-3}
মেগা (mega)	M	10^{6}	মাইক্রো (micro)	μ	10^{-6}
কিলো (kilo)	k	10^{3}	নানো (nano)	n	10^{-9}
হেক্টো (hecto)	h	10^{2}	পিকো (pico)	p	10^{-12}
ডেকা (deca)	da	10	ফেমটো (femto)	f	10^{-15}
ডেসি (deci)	d	10^{-1}	অটো (atto)	a	10^{-18}

সাধারণ স্কেল ও তার ব্যবহার

মিটার স্কেল তোমরা দেখেছ। এবার স্কেল নিয়ে কেমন করে মাপবে দেখ। যে বস্তুটি মাপবে তার এক প্রান্ত স্কেলটির শূন্য দাগের সঙ্গে মেলাও ও স্কেলটিকে সোজা ভাবে বস্তুটির গায়ে বসাও। বস্তুর অন্য প্রান্তটি স্কেলের কোন দাগের সঙ্গে মিলেছে দেখ। ধর, দশটি বড় দাগ পার হয়ে চারটি ছোট দাগের সঙ্গে মিলেছে। বস্তুটির দৈর্ঘ্য হল 10 cm ও 4 mm অর্থাৎ 10.4 cm।

স্কেলের চেয়ে বড় দৈর্ঘ্য মাপার জন্য মেজারিং টেপ, সার্ভেয়ারের চেন প্রভৃতি ব্যবহার করা হয়। দর্জিরা কাপড় মাপতে ফিতে ব্যবহার করেন। তোমরা নিশ্চয়ই দর্জির মাপবার ফিতে দেখেছ।

মাপের সম্ভাব্য ভুল

যে কোন মাপে ভুল থাকা স্বাভাবিক। যে স্কেলটি নিয়ে তুমি মাপ নাও, দীর্ঘদিনের ব্যবহারে তার দুই প্রান্ত ক্ষয়ে গেলে শূন্য দাগটি বোঝা যায় না। ফলে মাপে ভুল হবে। আবার স্কেলটির আঁকা দাগগুলো সমান নাও হতে পারে। সেক্ষেত্রে যে কোন মাপে ভুল হবে। এই ধরনের ভুলকে **যান্ত্রিক ত্রুটি** বা ইন্‌স্ট্রুমেণ্টাল এরর বলে।

স্কেলটি বস্তুটির গায়ে ঠিকভাবে না বসালে ভুল মাপ আসবে। যে কোন বস্তুর দৈর্ঘ্য মাপতে হলে স্কেলের এক প্রান্ত বস্তুটির প্রান্তের সঙ্গে মিলিয়ে স্কেলটি
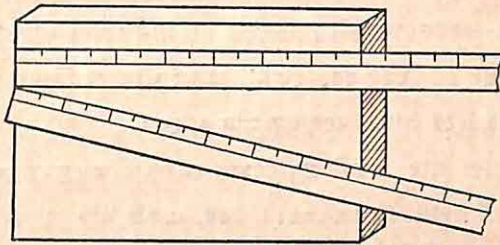
চিত্র 1.2

বস্তুর দৈর্ঘ্য বরাবর বসাতে হয় (চিত্র 1.2)। এভাবে না বসিয়ে স্কেলটি ইচ্ছামত বসালে মাপে ভুল হবে।

চিত্র 1.3

স্কেলে রিডিং নেবার সময় চোখ দাগের ঠিক উপরে রাখবে। না রাখলে ভুল হতে পারে (চিত্র 1·3)। এই ভুল দূর করার জন্য অনেক স্কেলের এক প্রান্ত ক্রমশ ঢালু করা হয়। এতে মাপবার বস্তুটির তল ও স্কেলের দাগ অনেকটা কাছে এসে পড়ে। ফলে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা কমে যায়। এই ধরনের স্কেলকে **বেভেল্‌ড স্কেল** বলে।
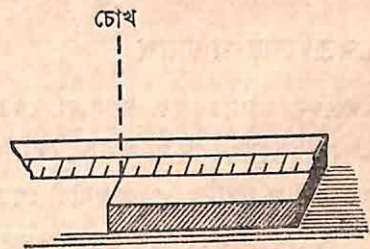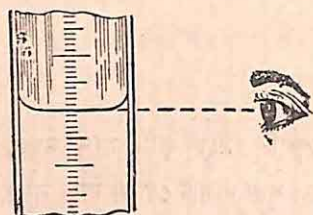
মেজারিং সিলিণ্ডার বা মাপবার চোঙে জলের উচ্চতা মাপার সময় ভুল হতে পারে (চিত্র 1.4)। নিশ্চয় লক্ষ্য করেছ, জলের উপর তল অবতল। কেন অবতল পরে জানবে। জলের উচ্চতা মাপার সময় জলের নিম্নভাগের সঙ্গে তোমার চোখ একই তলে রাখবে। পারদের বেলায় উল্টো। ব্যারোমিটারে পারদের উচ্চতা মাপার সময় পারদের উত্তল তলের সবচেয়ে উঁচু অংশের মাপ নিতে হবে।

চিত্র 1.4

শেষের ভুলগুলি হয় অসাবধানতায়। এগুলিকে **ব্যক্তিগত ত্রুটি** বা পার্সোনাল এরর বলে।

এই ব্যক্তিগত ভুল সকলেরই হতে পারে। এইজন্য যে কোন মাপ একবার না নিয়ে বেশ কয়েকবার নিয়ে তাদের গড় মান অথবা অ্যাভারেজ বা মীন ভ্যালু নেওয়া ভাল। যেমন ধর, কোন রিডিং পাঁচবার নিয়েছ। সব কয়টি যোগফলকে পাঁচ দিয়ে ভাগ করলে গড় মান পাবে।

ভুল এড়াবার আর একটি উপায় মাপ নেওয়ার আগে চোখের আন্দাজে মাপ সম্বন্ধে একটি ধারণা করে নেওয়া। ধর, একটি বই-এর দৈর্ঘ্য মাপবে। মাপার আগে কত সেন্টিমিটার মাপ হতে পারে চোখের আন্দাজে ধারণা করে নাও। পরে স্কেল বসিয়ে মেপে নাও। মাপের সঙ্গে তোমার ধারণার তফাৎ কতটা খেয়াল রাখবে।

ক্ষেত্রফলের পরিমাপ

ক্ষেত্রফল মাপার জন্য আলাদা কোন যন্ত্র সাধারণত ব্যবহার করা হয় না। ক্ষেত্রটির দৈর্ঘ্য, প্রস্থ বা উচ্চতা, গোলক বা শংকুর ক্ষেত্রে ব্যাস ইত্যাদি মাপা হয় এবং জ্যামিতির সূত্র অনুযায়ী ক্ষেত্রফল বার করা হয়।

কয়েকটি সুষম ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল দেওয়া হল—বর্গক্ষেত্র = (দৈর্ঘ্য $)^2$; আয়তক্ষেত্র = দৈর্ঘ্য $\times$ প্রস্থ ; ত্রিভুজ = $\frac{1}{2}$ ভূমি $\times$ উচ্চতা ; বৃত্ত = $\frac{\pi}{4}$ (ব্যাস$)^2$, চোঙ = π ব্যাস $\times$ উচ্চতা, গোলক = π (ব্যাস $)^2$ ।

ক্ষেত্রফল একটি ভৌত রাশি। A অথবা S প্রতীক চিহ্ন দিয়ে প্রকাশ করা হয়। ক্ষেত্রফলের একক হবে m^2, cm^2 ইত্যাদি দৈর্ঘ্যের এককের বর্গ। ক্ষেত্রফলের এককগুলির ক্ষেত্রে অনেক সময় একক চিহ্নের আগে sq বসিয়ে লেখা হয়, যেমন m^2 একককে sq m লেখা হয়।

অসম ক্ষেত্রের বেলায় ক্ষেত্রটিকে কয়েকটি বর্গক্ষেত্র বা আয়তক্ষেত্র বা ত্রিভুজ ইত্যাদিতে ভাগ করে প্রত্যেকটির ক্ষেত্রফল যোগ করে পেতে হয়।

কোন ছোটখাট অসম আকৃতির ক্ষেত্রফল মাপতে হলে ছক কাগজের (স্কোএর পেপার) সাহায্যে মাপা হয়। মনে কর একটি গাছের পাতার ক্ষেত্র মাপবে। একটি ছক কাগজের উপর পাতাটি রেখে তার বাইরের সীমারেখা টেনে নাও (চিত্র 1.5)। ছক কাগজের একটি ছোট ঘরের ক্ষেত্রফল দেখে মোট কয়টি পূর্ণ ঘর আছে গুণে নাও। একটি ছোট ঘরের ক্ষেত্রফল সাধারণত $1mm^2$ হয়। পরে আংশিক পূর্ণ কতগুলি ঘর আছে হিসেব কর। দুটি অর্ধেক পূর্ণ ঘরের জন্য একটি পূর্ণ ঘর এবং এক তৃতীয়াংশগুলির বেলায় তিনটি ঘরে এক ঘর নাও এবং মোট পূর্ণ ঘর কয়টি হবে দেখ। আরও ছোট ঘর আন্দাজে ধরতে হবে। এইভাবে পাওয়া মোট পূর্ণ ঘরগুলির ক্ষেত্রফল হচ্ছে পাতাটির ক্ষেত্রফল। এইভাবে মাপলে নির্ভুল মাপ পাবে না। অসম ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল মাপার জন্য প্লেনিমিটার নামক যন্ত্র গবেষণাগারে ব্যবহার হয়।
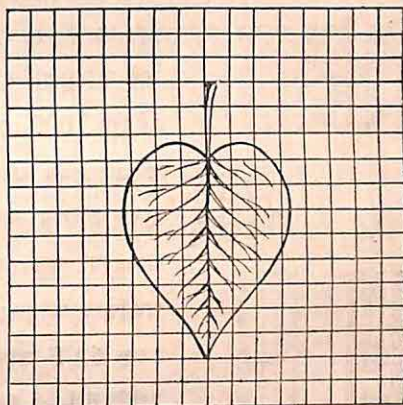
চিত্র 1.5

আয়তনের পরিমাপ

সুষম বস্তুর আয়তন মাপার জন্য দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতা, ব্যাস ইত্যাদি মেপে জ্যামিতিক সূত্র ব্যবহার করা হয়। যেমন ঘনকের আয়তন যে কোন বস্তুর

(দৈর্ঘ্য)^3। আয়তাকার ঘরের আয়তন দৈর্ঘ্য × প্রস্থ × উচ্চতা। একটি চোঙের আয়তন $\pi/4$ (ব্যাস)^2 × উচ্চতা এবং একটি গোলকের আয়তন $\pi/6$ × (ব্যাস)^3।

তরল পদার্থের আয়তন মাপের জন্য দাগ কাটা মাপবার চোঙ বা মেজারিং সিলিণ্ডার ব্যবহার করা হয়। এর প্রতিটি ঘরের জন্য নির্দিষ্ট আয়তন cc বা ঘন সেন্টিমিটারের দাগ থাকে।

আয়তন একটি ভৌত রাশি, V অক্ষর দিয়ে প্রকাশ করা হয়। আয়তনের সবচেয়ে প্রচলিত একক ঘন সেন্টিমিটার, প্রতীক cc। তরলের আয়তন মাপার জন্য আর একটি প্রচলিত এককের নাম লিটার, প্রতীক 1 অক্ষর।

$$1 \text{ লিটার} = 1000 \text{ cc}$$

আন্তর্জাতিক সংজ্ঞা অনুযায়ী এক লিটার হচ্ছে প্রমাণ চাপে ও 4°C উষ্ণতায় 1 kg বিশুদ্ধ জলের আয়তনের সমান। দেখা গিয়েছে এই আয়তন 1000.028 cc। এই তারতম্য এতই কম যে সাধারণ ব্যবহারে এক লিটার 1000 ccর সমান ধরা যায়। এক ccকে অনেক সময় এক মিলিলিটার বা ml লেখা হয় তরল মাপের সময়। বড় মাপের জন্য এক ঘন মিটার ব্যবহার করা হয়। $1\text{m}^3 = 10^6\text{cc}$। ব্রিটিশ পদ্ধতিতে আয়তনের এককের নাম গ্যালন। 1 গ্যালন হচ্ছে 62°F তাপ-মাত্রায় 10 পাউণ্ড বিশুদ্ধ জলের আয়তন। 1 গ্যালন = 4.546 লিটার।

চিত্র 1.6

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে আর একটি একক ব্যবহার হচ্ছে—**কিউসেক**। প্রতি সেকেণ্ডে এক ঘন-ফুট তরল-প্রবাহকে কিউসেক বলে। কিউসেক আয়তনের একক নয়।

ছোটখাট অসম বস্তুর আয়তন মাপবার চোঙের সাহায্যে মাপা যায়। বস্তুটি যদি চোঙের মুখের চেয়ে ছোট হয় তবে কোন চোঙে কিছু জল নিয়ে জলের আয়তন দেখ। পরে বস্তুটি জলে ডুবিয়ে জলের আয়তন দেখ (চিত্র 1.6)। দুইটি আয়তনের বিয়োগফল হচ্ছে বস্তুটির আয়তন।
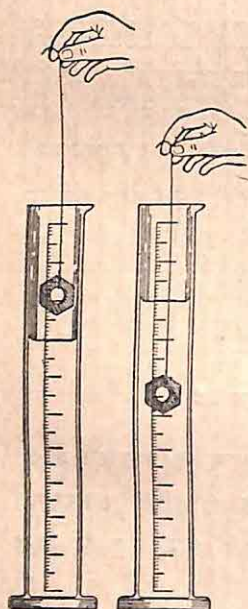
যদি বস্তুটি চোঙের চেয়ে বড় হয় তবে একটি বড় থালার উপর একটি কানায় কানায় ভর্তি জলপূর্ণ পাত্র নাও। বস্তুটি জলপূর্ণ পাত্রে ডুবিয়ে রাখ। যে পরিমাণ জল উপচে থালায় পড়বে তার আয়তন মেজারিং চোঙ-এর সাহায্যে মাপ। এই আয়তনই বস্তুটির আয়তন।

ভর ও ওজন পরিমাপক যন্ত্র

দাঁড়িপাল্লা : কোন বস্তুর ভর মাপতে যে যন্ত্রের প্রয়োজন হয় তাকে বলে দাঁড়িপাল্লা। হাটে, বাজারে, মুদির দোকানে দাঁড়িপাল্লা ব্যবহার করা হয়।

দাঁড়িপাল্লার প্রধান অংশ একটা কাঠের দণ্ড AB (চিত্র 1.7)। দণ্ডটির ঠিক মাঝখানে Oতে একটি এবং A ও B দুই প্রান্তে আরও দুটি ফুটো থাকে। O বিন্দুতে একটা দড়ি লাগান থাকে যেটা ধরে দাঁড়িপাল্লা ঝুলিয়ে রাখা হয়। AO এবং BO দৈর্ঘ্যকে যন্ত্রটির বাহু বলা হয়। অন্য দুটো প্রান্ত A এবং B থেকে টিনের বা বেতের দুটো সমান ভরের পাল্লা ঝোলান থাকে। প্রথমে O বিন্দুতে লাগান দড়ি ধরে দণ্ডটি অনুভূমিক থাকে কিনা দেখতে হয়। পরে একটি পাল্লায় বস্তুটি এবং অন্যটিতে বাটখারা চাপিয়ে দণ্ডটিকে অনুভূমিক করতে হয়। বাটখারা দণ্ডটিকে O বিন্দুকে কেন্দ্র করে যেদিক ঘোরাবার চেষ্টা করে, বস্তুটিও O বিন্দুকে কেন্দ্র করে দণ্ডটিকে উল্টো দিকে ঘোরাবার চেষ্টা করে।
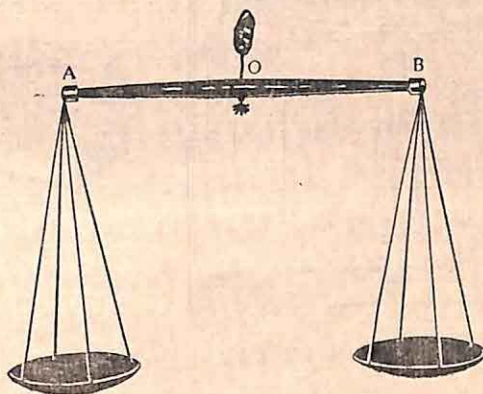
চিত্র 1.7

দণ্ডটির অনুভূমিক অবস্থায়—

বাটখারার ওজন × AO = বস্তুর ওজন × BO।

এখন AO এবং BOর দৈর্ঘ্য সমান হলে বস্তুর ওজন বাটখারার ওজনের সমান হবে। নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ দাঁড়িপাল্লায় যখন কোন বস্তুর ওজন নেওয়া হয় তখন প্রমাণ বাটখারার ভরের সঙ্গে বস্তুর ভরের তুলনা করা হয়।

যদি তুলাদণ্ডের বাহুর দৈর্ঘ্য সমান না হয় তবে কি হবে? ধর AO এবং BO সমান নয়। মনে কর, AO বড়। উপরের সমীকরণ থেকে দেখতে পাবে এক্ষেত্রে ওজনে পাওয়া বস্তু প্রকৃত ওজনের চেয়ে বেশি। যদি AO বাহু BO বাহুর চেয়ে ছোট হয় তবে কি হবে বলত?

ফিজিকাল ব্যালেন্স : গবেষণাগারে ভর মাপবার জন্য যে তুলাযন্ত্র বা ফিজিকাল ব্যালেন্স ব্যবহার হয় তার ছবি 1.8 চিত্রে দেওয়া হল।

একটি তক্তার উপর কাচের বাক্সের মধ্যে যন্ত্রটি ঢাকা থাকে। তক্তাটি তিনটি স্ক্রুর উপর বসান হয়। তক্তাটির ঠিক মাঝখানে একটি ফাঁপা স্তম্ভ আছে। তক্তাটির সামনে আটকানো একটি চাকতি ঘুরিয়ে একটি ধাতুদণ্ডকে এই ফাঁকা স্তম্ভের ভিতর দিয়ে ওঠানামা করান যায়। দণ্ডটির ঠিক মাঝখানে একটি ক্ষুরধার ত্রিভুজ বা নাইফ এজ এমনভাবে রাখা আছে যেন ত্রিভুজটির শীর্ষরেখা
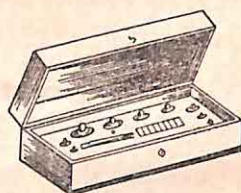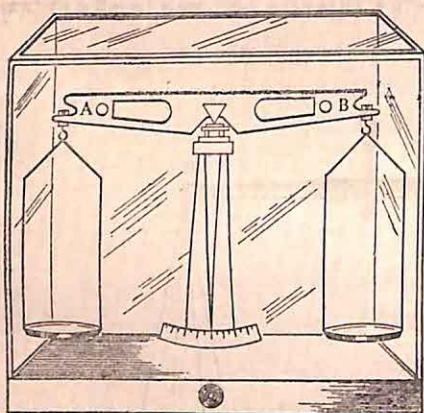
চিত্র 1.8

দণ্ডটির উপর থাকে। এই ত্রিভুজের সঙ্গে একটি দণ্ড AB সমান্তরালভাবে রাখা আছে। এই দণ্ডটিকে বলে তুলাদণ্ড বা ব্যালান্স বীম। ত্রিভুজটি ABর ঠিক মাঝখানে এমনভাবে আটকানো আছে যেন দণ্ডটির আলম্ব ত্রিভুজের শীর্ষরেখার

উপর থাকে। ভারসাম্য অবস্থায় দণ্ডটি অনুভূমিক থাকবে। চাকতি ঘুরিয়ে দণ্ডটি উপরে তুললে ক্ষুরধার ত্রিভুজ সমেত তুলাদণ্ডটি আলগা হয়ে দণ্ডের উপর ভর রেখে দোল খাবে অথবা সমান্তরাল হয়ে থাকবে। তুলাদণ্ডটির দুই প্রান্তে দুটো তুলাপাত্র লাগান থাকে। বাঁ দিকের পাত্রে যে বস্তুটির ভর মাপতে হবে সেটি এবং ডানদিকে জানা ভরগুলি রাখতে হয়। তুলাদণ্ডের ঠিক মাঝখানে সূচক বা পয়েন্টার লাগান থাকে। সূচকের নিচের অংশটি তুলাদণ্ডের আলগা অবস্থায় একটি স্কেলের উপর যাওয়া আসা করতে পারে। যদি সূচকটি এই অবস্থায় ঠিক মাঝের দাগের উপর থাকে বা তার দুইপাশে সমান সংখ্যক ঘর বরাবর দোল খায় তবে জানবে দুদিকে ভর সমান। তুলাদণ্ডের মাঝখানে সূচকের একটু পাশে একটি ওলন দড়ি বা প্লাম্ব লাইন ঝোলান থাকে। ওলন দড়ির নিচে উপর দিকে মুখ করে আর একটি কাঁটা স্তম্ভটির গায়ে শক্তভাবে আটকান থাকে। কাঠের নিচের স্ক্রুগুলির সাহায্যে এই কাঁটার সঙ্গে ওলন দড়ির মুখ মিলিয়ে নিতে হয়। নতুবা সূচক কাঁটাটি স্কেলের উপর স্বাধীনভাবে দোল খেতে পারে না। বাইরের বাতাসে যাতে সূচকটি নড়ে মাপে ভুল না আসে সেজন্য যন্ত্রটি কাচের বাক্সে বসান থাকে। ভর তুলনা করার জন্য ওজনের বাক্স বা ওয়েট বক্স পাওয়া যায় (চিত্র 1.8)। এই বাক্সে বিভিন্ন মাপের ওজন থাকে। সাধারণ বাক্সে সর্বোচ্চ ওজন হচ্ছে 100 g। গ্রামের ভগ্নাংশ ওজনও থাকে। অনেক সুবেদী তুলাযন্ত্রে রাইডার ব্যবহার করা হয়। ওজনগুলির গায়ে যাতে ময়লা না লাগে সেজন্য একটি চিমটার সাহায্যে ওজনগুলি নাড়া-চাড়া করতে হয়।

তোমরা দেখেছ সাধারণ দাঁড়িপাল্লায় ওজন করার সময় বাঁদিকের পাল্লায় বাটখারা রেখে ডানদিকে বস্তু কমিয়ে বা বাড়িয়ে ওজন করা হয়। ফিজিকাল ব্যালেন্সে বাঁদিকের তুলাপাত্রে বস্তু রেখে ডানদিকের তুলাপাত্রে বাটখারা বাড়িয়ে বা কমিয়ে ওজন নিতে হয়। কারণ এক্ষেত্রে বস্তুটির ওজন নির্দিষ্ট। বাঁ দিকে বস্তু ও ডান দিকে বাটখারা রেখে চাকতি ঘুরিয়ে দণ্ডটিকে উপরে তুললে সূচকটি স্কেলের একস্থানে স্থির থাকে অথবা দোল খেতে থাকে। সূচকটি যদি স্কেলের ঠিক মাঝখানে থাকে অথবা দুইপাশে সমান সংখ্যক ঘর বরাবর দোল খায় তবে বস্তুর ওজন ডান দিকের তুলাপাত্রে রাখা বাটখারার ওজনের সমান।

সময়ের পরিমাপ

কোন ঘটনা নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে ঘটলে এই সময়ের অন্তরের সাহায্যে সময় মাপা যায়।

সময় মাপের সবচেয়ে পুরনো ঘড়ি সূর্য। পৃথিবীর আবর্তনের জন্য সূর্যের উদয় ও অস্তের মধ্যবর্তী সময়ের ব্যবধান জেনে সময় মাপা অতি প্রাচীনকালে প্রচলিত ছিল। তখনকার দিনে সূর্যের উদয় ও অস্তের মধ্যবর্তী সময়কে দিন এবং অস্ত ও উদয়ের মধ্যবর্তী সময়কে রাত্রি বলা হত। পরবর্তীকালে এক সূর্যাস্ত থেকে পরবর্তী সূর্যাস্তের মধ্যবর্তী সময়কে বলা হত দিন। সময় মাপার যন্ত্রকে বলা হত সূর্য ঘড়ি বা সান ডায়াল। একটা গোলাকার বৃত্তের মাঝখানে কেন্দ্র থেকে বৃত্ত রেখা পর্যন্ত বিস্তৃত একটি ত্রিভুজাকার অস্বচ্ছ পাত রাখা হত। এই পাতের ছায়া দেখে সময় নির্ণয় করা হত। বৃত্ত রেখার উপর সময় অনুযায়ী দাগ কাটা থাকত। আমাদের দেশে প্রাচীন কালে সূর্য ঘড়ি ব্যবহার হত। দিল্লি এবং জয়পুরে যে যন্তর মন্তর আছে তাতে সূর্য ঘড়ি দেখতে পাবে। আকাশে নক্ষত্রের অবস্থান দেখেও সময় নির্ণয় করা হত। মিশরীরা এবং গ্রীনল্যাণ্ডের এস্কিমোরা জোয়ার ও ভাটার মধ্যবর্তী সময়ের ব্যবধান দেখে সময় নির্ণয় করত। তোমরা জল ঘড়ির কথাও শুনে থাকবে। মুঘল আমলে আমাদের দেশে জল ঘড়ির চলন ছিল। আজকাল অবশ্য সম্পূর্ণ নতুন ধরনের ঘড়ি ব্যবহার হয়। অনেক দেওয়াল ঘড়িতে একটা দণ্ড সমেত চাকতি দুলতে দেখে থাকবে। একে বলে দোলক বা পেণ্ডুলাম। দোলকের ব্যবহার চালু করেন গ্যালিলিও। তিনি একদিন গির্জেয় ঝোলান ঝাড়লণ্ঠনকে দুলতে দেখে লক্ষ্য করেন যে এর দোলন কাল বদলায় না। তিনি নিজের নাড়ীর স্পন্দনের সঙ্গে মিলিয়ে দেখেন একদিক থেকে আর একদিক পর্যন্ত যাওয়ার সময়ের অন্তর একই থাকে। তোমরা
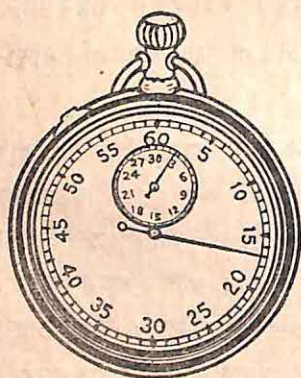
চিত্র 1. 9

পরীক্ষা করে দেখতে পারো একটি সুতোর মুখে ঢিল বেঁধে। যদি সুতো ও ঢিলের মাঝখান পর্যন্ত দূরত্ব 99·4 cm হয় তবে ঢিলটির এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে যেতে এক সেকেণ্ড সময় লাগবে। আমরা যে সব ঘড়ি ব্যবহার করি সবই স্প্রিং দিয়ে একটি চাকা দোলান হয়। গবেষণাগারে সময়ের অন্তর মাপার বিশেষ ধরনের ঘড়ি ব্যবহার হয়, তাদের বলে স্টপ ঘড়ি। এই ঘড়ি ইচ্ছামত চালান বা বন্ধ করা যায়। দু রকমের স্টপ ঘড়ি আছে—স্টপ ক্লক ও স্টপওয়াচ (চিত্র 1.9)। দু রকমের ঘড়িতেই দুটি কাঁটা থাকে—বড়টি সেকেণ্ড মাপার জন্য, ছোটটি মিনিটের মাপের জন্য। ইচ্ছামত চালান বা বন্ধ করার জন্য স্টপ ওয়াচে একটি নব ও স্টপ ক্লকে একটি দণ্ড থাকে।

সময়ের মান অতি সূক্ষ্মভাবে মাপতে হলে আজকাল পারমাণবিক ঘড়ি ব্যবহার হয়। আমাদের দেশেও এই ধরনের ঘড়ি আছে।

২ পদার্থ ও শক্তি

পদার্থ

আমাদের চারপাশে কত রকমের জিনিস। তাদের আকৃতি, প্রকৃতি, গঠন ও ধর্মও নানা রকমের। কোনটা শক্ত, কোনটা আবার গ্যাসীয়। তাদের গন্ধ, রঙ, স্বাদও বিভিন্ন। কোনটা জড় আবার কোনটা জীবন্ত। এই পৃথিবীর জড় ও জীব সকল বস্তুকেই আমরা ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে অনুভব করতে পারি। সকল বস্তুই কিছু জায়গা জুড়ে আছে এবং সকলেরই ওজন আছে—যত কম বা যত বেশিই হোক না কেন।

বস্তুর জড়তা কাকে বলে তোমরা পড়েছ। স্থির বস্তু চিরদিনই স্থির থাকে এবং চলমান বস্তু চিরদিনই চলতে থাকবে যদি জমি বা বাতাসের ঘর্ষণ না থাকে। এই অবস্থার পরিবর্তন করতে হলে বলের প্রয়োজন। বস্তুর নিজের অবস্থাতে থাকতে চাওয়ার ধর্মকে **জড়তা** বলে।

যে সব বস্তুকে আমরা ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে অনুভব করতে পারি, যারা কিছু স্থান অধিকার করে আছে এবং যাদের ওজন ও জড়তা আছে তাদের **পদার্থ** বলে।

শক্তি

কাজ করা কাকে বলে তোমরা পড়েছ। শুধু জীব নয় জড় বস্তুও কাজ করতে সক্ষম। যে কোন বস্তুর কাজ করার সামর্থ্যকে বলে শক্তি। শক্তি বস্তুর সঙ্গে যুক্ত থেকে তাদের ক্রিয়াকলাপকে নিয়ন্ত্রিত করে।

বস্তু ও শক্তি এই দুইয়ের অধ্যয়নই হচ্ছে পদার্থ বিজ্ঞান।

ভর ও ভার

কোন বস্তুর ভর ও ভার এক জিনিস নয়। কোন বস্তুতে জড়তার মোট পরিমাণকে বলে তার **ভর**, কিন্তু সেই বস্তুকে পৃথিবী যে বল দিয়ে আকর্ষণ করে তাকে বলে তার **ভার**। ভর স্কেলার রাশি, ভার ভেকটর রাশি। ভার পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে ভিন্ন হতে পারে, কিন্তু ভর অপরিবর্তিত থাকে। পৃথিবী থেকে

দূরে যেতে থাকলে অভিকর্ষ টান কমতে থাকে। তখন নভশ্চরদের ভার বা ওজন কমতে থাকে। কিন্তু তাদের ভর অপরিবর্তিত থাকে। ভর যে কোন বস্তুর মৌলিক ধর্ম।

পরে জানতে পারবে বস্তুর ভরও অপরিবর্তিত থাকে না। কোন চলমান বস্তুর বেগ আলোর গতিবেগের কাছাকাছি হলে তার ভর বৃদ্ধি হয়—একথা আইনস্টাইন প্রথম উপলব্ধি করেন এবং তার জন্য একটি সূত্র তৈরি করেন। সূত্রটি যে ঠিক সেটা পরে পরীক্ষায় প্রমাণ হয়েছে।

সাধারণ দাঁড়িপাল্লা বা স্প্রিং তুলা দিয়ে বস্তু ওজন করা হয়। দাঁড়িপাল্লায় যে বস্তুটির ওজন নেবে তার ভর, বাটখারা অর্থাৎ আর একটি বস্তুর নির্দিষ্ট ভরের সঙ্গে তুলনা করা হয়। দাঁড়িপাল্লায় আসলে ভর মাপা হয়। স্প্রিং তুলার নিচের আংটায় বস্তুটিকে ঝুলিয়ে দিলে পৃথিবীর আকর্ষণী বল স্প্রিংটিতে যে প্রসারণ সৃষ্টি করে তাই বস্তুটির ওজন। সুতরাং স্প্রিং তুলায় তোমরা প্রকৃত ওজন মাপতে পার। স্প্রিং তুলা সম্বন্ধে ভালভাবে পরে পড়বে। বস্তুর ওজন অভিকর্ষজ ত্বরণের উপর নির্ভর করে। কোন স্থানে অভিকর্ষজ ত্বরণের মান সেই স্থান থেকে পৃথিবীর কেন্দ্রের দূরত্বের বর্গের ব্যাস্তানুপাতিক। কিন্তু ভূপৃষ্ঠ থেকে পৃথিবীর কেন্দ্রের দূরত্ব সব জায়গায় সমান নয়। সুতরাং কোন বস্তুর ভর এক হলেও সর্বত্র তার ওজন সমান হবে না। দূরত্ব বাড়লে ওজন কমে আর দূরত্ব কমলে ওজন বাড়ে। পাহাড়ের উপর বস্তুর ওজন ভূপৃষ্ঠের ওজনের চেয়ে কম। আবার মেরু অঞ্চলে বস্তুর ওজন বিষুব অঞ্চলের ওজনের চেয়ে বেশি। কোন বস্তুর উত্তর মেরুতে ওজন 1 kg হলে মাদ্রাজে ওজন হবে 0·995 kg অর্থাৎ উত্তর মেরুর ওজনের চেয়ে কম কারণ মাদ্রাজ বিষুব অঞ্চলে অবস্থিত। চাঁদের ভর পৃথিবীর ভরের প্রায় এক ষষ্ঠাংশ। তাই যে কোন বস্তুর ওজন চাঁদে মাপলে পৃথিবীতে ঐ বস্তুর ওজনের প্রায় ছয় ভাগের এক ভাগ দেখাবে।

শক্তির বিভিন্ন রূপ ও তাদের রূপান্তর

শক্তির কথা তোমরা আগেই পড়েছ। শক্তির কয়েকটি ভিন্ন রূপের কথাও তোমরা জান। সাধারণত নিম্নলিখিত রূপে শক্তির প্রকাশ পেতে পারে:

(ক) যান্ত্রিক শক্তি, (খ) তাপ শক্তি, (গ) বিকিরণ শক্তি, (ঘ) শব্দ শক্তি, (ঙ) চুম্বক শক্তি, (চ) বিদ্যুৎ শক্তি।

এছাড়াও রাসায়নিক শক্তি, পারমাণবিক শক্তি ইত্যাদির কথা পরে পড়বে। যান্ত্রিক শক্তি স্থিতিশক্তি বা গতিশক্তি এই দুইভাবে প্রকাশ পেতে পারে এবং আলোর শক্তি বিকিরণ শক্তিরই এক বিশেষ রূপ।

শক্তিকে এক রূপ থেকে অন্য রূপে রূপান্তর করা সম্ভব। যেমন ধর বিদ্যুৎ। বিদ্যুৎশক্তি যখন পাখা ঘোরায় বা ট্রেন চালায় তখন যান্ত্রিক শক্তিতে, যখন আলো জালায় তখন আলোক শক্তিতে এবং ইলেকট্রিক হিটারে তাপ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। আবার জলের স্রোতের গতিশক্তি টারবাইন ঘুরিয়ে বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। স্টীম এঞ্জিনের তাপশক্তি রেলগাড়ি চালিয়ে যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। এ ধরনের অজস্র উদাহরণ দেওয়া চলে।

ভরের নিত্যতা

তুলাদণ্ডের সাহায্যে বস্তুর ভর মাপা সম্ভব বা দুটি ভরের তুলনা সম্ভব। যতক্ষণ তুলাদণ্ড সমান্তরাল থাকবে ততক্ষণ বস্তুটিকে কাটা, ছেঁড়া বা গুঁড়ো যাই কর না কেন বস্তুর ভর একই থাকবে। রাসায়নিক প্রক্রিয়াতেও বস্তুর ভর পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। একই কথা সব বস্তুর ক্ষেত্রেই খাটে। অর্থাৎ পৃথিবীতে মোট ভরের পরিমাণ অপরিবর্তিত আছে। বস্তুর ভরের বিনাশ নেই বা সৃষ্টিও করা যায় না। একে **ভরের নিত্যতা সূত্র** বলে।

চিত্র 2.1

ভরের নিত্যতার প্রথম পরীক্ষা করেন ল্যাণ্ডোল্ট বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে। H-আকৃতির মত দেখতে দুই বাহু বিশিষ্ট একটি কাচের নলের এক বাহুতে তিনি ফেরাস সালফেট ($FeSO_4$) ও অন্য বাহুতে সিলভার সালফেট (Ag_2SO_4) দ্রবণ নেন (চিত্র 2.1)। তিনি বাহুদুটির মুখ বন্ধ করে দেন ও লক্ষ্য রাখেন যাতে এক বাহুর দ্রবণ অন্য বাহুর দ্রবণের সঙ্গে মিশে না যায়। এই অবস্থায় তিনি দ্রবণ সমেত কাচ নলটি অতি সূক্ষ্ম তুলাদণ্ডে ওজন করেন। পরে নলটিকে উলটিয়ে দ্রবণ দুটিকে সম্পূর্ণ

ভাবে মেশান। তখন তাদের মধ্যে রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে সিলভার সালফেট বিজারিত হয়ে রুপোয় পরিণত হয়।

$$2Fe\ SO_4 + Ag_2\ SO_4 = Fe_2\ (SO_4)_3 + 2Ag$$

বিক্রিয়ার শেষে নলটিকে কিছুক্ষণ ঠাণ্ডা হতে দিয়ে তিনি আবার ওজন নেন ও দেখেন আগের ও পরের ওজন সমান। এ থেকে ভরের নিত্যতা প্রমাণিত হয়।

শক্তির নিত্যতা

শক্তি যখন রূপান্তরিত হয় তখন তাদের ক্ষয় বা বিনাশ হয় না। শক্তি সৃষ্টি করা বা ক্ষয় করা সম্ভব নয়। যখন কোন বস্তু শক্তি হারায় তখন অন্য কোন বস্তু সমপরিমাণ শক্তি লাভ করে। প্রমাণ করা গিয়েছে যে শক্তি রূপান্তরের সময় রূপান্তরের আগে ও পরে মোট শক্তির পরিমাণ সমান। বিজ্ঞানীদের মতে বিশ্ব সৃষ্টির সময় শক্তির মোট পরিমাণ যা ছিল আজও তা অপরিবর্তিত আছে। এই সূত্রকে বলে **শক্তির নিত্যতা সূত্র**।

শক্তির অপচয়

শক্তি যখন এক রূপ থেকে অন্য রূপে পরিবর্তিত হয় তখন প্রায়ই দেখা যায় রূপান্তরের পরের শক্তি রূপান্তরের আগের শক্তির চেয়ে কম। উদাহরণস্বরূপ যে কোন যন্ত্র নাও। যন্ত্রে যে শক্তি দেওয়া হয় এবং যন্ত্রের কাজ করার ক্ষমতা এক নয়। প্রদত্ত শক্তি সব সময়েই বেশি। এই শক্তির কিছু পরিমাণ যন্ত্রের বিভিন্ন অংশে ঘর্ষণের বাধা অতিক্রম করার কাজে লাগে ও ফলে তাপ উৎপন্ন হয়। অনেক উপর থেকে একটি ঢিল নিচে ফেলে দিলে ঢিলটির স্থিতিশক্তি রূপান্তরিত হয় গতিশক্তি, শব্দশক্তি এবং তাপশক্তিতে। কিন্তু এই শক্তিগুলির কোনটিকেই উপযোগী কাজে লাগানো যায় না এবং তাদের অপচয় হয়েছে বলে মনে করা হয়। কিন্তু এই অনুপযোগী শক্তি ও প্রাপ্ত শক্তির যোগফল প্রদত্ত শক্তির সমান।

বস্তু ও শক্তির তুল্যমূল্যতা

বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বৈজ্ঞানিক অ্যালবার্ট আইনস্টাইন বলেন যে বস্তু ও শক্তি একে অন্যতে রূপান্তরিত হতে পারে। তিনি বলেন, পদার্থ হচ্ছে শক্তিরই

(ক) যান্ত্রিক শক্তি, (খ) তাপ শক্তি, (গ) বিকিরণ শক্তি, (ঘ) শব্দ শক্তি, (ঙ) চুম্বক শক্তি, (চ) বিদ্যুৎ শক্তি।

এছাড়াও রাসায়নিক শক্তি, পারমাণবিক শক্তি ইত্যাদির কথা পরে পড়বে। যান্ত্রিক শক্তি স্থিতিশক্তি বা গতিশক্তি এই দুইভাবে প্রকাশ পেতে পারে এবং আলোর শক্তি বিকিরণ শক্তিরই এক বিশেষ রূপ।

শক্তিকে এক রূপ থেকে অন্য রূপে রূপান্তর করা সম্ভব। যেমন ধর বিদ্যুৎ। বিদ্যুৎশক্তি যখন পাখা ঘোরায় বা ট্রেন চালায় তখন যান্ত্রিক শক্তিতে, যখন আলো জ্বালায় তখন আলোক শক্তিতে এবং ইলেকট্রিক হিটারে তাপ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। আবার জলের স্রোতের গতিশক্তি টারবাইন ঘুরিয়ে বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। স্টীম এঞ্জিনের তাপশক্তি রেলগাড়ি চালিয়ে যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। এ ধরনের অজস্র উদাহরণ দেওয়া চলে।

ভরের নিত্যতা

তুলাদণ্ডের সাহায্যে বস্তুর ভর মাপা সম্ভব বা দুটি ভরের তুলনা সম্ভব। যতক্ষণ তুলাদণ্ড সমান্তরাল থাকবে ততক্ষণ বস্তুটিকে কাটা, ছেঁড়া বা গুঁড়ো যাই কর না কেন বস্তুর ভর একই থাকবে। রাসায়নিক প্রক্রিয়াতেও বস্তুর ভর পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। একই কথা সব বস্তুর ক্ষেত্রেই খাটে। অর্থাৎ পৃথিবীতে মোট ভরের পরিমাণ অপরিবর্তিত আছে। বস্তুর ভরের বিনাশ নেই বা সৃষ্টিও করা যায় না। একে **ভরের নিত্যতা সূত্র** বলে।

চিত্র 2.1

ভরের নিত্যতার প্রথম পরীক্ষা করেন ল্যাণ্ডোল্ট বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে। H-আকৃতির মত দেখতে দুই বাহু বিশিষ্ট একটি কাচের নলের এক বাহুতে তিনি ফেরাস সালফেট ($FeSO_4$) ও অন্য বাহুতে সিলভার সালফেট (Ag_2SO_4) দ্রবণ নেন (চিত্র 2.1)। তিনি বাহুদুটির মুখ বন্ধ করে দেন ও লক্ষ্য রাখেন যাতে এক বাহুর দ্রবণ অন্য বাহুর দ্রবণের সঙ্গে মিশে না যায়। এই অবস্থায় তিনি দ্রবণ সমেত কাচ নলটি অতি সূক্ষ্ম তুলাদণ্ডে ওজন করেন। পরে নলটিকে উলটিয়ে দ্রবণ দুটিকে সম্পূর্ণ

ভাবে মেশান। তখন তাদের মধ্যে রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে সিলভার সালফেট বিজারিত হয়ে রুপোয় পরিণত হয়।

$$2Fe\ SO_4 + Ag_2\ SO_4 = Fe_2\ (SO_4)_3 + 2Ag$$

বিক্রিয়ার শেষে নলটিকে কিছুক্ষণ ঠাণ্ডা হতে দিয়ে তিনি আবার ওজন নেন ও দেখেন আগের ও পরের ওজন সমান। এ থেকে ভরের নিত্যতা প্রমাণিত হয়।

শক্তির নিত্যতা

শক্তি যখন রূপান্তরিত হয় তখন তাদের ক্ষয় বা বিনাশ হয় না। শক্তি সৃষ্টি করা বা ক্ষয় করা সম্ভব নয়। যখন কোন বস্তু শক্তি হারায় তখন অন্য কোন বস্তু সমপরিমাণ শক্তি লাভ করে। প্রমাণ করা গিয়েছে যে শক্তি রূপান্তরের সময় রূপান্তরের আগে ও পরে মোট শক্তির পরিমাণ সমান। বিজ্ঞানীদের মতে বিশ্ব সৃষ্টির সময় শক্তির মোট পরিমাণ যা ছিল আজও তা অপরিবর্তিত আছে। এই সূত্রকে বলে **শক্তির নিত্যতা সূত্র**।

শক্তির অপচয়

শক্তি যখন এক রূপ থেকে অন্য রূপে পরিবর্তিত হয় তখন প্রায়ই দেখা যায় রূপান্তরের পরের শক্তি রূপান্তরের আগের শক্তির চেয়ে কম। উদাহরণস্বরূপ যে কোন যন্ত্র নাও। যন্ত্রে যে শক্তি দেওয়া হয় এবং যন্ত্রের কাজ করার ক্ষমতা এক নয়। প্রদত্ত শক্তি সব সময়েই বেশি। এই শক্তির কিছু পরিমাণ যন্ত্রের বিভিন্ন অংশে ঘর্ষণের বাধা অতিক্রম করার কাজে লাগে ও ফলে তাপ উৎপন্ন হয়। অনেক উপর থেকে একটি ঢিল নিচে ফেলে দিলে ঢিলটির স্থিতিশক্তি রূপান্তরিত হয় গতিশক্তি, শব্দশক্তি এবং তাপশক্তিতে। কিন্তু এই শক্তিগুলির কোনটিকেই উপযোগী কাজে লাগানো যায় না এবং তাদের অপচয় হয়েছে বলে মনে করা হয়। কিন্তু এই অনুপযোগী শক্তি ও প্রাপ্ত শক্তির যোগফল প্রদত্ত শক্তির সমান।

বস্তু ও শক্তির তুল্যমূল্যতা

বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বৈজ্ঞানিক অ্যালবার্ট আইনস্টাইন বলেন যে বস্তু ও শক্তি একে অন্যতে রূপান্তরিত হতে পারে। তিনি বলেন, পদার্থ হচ্ছে শক্তিরই

এক বিশেষ রূপ। পদার্থ ও শক্তির সম্পর্ক নিয়ে তিনি এক সমীকরণ বার করেন। যদি m ভর, E শক্তিতে রূপান্তরিত হয় এবং c যদি আলোর গতিবেগ হয় তবে $E=mc^2$। অর্থাৎ বস্তুকে বিলোপ করে শক্তি এবং শক্তিকে বিলোপ করে বস্তুতে রূপান্তর করা সম্ভব। একেই বলে **বস্তু ও শক্তির তুল্যমূল্যতা**। এর কোন সাধারণ উদাহরণ দেওয়া সম্ভব নয়, তবে পরমাণু বিজ্ঞানে এটা অহরহ ঘটছে।

পদার্থ বিলোপ করে যে প্রচণ্ড শক্তি পাওয়া সম্ভব, সাধারণ মানুষে তার প্রথম প্রমাণ পায় পরমাণু বোমার বিস্ফোরণে। পরে এই শক্তি নিয়ন্ত্রিত করে পারমাণবিক রিঅ্যাকটর তৈরি হয়েছে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য। তোমরা নিশ্চয়ই জান বোম্বাইয়ের কাছে তারাপুরে পারমাণবিক রিঅ্যাকটর কেন্দ্রে উৎপাদিত বিদ্যুৎ মহারাষ্ট্র ও গুজরাটে সরবরাহ করা হয়। তামিলনাড়ুর কলাপক্কমে, রাজস্থানের রাণাপ্রতাপসাগরে এবং উত্তর প্রদেশের নারোরায় বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য পারমাণবিক রিঅ্যাকটর তৈরি চলেছে।

ভর ও শক্তির নিত্যতা

তোমরা জানলে ভরকে শক্তিতে এবং শক্তিকে ভরে রূপান্তরিত করা যায় এবং পারমাণবিক বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে ভর শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। তোমরা জান পৃথিবীতে শক্তির উৎস সূর্য। আবার সূর্যের শক্তির উৎস হচ্ছে নানা ধরনের পারমাণবিক বিক্রিয়া। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে শক্তির নিত্যতা সূত্র সত্য হলেও পারমাণবিক বিক্রিয়ায় এগুলি খাটে না। তাই সাধারণভাবে বলতে গেলে বলতে হয় ভর ও শক্তির মোট পরিমাণ নিত্য। এই সূত্রের নাম **ভর ও শক্তির নিত্যতা সূত্র**।

৩ অবস্থার রূপান্তর

পদার্থের ভৌত অবস্থা

পৃথিবীর যাবতীয় পদার্থকে কঠিন, তরল এবং গ্যাসীয়—তিনটি পৃথক শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। প্রতিটি শ্রেণীকে বস্তুর অবস্থা বলে।

কঠিন : কঠিন পদার্থের নির্দিষ্ট আকার এবং আয়তন আছে। আয়তন থাকার অর্থই হল একটা সুনির্দিষ্ট জায়গা দখল করে থাকা। বাইরে থেকে বল প্রয়োগ ব্যতীত কঠিন পদার্থ মাত্রই আপন আপন আকার বজায় রাখবার চেষ্টা করে।

তরল : তরল পদার্থের নির্দিষ্ট আয়তন আছে। কিন্তু আকার নেই। তাই তরল পদার্থ রাখার জন্য কোন পাত্র বা আধারের প্রয়োজন হয় এবং যে পাত্রে তরল পদার্থ রাখা যায় পদার্থ সেই পাত্রের আকার ধারণ করে। এক বোতল দুধ বা তেল কোন বাটিতে বা হাঁড়িতে যে পাত্রেই রাখা হোক না কেন, তার আকার বাটি বা হাঁড়ির মতই হবে। কিন্তু আয়তন একটুও বাড়ল না, সেই এক বোতলই থাকবে।

গ্যাস : গ্যাসীয় পদার্থের কোন নির্দিষ্ট আকারও নেই, আয়তনও নেই। যখন যে আধারে থাকে সেই আধারের আকার ও আয়তন গ্রহণ করে। গ্যাসীয় পদার্থের এই ধর্ম সহজেই তোমরা পরীক্ষা করে দেখতে পার।

পদার্থের অবস্থার পরিবর্তন

পৃথিবীর যে কোন পদার্থ—কঠিন, তরল অথবা গ্যাস—সাধারণ তাপমাত্রায় যে কোন একটি অবস্থায় থাকে। পদার্থের এই অবস্থা কি স্থায়ী? অর্থাৎ কোন কঠিন পদার্থ কি যে কোন অবস্থায় কঠিন থাকবে অথবা কোন তরল পদার্থকে কি সব সময়েই তরল অবস্থায় পাওয়া যাবে? গ্যাসের ক্ষেত্রেও ওই একই প্রশ্ন হতে পারে। জল নিয়ে পরীক্ষা করে এই প্রশ্নের আলোচনা করা যেতে পারে।

জল স্বাভাবিক অবস্থায় তরল পদার্থ এবং জলের উপাদান অক্সিজেন এবং হাইড্রোজেন—এই দুটি গ্যাস। কিন্তু বরফ স্বাভাবিক অবস্থায় কঠিন পদার্থ। বরফের উপাদানও অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন গ্যাস। আবার অদৃশ্য জলীয় বাষ্প

যা স্বাভাবিক অবস্থায় গ্যাস অথবা জল ফোটালে যে স্টীম পাওয়া যায় তার উপাদানও ওই দুটি গ্যাস—অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন। আমরা এখন নিশ্চিত ভাবে বলতে পারি—জল, বরফ এবং জলীয় বাষ্প বা স্টীম একই পদার্থের তিনটি পৃথক অবস্থা মাত্র।

গলন ও হিমায়ন : গলনাঙ্ক ও হিমাঙ্ক

যে কোন বস্তুকে গরম করলে দুটি পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। বস্তুর তাপমাত্রা বাড়ে এবং আরও গরম করলে এক সময় বস্তুর অবস্থার পরিবর্তন হয়। উদাহরণস্বরূপ 0°C তাপমাত্রায় এক টুকরো বরফ নেওয়া হল। এই টুকরোটিকে গরম করলে বরফ গলে জল হতে থাকবে। যতক্ষণ না সমস্ত বরফ গলে জল হয় ততক্ষণ তার তাপমাত্রার কোন পরিবর্তন হয় না। সমস্ত বস্তুর ক্ষেত্রে একই ঘটনা ঘটে। এই প্রণালীকে বলা হয় **গলন** বা মেল্টিং এবং প্রমাণ চাপে যে নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় বস্তু গলে তাকে বলা হয় বস্তুর **গলনাঙ্ক** বা মেল্টিং পয়েণ্ট। বস্তু গলে যাওয়ার পরেও তাকে গরম করা হলে বস্তুটির তরল অবস্থায় তাপমাত্রা বাড়তে থাকবে। ঠিক একই ভাবে যে কোন তরল বস্তুকে ঠাণ্ডা করে কঠিন বস্তুতে পরিণত করা যায়। ঠাণ্ডা করতে থাকলে প্রথমে তরলের তাপমাত্রা কমতে থাকবে। পরে আরও ঠাণ্ডা করতে থাকলে দেখা যাবে একটি তাপমাত্রায় বস্তুটি জমতে শুরু করেছে এবং সমস্ত তরলটুকু জমে না যাওয়া পর্যন্ত এই তাপমাত্রার কোন পরিবর্তন হবে না। এই প্রণালীকে বলে **হিমায়ন** বা ফ্রিজিং এবং প্রমাণ চাপে যে তাপমাত্রায় বস্তুটি জমতে থাকে তাকে বলে **হিমাঙ্ক** বা ফ্রিজিং পয়েণ্ট। মনে রাখবে গলনাঙ্ক ও হিমাঙ্ক চাপের উপর নির্ভর করে। চাপ পরিবর্তিত হলে এই তাপমাত্রা পরিবর্তিত হয়। বস্তুটিকে আরও ঠাণ্ডা করতে থাকলে কঠিন অবস্থায় তাপমাত্রা কমতে থাকবে।

গলনাঙ্ক নির্ণয় : (1) বেশ কয়েক টুকরো বরফ নাও। পরিষ্কার ভাবে ধুয়ে এক টুকরো ব্লটিং কাগজ দিয়ে তাদের গা শুকনো করে নাও। পরে বরফ-গুলোকে একটি বিকারে রেখে একটি থার্মোমিটার দিয়ে তাদের তাপমাত্রা দেখে নাও। এবারে বুনসেন বা স্পিরিট দীপের সাহায্যে বিকারটিকে ধীরে ধীরে গরম করতে থাক। দেখবে বরফ গলতে শুরু করেছে। তাপমাত্রার দিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য কর। দেখবে বরফ সম্পূর্ণ গলে না যাওয়া পর্যন্ত তাপমাত্রার

কোন পরিবর্তন হচ্ছে না। সমস্ত বরফ গলে যাওয়ার পরে তাপ দিতে থাকলে জলের তাপমাত্রা ধীরে ধীরে বাড়তে থাকবে।

(2) একটি বড় বিকারে কিছু গুঁড়ো ন্যাপথালিন নাও এবং বুনসেন দীপের সাহায্যে ধীরে ধীরে গরম করতে থাক। একটি থার্মোমিটারের সাহায্যে গুঁড়ো ন্যাপথালিনের তাপমাত্রা এক মিনিট অন্তর লক্ষ্য করতে থাক এবং খাতায় টুকে নাও। তাপমাত্রা যখন প্রায় 80°C তখন লক্ষ্য করলে দেখবে যে গুঁড়োটি গলতে শুরু করেছে। তাপমাত্রা বিশেষভাবে লক্ষ্য করলে দেখতে পাবে যে পদার্থ গলে না যাওয়া পর্যন্ত তাপমাত্রার কোন পরিবর্তন হয়নি। তারও পরে গরম করলে দেখতে পাবে যে তরল বস্তুটির তাপমাত্রা আবার বাড়তে শুরু করেছে। যদি X অক্ষ বরাবর সময় ও Y অক্ষ বরাবর তাপমাত্রা ধরে একটি লেখ আঁক তবে 3.1 চিত্রের মত এক লেখ পাবে। চিত্রটি লক্ষ্য করলে দেখতে পাবে যে BC অংশে তাপমাত্রার কোন পরিবর্তন হয়নি। এই তাপমাত্রাই ন্যাপথালিনের গলনাঙ্ক।
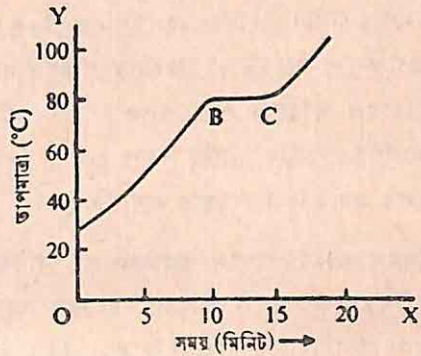
চিত্র 3.1
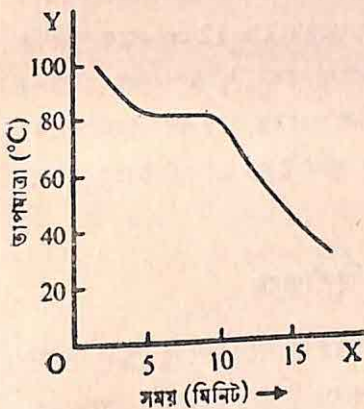
এইবার বস্তুটিকে ঠাণ্ডা হতে দাও এবং এক মিনিট অন্তর তাপমাত্রা লক্ষ্য করতে থাক যতক্ষণ না বস্তুটি কঠিন হয়। বস্তুর সময়-তাপমাত্রা লেখ আঁক। লেখটি 3.2 চিত্রের মত হবে। লেখটির যে অংশে তাপমাত্রার পরিবর্তন নেই তাই ন্যাপথালিনের হিমাঙ্ক নির্দেশ করছে। লক্ষ্য করলে দেখবে ন্যাপথালিনের হিমাঙ্ক 80°C।

চিত্র 3.2

এই পরীক্ষায় বুঝতে পারলে যে কোন কেলাসিত বস্তুর হিমাঙ্ক ও গলনাঙ্কের তাপমাত্রা এক। নির্দিষ্ট চাপে যে কোনও বস্তুর গলনাঙ্ক একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রা। এটি কেলাসিত বস্তুর একটি ভৌত ধর্ম। উদাহরণস্বরূপ প্রমাণ চাপে বরফের গলনাঙ্ক 0°C, পারদের —39°C এবং ন্যাপথালিনের 80°C।

কয়েকটি অকেলাসিত বস্তুর বেলায় দেখা গিয়েছে যে তাদের কোন নির্দিষ্ট গলনাঙ্ক নেই। উদাহরণস্বরূপ পিচ প্রভৃতির নাম করা চলে। পিচ গরম করলে প্রথমে সান্দ্র বা চটচটে অবস্থায় পরিণত হয়। এই পরিবর্তনের সময় তাপ-মাত্রারও পরিবর্তন হতে থাকে। কয়েকটি তরল যথা গ্লিসারিন, অ্যাসেটিক অ্যাসিড প্রভৃতির নির্দিষ্ট হিমাঙ্ক নেই। এরাও অবস্থার পরিবর্তনের মধ্যবর্তী সময়ে এক চটচটে অবস্থার মধ্যে দিয়ে যায়।

গলনে বা হিমায়নে আয়তনের পরিবর্তন: বেশির ভাগ পদার্থের কঠিন থেকে তরলে পরিবর্তনের সঙ্গে আয়তন বাড়ে এবং তরল থেকে কঠিন অবস্থার পরিবর্তনে আয়তন কমে। কিন্তু কয়েকটি বস্তু এদের ব্যতিক্রম, যেমন —জল, ঢালাই লোহা, বিসমাথ, অ্যান্টিমনি, পিতল ইত্যাদি। এদের তরল অবস্থায় আয়তন কম এবং কঠিন অবস্থায় আয়তন বেশি। সেজন্য এই সব বস্তুর কঠিন অবস্থায় ঘনত্ব কম। জল একটি অতি পরিচিত উদাহরণ। বরফের টুকরোকে জলে ভাসতে তোমরা দেখেছ। শীতের দেশে খুব বেশি ঠাণ্ডা পড়লে খোলা জলের পাইপ ফেটে যায়। গল্পে হয়ত পড়েছ দ্বীপের মত বড় বড় বরফের চাঁই সাইবেরিয়া অঞ্চলে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ভেসে যায়। দেখা গিয়েছে যে 0°Cএ 11 cc জল জমে 0°Cএ 12 cc বরফে পরিণত হয়। এ থেকে বোঝা যায় যখন বরফ ভাসে তখন $\frac{1}{12}$ অংশ জলের উপর থাকে। লোহা ও পিতলের আয়তন বৃদ্ধিও অনেক সময় প্রয়োজনে আসে। কঠিন অবস্থায় পিতল ও লোহার আয়তন বৃদ্ধি ছাঁচে ঢালাই কাজে সাহায্য করে।

গলনাঙ্কের উপর চাপের প্রভাব : পুনঃশিলীভবন

দুটো বরফের টুকরো নিয়ে কিছুক্ষণ চেপে ধর। পরে তাদের ছেড়ে দিলেই দেখবে তারা জোড়া লেগেছে। যখন বরফের টুকরো দুটোকে চেপে ধরা হয় তখন চাপের প্রভাবে গলনাঙ্ক কমে যায় এবং চাপের জায়গাটিতে বরফ গলে

জল জমে। ছেড়ে দেওয়ামাত্র গলনাঙ্ক বেড়ে যায় এবং গলে যাওয়া জল আবার বরফ হয়। ফলে টুকরো দুটি জোড়া লেগে যায়। এই ঘটনাকে বলে **পুনঃশিলীভবন**।

সব বস্তুর গলনাঙ্কের উপর চাপের প্রভাব কিন্তু এক নয়। পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে যে, যে সব বস্তু গলে গেলে আয়তনে কমে তাদের গলনাঙ্ক চাপের প্রভাবে কমে। লোহা, জল, বিসমাথ, অ্যান্টিমনি এই শ্রেণীর উদাহরণ। যে সব বস্তুর গলনে আয়তন বাড়ে চাপের প্রভাবে তাদের গলনাঙ্ক বাড়ে। প্রায় সব বস্তুর বেলায় এই ঘটনা ঘটে।

হিমমিশ্রণ : কোন বস্তুকে তরলে দ্রবীভূত করলে দেখা যাবে যে, দ্রবণের হিমাঙ্ক সেই তরলের হিমাঙ্কের চেয়ে কম। এই মিশ্রণকে হিমমিশ্রণ বলে।

একভাগ লবণ তিনভাগ গুঁড়ো বরফে ছড়িয়ে দিলে দেখবে তাপমাত্রা প্রায় $-23^\circ C$ পর্যন্ত কমে। জল ও অ্যামোনিয়ম নাইট্রেট মিশ্রণের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা প্রায় $-15^\circ C$ পর্যন্ত হয়। দুটি মিশ্রণই হিমমিশ্রণের উদাহরণ।

যখন কোন কঠিন পদার্থকে তরলে দ্রবীভূত করা হয় তখন কঠিন বস্তুটির তরলে পরিণত হওয়ার জন্য উত্তাপের প্রয়োজন হয়। কঠিন বস্তুটি প্রয়োজনীয় উত্তাপ তরল থেকে সংগ্রহ করে। ফলে মিশ্রণের তাপমাত্রা কমে যায়। বরফে যখন লবণ ছড়িয়ে দেওয়া হয় তখন লবণ গলে যাওয়ার জন্য বরফও জল থেকে প্রয়োজনীয় উত্তাপ গ্রহণ করে। এমনকি লবণ গোলা জলের হিমাঙ্ক $-2^\circ C$।

বাষ্পীভবন

তরলের বায়বীয় অবস্থাকে **বাষ্প** বলে। অন্য কোন অবস্থা থেকে কোন বস্তুকে বাষ্পে পরিণত করাকে বলে **বাষ্পীভবন**। বাষ্পীভবন তিন ভাবে হতে পারে, যথা—(1) বাষ্পায়ন, (2) স্ফুটন, (3) ঊর্ধ্বপাতন।

(1) **বাষ্পায়ন**—ধীরে ধীরে তরল থেকে বাষ্পে পরিবর্তিত হওয়ার পদ্ধতিকে বলে বাষ্পায়ন। বাষ্পায়নের কোন নির্দিষ্ট তাপমাত্রার প্রয়োজন হয় না। যে কোন তাপমাত্রায় হতে পারে। এই পদ্ধতিতে তরলের উপরতলে বাষ্প হতে দেখা যায়। গ্রীষ্মকালে নদী, পুকুর থেকে জল শুকিয়ে যাওয়া বা ভিজে কাপড় থেকে জল শুকিয়ে যাওয়া সমস্ত বাষ্পায়নের লক্ষণ। ইথার, মেথিলেটেড স্পিরিট এই পদ্ধতিতে বাষ্প হয়।

বাষ্পায়ন পদ্ধতিতে বাষ্প হওয়ার হার সব তরলের ক্ষেত্রে সমান নয়। কোন কোন তরল খুব দ্রুত বাষ্পায়িত হয় ; এদের উদ্বায়ী তরল বলা হয়। অ্যালকোহল, মেথিলেটেড স্পিরিট, বেনজিন, কার্বন-টেট্রাক্লোরাইড, ইথার, পেট্রল প্রভৃতি উদ্বায়ী তরল।

(2) **স্ফুটন**—প্রমাণ চাপে একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় খুব দ্রুত তরল অবস্থা থেকে বাষ্পীয় অবস্থায় পরিবর্তনকে স্ফুটন বলে। স্ফুটন তরলের সমস্ত অংশ থেকে হয়। যে তাপমাত্রায় স্ফুটন শুরু হয়, তরলের সমস্ত অংশ বাষ্প না হওয়া পর্যন্ত সেই তাপমাত্রা স্থির থাকে। এই তাপমাত্রাকে **স্ফুটনাঙ্ক** বলে। স্ফুটনাঙ্ক পারিপার্শ্বিক চাপের উপর নির্ভর করে। স্ফুটনাঙ্ক তরলের ভৌত ধর্ম।
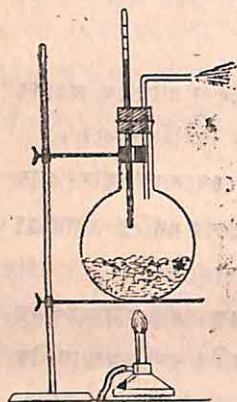
চিত্র 3.3

একটি ফ্লাস্কে কিছুটা জল নাও (চিত্র 3.3)। ফ্লাস্কের মুখে একটি ছিপি আটকাও এবং ছিপির ভিতর দিয়ে একটি থার্মোমিটার ও একটি বাঁকা নল ঢোকাও। লক্ষ্য রাখবে থার্মোমিটারের বাল্‌বটি যেন জলের উপর থাকে। একটি বুনসেন দীপের সাহায্যে জলটি গরম কর এবং এক মিনিট অন্তর তাপমাত্রা নাও। প্রথমে জলের উপরতলে বাষ্পের মত ধোঁয়া উঠতে দেখা যাবে। পরে জলের নিচে ছোট ছোট বুদবুদ উঠবে এবং কিছুদূরে গিয়েই ভেঙে পড়বে। জল ক্রমশ গরম হতে থাকলে প্রায় 98°C বা 99°C এর কাছে বড় বড় বুদবুদ জলের উপরে গিয়ে ভেঙে পড়তে থাকবে এবং 100°C এ সমস্ত তরলে একটা আলোড়নের সৃষ্টি হবে। কাচের নল দিয়ে প্রচুর স্টীম বার হতে থাকবে। এই অবস্থাকে জলের ফুটতে থাকা বা স্ফুটন বলে। যদি কোন লেখচিত্রে X-অক্ষ বরাবর সময় এবং Y-অক্ষ বরাবর তাপমাত্রা আঁক তবে
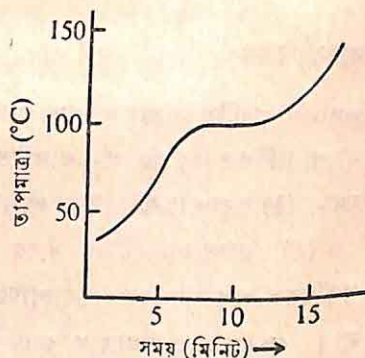
চিত্র 3.4

চিত্র 3.4 এর মত লেখচিত্র পাবে। চিত্র দেখে বুঝতে পারবে যে জল একবার ফুটতে শুরু করলে তাপমাত্রার আর পরিবর্তন হবে না যতক্ষণ না সমস্ত জল বাষ্পীভূত হয়। এ থেকে বোঝা যায় তরলের স্ফুটনাঙ্ক একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রা। স্ফুটনাঙ্ক যে কোন তরলের একটি বিশেষ ভৌত ধর্ম।

(3) **ঊর্ধ্বপাতন**—কোন বস্তুর কঠিন অবস্থা থেকে তরলে পরিবর্তিত না হয়ে সোজাসুজি বাষ্পে পরিণত হওয়াকে ঊর্ধ্বপাতন বলে। এই পদ্ধতিতে বাষ্পীভবন ধীরে ধীরে যে কোন তাপমাত্রায় হতে পারে। ন্যাপথালিন প্রভৃতি এই পদ্ধতিতে বাষ্পীভূত হয়।

বাষ্পায়ন যে কারণে প্রভাবিত হয়—বাষ্পায়ন বাইরের অনেকগুলি কারণে প্রভাবিত হতে পারে। দ্রুত বাষ্পায়ন সবচেয়ে বেশি নির্ভর করে তরলের নিজের প্রকৃতির উপর। অন্যান্য যে যে কারণে এই পদ্ধতিতে তরল তাড়াতাড়ি বাষ্পীভূত হয় সেগুলি হচ্ছে : (1) তরলের তাপমাত্রা বৃদ্ধির উপর ; (2) তরলের উপরতলের ক্ষেত্রফল বৃদ্ধির উপর ; (3) তরলের উপর বায়ু চলাচল বৃদ্ধির উপর অর্থাৎ ফুঁ দিলে তাড়াতাড়ি বাষ্পীভূত হবে ; (4) তরল সংলগ্ন বায়ুর শুষ্কতার উপর।

স্ফুটনাঙ্কের উপর চাপের প্রভাব—পরীক্ষায় দেখা গিয়েছে কোন তরলের স্ফুটনাঙ্ক চাপ বাড়লে বাড়ে এবং কমলে কমে। প্রমাণ চাপে জল 100°C এ ফোটে। পরীক্ষায় দেখা গিয়েছে যে, প্রতি 2·68 cm পারদ চাপের পরিবর্তনের সঙ্গে জলের স্ফুটনাঙ্ক 1°C হারে পরিবর্তিত হয়। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে দার্জিলিং এর উচ্চতা প্রায় দুহাজার মিটার এবং সেখানে জলের স্ফুটনাঙ্ক 93·6°C। খনির নিচে বায়ুমণ্ডলের চাপ বেশি, সেখানে জলের স্ফুটনাঙ্ক 100°C থেকে বেশি।

চাপের প্রভাবে স্ফুটনাঙ্ক কমে যাওয়ায় উঁচু পাহাড় অঞ্চলে রান্না করতে বেশ অসুবিধা হয়। সেজন্য পাত্রের ভিতর কৃত্রিম উপায়ে চাপ বাড়িয়ে স্ফুটনাঙ্ক বাড়াবার চেষ্টা করা হয়। প্রেসার-কুকার ব্যবহার করতে অনেকেই দেখেছ। প্রেসার-কুকারের পাত্রের ভিতরে জল ও সিদ্ধ করার জিনিসটি রাখতে হয়। উপরের ঢাকনিতে একটি ভাল্‌ভ আছে। গরম করার সঙ্গে যখন ভিতরে বাষ্প জমতে থাকে তখন চাপ ও সেই সঙ্গে স্ফুটনাঙ্ক বাড়তে থাকে, ফলে জিনিসটি তাড়াতাড়ি সিদ্ধ হয়। অতিরিক্ত বাষ্প ভাল্‌ভের ভিতর দিয়ে বেরিয়ে যেতে দেওয়া হয়, যাতে বিস্ফোরণ হতে না পারে।

লীন তাপ

তোমরা দেখেছ যখন কঠিন বস্তুকে গরম করা হয় একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় বস্তুটি গলতে শুরু করে এবং তাপ দেওয়া সত্ত্বেও সমস্ত বস্তুটি না গলা পর্যন্ত তার তাপমাত্রার পরিবর্তন হয় না। আবার হিমায়নের সময় ঠাণ্ডা করতে থাকলেও তাপমাত্রা সমস্ত তরল জমে না যাওয়া পর্যন্ত স্থির থাকে। একই ভাবে স্ফুটনের সময় দেখা গিয়েছে যে সমস্ত তরল বাষ্পীভূত না হওয়া পর্যন্ত তরলটি গরম করলেও তাপমাত্রা স্থির থাকে। আবার বাষ্প ঘনীভবনের সময় সমস্ত বাষ্প তরল না হওয়া পর্যন্ত ঠাণ্ডা করলেও তাপমাত্রা স্থির থাকে। চিত্র 3.1, 3.2 এবং 3.4 লেখতে তোমরা এটা ভালভাবে বুঝতে পেরেছ। এই তাপ কোথায় যায়? অবস্থা পরিবর্তনের সময় এই তাপ শোষিত বা বর্জিত হয়—গলন ও স্ফুটনকালে শোষিত হয় এবং হিমায়ন ও ঘনীভবনের সময় তাপ বর্জিত হয়। এই তাপকে লীন তাপ বলে।

এক একক ভরকে প্রমাণ চাপে ও নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় কঠিন অবস্থা থেকে তরলে পরিণত করতে যে তাপশক্তির প্রয়োজন হয় তাকে গলনের **লীন তাপ** বলে। এস আই পদ্ধতিতে জলের গলনের লীন তাপ হচ্ছে $333{\cdot}6 \times 10^3$ J/kg.। সি জি এস পদ্ধতিতে 80 cal/g, এবং এফ পি এস পদ্ধতিতে 144 B. Th. U/lb.

প্রমাণ চাপে ও নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় কোন একক ভরের বস্তুর তরল অবস্থা থেকে গ্যাসে পরিণত হতে যে তাপ লাগে তাকে স্ফুটনের লীন তাপ বলে। এস আই পদ্ধতিতে স্টীমের লীন তাপ 2258×10^3 J/kg, সি জি এস পদ্ধতিতে 537 cal/g এবং এফ পি এস পদ্ধতিতে $964{\cdot}5$ B. Th. U/lb.।

৪ স্থিতি ও গতি

প্রতিদিন অনেক বস্তুকে তোমরা চলাফেরা করতে দেখেছ। রাস্তায় গাড়ি চলে, মানুষ হাঁটে, গরু ছোটে। কেউবা জোরে; আবার কেউ খুব আস্তে। এ ধরনের অনেক উদাহরণ তোমরা নিজেরাই দিতে পারবে। আবার অনেক জিনিস আশপাশে পড়ে থাকতেও দেখেছ। তোমরাও তো দিনের অনেক সময় চুপ করে বসে বা শুয়ে থাক। কিন্তু চলাফেরার সঙ্গে বসে থাকার তফাৎ কোথায়? যখন তুমি হাঁট তখন সময়ের সঙ্গে তোমার অবস্থানের পরিবর্তন কর। যে কোন সচল বস্তুই সময়ের সঙ্গে তার অবস্থান পরিবর্তন করে। বস্তুটি তখন গতিতে আছে বলা হয়। আর কোন বস্তু যখন সময়ের সঙ্গে তার অবস্থান পরিবর্তন করে না তখন বলা হয় বস্তুটি স্থিতিতে আছে।

কোন বস্তু স্থিতিতে আছে, না গতিতে আছে কি করে জানবে? জানতে হলে এমন একটি বস্তুর দরকার যে কোনদিনই তার অবস্থান পাল্টায় না। এরকম বস্তুর স্থিতিকে **পরম স্থিতি** বলে। কিন্তু পৃথিবীর উপর এরকম কোন বস্তুর দেখা পাওয়া যায় না। কারণ, পৃথিবী নিজেই সূর্যের চারপাশে ঘুরছে, আর তার সঙ্গে ঘুরছে পৃথিবীর উপরের সব কিছু বস্তুই। পৃথিবীর উপরে যদি স্থির কোন বস্তু দেখি, তবে সেটা আপাতদৃষ্টিতে স্থির। সুতরাং যে কোন স্থির বস্তুই পৃথিবীর গতির সাপেক্ষে স্থির। একে বলে **আপেক্ষিক স্থিতি**। আর পৃথিবীর উপরে কোন বস্তু যদি কোন স্থির বস্তুর পরিপ্রেক্ষিতে তার অবস্থান পরিবর্তন করে, তবে তার গতিকে বলে **আপেক্ষিক গতি**। একটু সহজ করে বলি, কেমন? যখন তুমি ট্রেনে কোথাও যাও, তখন চলন্ত ট্রেনে তোমার পাশে যারা বসে আছে তাদের কাছে তুমি স্থির অবস্থায় অর্থাৎ আপেক্ষিক স্থিতিতে আছ, কিন্তু বাইরের দুপাশের গাছপালা বাড়িঘরের পরিপ্রেক্ষিতে তুমি ছুটছ অর্থাৎ আপেক্ষিক গতিতে আছ। তাহলে দেখছ, তুমি একই সঙ্গে আপাতদৃষ্টিতে কারও কাছে স্থির, আর কারও কাছে গতিতে আছ। তাহলে পৃথিবীর উপরের যে কোন স্থিতি এবং গতিই আপেক্ষিক।

যদি কোন বস্তুর চারপাশে অন্য কোন বস্তু পরম স্থিতিতে থাকত এবং তার

সাপেক্ষে প্রথম বস্তুটির গতি নির্ধারণ করা যেত তবে সেই গতিকে পরম গতি বলা হত। পরম স্থিতি যেমন সম্ভব নয়, পরম গতিও তেমনি সম্ভব নয়।

চলন সংক্রান্ত কয়েকটি রাশির সংজ্ঞা নিচে দেওয়া হল।

(ক) **সরণ :** কোন বস্তু যখন অবস্থানের পরিবর্তন করে তখন তার প্রথম ও শেষ অবস্থিতির মধ্যে সরলরৈখিক দূরত্বকে সরণ বলে।
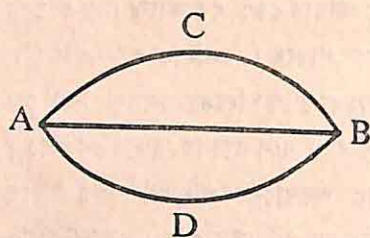
চত্র 4.1

ধর, কোন বস্তুর প্রথম অবস্থান ছিল A বিন্দু এবং কিছু সময় পরে B বিন্দুতে এসে উপস্থিত হল (চিত্র 4.1)। AB, ACB বা ADB যে কোন পথেই B বিন্দুতে আসা সম্ভব। কিন্তু A ও Bর মধ্যে সরলরৈখিক দূরত্ব ABই হচ্ছে বস্তুটির সরণ। AB সরণের শুধু মান নির্দেশ করে না, বস্তুটি যে A থেকে B বিন্দুতে AB পথে এসেছে, এই দিকও নির্দেশ করে।

মনে কর, একটি পিঁপড়ে প্রথমে আঁকাবাঁকা পথে 4cm পথ দূরত্ব OA অতিক্রম করল, পরে A বিন্দু থেকে একইভাবে AB পথ অতিক্রম করল (চিত্র 4.2)। AB পথ 3 cm এর সমান। O হচ্ছে পিঁপড়েটার প্রথম অবস্থান এবং B হচ্ছে শেষ অবস্থান। O ও Bর মধ্যেকার রৈখিক দূরত্ব OB হচ্ছে পিঁপড়েটার সরণ OB দিকে। OB রেখার মান হচ্ছে
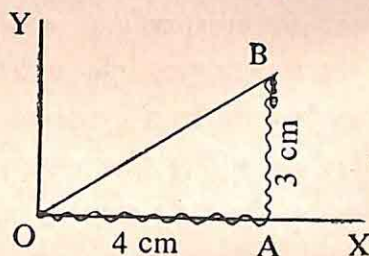
চিত্র 4.2

$$\sqrt{OB^2} = \sqrt{OA^2 + AB^2}$$
$$= \sqrt{4^2 + 3^2}$$
$$= 5 \text{ cm}$$

সরণ একটি ভেক্টর রাশি। কারণ এর মান ও দিক দুই-ই আছে। s কথাটি দিয়ে সরণ প্রকাশ করা হয়। সরণের একক এস আই পদ্ধতিতে মিটার, সি জি এস পদ্ধতিতে সেন্টিমিটার ও ব্রিটিশ পদ্ধতিতে ফুট।

(খ) **দ্রুতি**: সোজা বা বাঁকা পথে কোন বস্তু একক সময়ে যে দূরত্ব অতিক্রম করে তাকে বস্তুর দ্রুতি বলে।

ধর, কোন বস্তুর প্রথম ও শেষ অবস্থানের দূরত্ব s এবং এই পরিবর্তন t সেকেণ্ড সময়ে ঘটেছে। একক সময়ে বস্তুটি s/t দূরত্ব যেতে পারে ; এটিই হচ্ছে বস্তুটির দ্রুতি। অতএব, বস্তুটির অবস্থানের পরিবর্তনের হারকেও তার দ্রুতি বলে। দ্রুতি বোঝাতে কোন দিকের প্রয়োজন হয় না। মনে কর, কোন লোক ঘণ্টায় 50 km বেগে ছুটছে। যে কোন দিকে সে ইচ্ছামত ছুটতে পারে—সোজা বা বাঁকা পথে। দ্রুতি সেজন্য একটি স্কেলার রাশি।

এস আই পদ্ধতিতে দ্রুতির একক প্রতি সেকেণ্ডে এক মিটার বা m/s, সি জি এস পদ্ধতিতে cm/s এবং এফ পি এস পদ্ধতিতে ft/s।

(গ) **বেগ**: বস্তুর একক সময়ের সরণকে বেগ বলে। অর্থাৎ কোন বস্তু নির্দিষ্ট দিকে একক সময়ে যে দূরত্ব অতিক্রম করে তাই বস্তুর বেগ।

মনে কর, একটি বস্তু t সময়ে AB পথে s দূরত্ব অতিক্রম করল। বস্তুর বেগের মান হচ্ছে s/t এবং বেগের দিক হচ্ছে A থেকে Bর দিকে। সুতরাং একটি বিশেষ দিকে নির্দিষ্ট দ্রুতিকে বেগ বলে। বেগের মান ও দিক দুইই থাকায় বেগ একটি ভেক্টর রাশি।

কোন বস্তুর বেগ u বা v অক্ষর দিয়ে প্রকাশ করা হয়। এস আই পদ্ধতিতে বেগের একক m/s, সি জি এস পদ্ধতিতে cm/s এবং এফ পি এস পদ্ধতিতে ft/s। অনেক সময় ভেকটর রাশি বোঝাতে রাশির মানের মাথায় তীর চিহ্ন লেখা হয়। বেগের ক্ষেত্রে $\vec{u}$ বা $\vec{v}$ ব্যবহার করা হয়।

মনে কর, ABC একটি পথ (চিত্র 4.3)। ABC পথে একটি ট্যাক্সি যাচ্ছে যার দ্রুতি স্পিডোমিটারে ধরা পড়ে। AB পথ থেকে BC পথে বাঁক নেবার সময় গাড়িটি দিক পরিবর্তন করল, কিন্তু স্পিডোমিটারের রিডিং এক আছে। সুতরাং গাড়িটার দ্রুতির মান অপরিবর্তিত আছে। এক্ষেত্রে গাড়ির বেগ পরিবর্তিত হচ্ছে। যে কোন বস্তুর বেগের দিক পরিবর্তিত হলে বেগও পরিবর্তিত হবে।
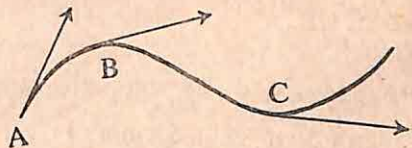
চিত্র 4.3

তিনটি কারণে বেগের পরিবর্তন আসতে পারে—(ক) দিক না পাল্টিয়ে কেবল মান পাল্টালে, (খ) মান না পাল্টিয়ে কেবল দিক পাল্টালে, এবং (গ) দিক ও মান দুইই পাল্টালে।

কোন বস্তু নির্দিষ্ট দিকে চলার সময়ে সমান অবকাশে সমান দূরত্ব অতিক্রম করলে তার বেগকে **সমবেগ** বলে। না করলে **অসমবেগ** বলে। আবার মান সমান থেকে দিক পাল্টালেও সেই বেগকে অসমবেগ বলে।

অসমবেগ বিশিষ্ট কোন বস্তু কোন নির্দিষ্ট সময়ে কোন দূরত্ব অতিক্রম করলে একক সময়ে অতিক্রান্ত গড় দূরত্বকে গড় বেগ বলে। মনে কর, কোন বস্তু t সেকেণ্ডে AB পথ যায়
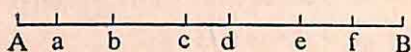
A a b c d e f B

চিত্র 4.4

(চিত্র 4·4)। মনে কর প্রথম সেকেণ্ডে Aa, দ্বিতীয় সেকেণ্ডে ab পথ অতিক্রম করে এবং এইভাবে t সেকেণ্ডের শেষে AB পথ অতিক্রম করে। তাহলে একক সময়ে বস্তুটি গড় দূরত্ব অতিক্রম করে $\frac{AB}{t}$ এবং এটিই তার গড় বেগ।

(ঘ) ত্বরণ : একক সময়ে বেগ বৃদ্ধিকে ত্বরণ বলে।

ধর, কোন বস্তু ক্রমবর্ধমান বেগ নিয়ে এগিয়ে চলেছে। তার বেগের পরিবর্তন তিনটি কারণে হতে পারে যা তোমরা একটু আগেই পড়েছ। মনে কর, কোন বস্তুর বেগ নির্দিষ্ট দিকে প্রতি 2 সেকেণ্ডে 10 cm বাড়ছে। যদি তার আদি বেগ 30 cm/s হয় তবে দ্বিতীয় সেকেণ্ডের শেষে বেগ হবে 40 cm/s, চতুর্থ সেকেণ্ডের শেষে হবে 50 cm/s ইত্যাদি। সংজ্ঞা অনুয়ায়ী ত্বরণ $= \frac{\text{বেগ বৃদ্ধি}}{\text{সময়}}$।

এক্ষেত্রে ত্বরণ $= \frac{10}{2}$ অর্থাৎ প্রতি সেকেণ্ডে 5 cm/s বা প্রতি বর্গসেকেণ্ডে 5 cm (5 cm/s/s বা 5 cm/s^2)।

দেখতে পাচ্ছ ত্বরণের একক হচ্ছে cm/s/s অর্থাৎ সেকেণ্ডের s দুবার আসছে। বর্তমানে cm/s/s লেখার প্রচলন নেই। লেখা হয় cm/s^2 বা cms^{-2}।

দৈর্ঘ্য, ভর ও সময়ের মত বেগ ও ত্বরণও ভৌত রাশি। ত্বরণের মান

থাকায় এবং ত্বরণ একটি বিশেষ দিকে নির্দিষ্ট বলে এটি ভেক্টর রাশি। প্রকাশ করা হয় a অক্ষর দিয়ে। অনেক সময় ভেক্টর বোঝাতে $\vec{a}$ লেখা হয়। আবার বেগ ও ত্বরণের একক প্রাথমিক নয়, লব্ধ।

এস আই পদ্ধতিতে ত্বরণের একক $\mathrm{m/s^2}$, সি জি এস পদ্ধতিতে $\mathrm{cm/s^2}$ এবং এফ পি এস পদ্ধতিতে $\mathrm{ft/s^2}$।

ত্বরণ দুরকমের হতে পারে—**সমত্বরণ ও অসমত্বরণ**। সমান অবকাশে বেগবৃদ্ধি সমান হলে সমত্বরণ, আর না হলে অসমত্বরণ বলে।

(ঙ) **মন্দন :** একক সময়ে বেগের হ্রাসকে মন্দন বলে। মনে কর, কোন একটি বস্তুর বেগ প্রতি সেকেণ্ডে $2\ \mathrm{cm/s}$ করে কমে। তাহলে বস্তুর মন্দন হচ্ছে $2\ \mathrm{cm/s^2}$। সুতরাং মন্দন $= -$ ত্বরণ। মন্দন হল ঋণাত্মক ত্বরণ।

মন্দন ও ত্বরণের প্রতীক ও একক এক।

জড়তা বা জাড্য

একটি মার্বেলকে আঙুলের টোকা দিলে সেটি চলতে থাকে। কিন্তু একটা টেবিলকে নড়াতে হলে বেশ জোরে ধাক্কা দেওয়া দরকার। আবার কোন বস্তুকে চালিয়ে দিলে কিছুক্ষণ পরেই থেমে যায়। তাকে সমবেগে চালাতে হলে বাইরে থেকে বল প্রয়োগের প্রয়োজন হয়। আড়াই হাজার বছর আগে গ্রীক দার্শনিক আরিস্ততল অভিজ্ঞতা থেকে এই কথাই বলেছিলেন।

পরের যুগে গ্যালিলিও কিন্তু ব্যাখ্যা করেছিলেন একটু অন্য ভাবে। তিনি বলেছিলেন, কোন বস্তুকে সমবেগে চলার জন্য বাইরের এই বলের প্রয়োজন কেবল ঘর্ষণের উপস্থিতির জন্য। তিনি যুক্তি দিয়ে বললেন, ঘর্ষণ না থাকলে কোন চলমান বস্তু চিরদিন চলতেই থাকবে। তাঁর ব্যাখ্যা সাধারণ অভিজ্ঞতার বাইরে। তাই অনেকের মনে খটকা লাগল। কোন বস্তু স্থিতিতে থাকলে অবশ্য চিরদিনই স্থিতিতে থাকবে—এই ব্যাখ্যা কারও মনে সন্দেহ জাগায়নি, কারণ এটা সাধারণ অভিজ্ঞতা।

বস্তুর এই ধর্মকে জড়তা বা জাড্য বলে। চলমান বস্তুর জড়তাকে **গতিজাড্য** ও স্থির বস্তুর জড়তাকে **স্থিতিজাড্য** বলে। জাড্য সূত্রের আদি ভাষ্যকার স্বয়ং গ্যালিলিও হলেও পরবর্তী যুগে বস্তুর গতির উপর বলের প্রভাব

নিয়ে স্যর আইজাক নিউটন তিনটি সূত্র দিয়েছিলেন। এই তিনটি সূত্র নিউটনের গতিসূত্র নামে বিখ্যাত।

নিউটনের গতিসূত্র

প্রথম সূত্র : বাইরে থেকে বল প্রয়োগ না করলে অচল বস্তু চিরদিন অচল থাকবে এবং সচল বস্তু সমবেগে সরল রেখা পথে চিরদিন চলতে থাকবে।

দ্বিতীয় সূত্র : বস্তুর ভরবেগের পরিবর্তনের হার প্রযুক্ত বলের সমানুপাতিক এবং বল যে দিকে ক্রিয়া করে ভরবেগের পরিবর্তন সেই দিকে ঘটে।

তৃতীয় সূত্র : প্রত্যেক ক্রিয়ার একটি সমান ও বিপরীত প্রতি-ক্রিয়া থাকে।

প্রথম সূত্রের ব্যাখ্যা—প্রথম সূত্রের প্রথম অংশে দেখা যায়, কোন বস্তু স্থির থাকলে চিরদিন স্থির থাকবে এবং চলতে থাকলে চিরদিন চলবে। এই অবস্থার পরিবর্তন বস্তু নিজে থেকে করতে পারে না। বস্তুর এই ধর্মকে জড়তা বলে। জড়তা বেশি হলে বস্তুর অবস্থা পরিবর্তন করতে বেশি বলের প্রয়োজন হয়। যে কোন বস্তুর জড়তা একটি মৌলিক ধর্ম। কোন বস্তুর জড়তার পরিমাপকে তার **ভর** বলে। যে বস্তুর ভর বেশি তার জড়তাও বেশি। কিছু পরেই তা জানতে পারবে।

প্রথম সূত্রের দ্বিতীয় অংশ থেকে জানতে পারবে, বল কাকে বলে। কোন বস্তুর অবস্থার পরিবর্তন করতে হলে বাইরে থেকে কিছু প্রয়োগ করতে হয়। **স্থির বস্তুকে সচল করতে বা সচল বস্তুকে অচল করতে বা বস্তুর গতি বাড়াতে বা কমাতে বা দিক পরিবর্তন করতে বাইরে থেকে যা প্রয়োগ করা হয় তাকে বলা হয় বল।** প্রতীক F।

জাড্যের উদাহরণ

ক্যারাম খেলার সময় তোমরা দেখেছ যে একটা ঘুটি আর একটা ঘুটির উপর থাকার সময় স্ট্রাইকার দিয়ে নিচের ঘুটিতে আঘাত করলে অনেক সময় উপরের ঘুটি সরে যায় না। এটা স্থিতিজাড্যের উদাহরণ। একটা গ্লাসের উপর এক

টুকরো পিজবোর্ড রেখে তার উপর একটা দশ পয়সা রাখ (চিত্র 4.5)। এখন জোরে পিজবোর্ডটাকে আঘাত করলে দেখবে মুদ্রাটি পিজবোর্ডের সঙ্গে ছুটে
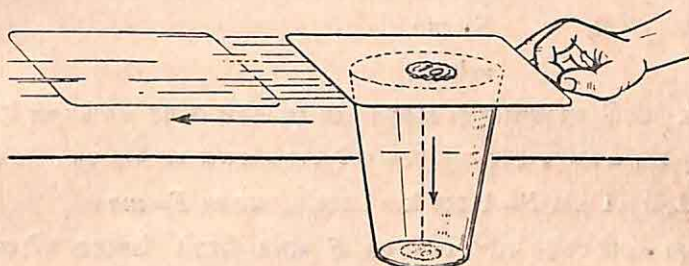
চিত্র 4.5

না গিয়ে গ্লাসের ভিতরে পড়বে। ট্রামে বাসে চলার সময়ও তোমাদের জাড্যের অভিজ্ঞতা হয়। যখন বাস হঠাৎ চলতে শুরু করে, তখন যাত্রীরা পিছন দিকে হেলে পড়ে, আবার চলন্ত বাস থামলে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে। প্রথমটি স্থিতি ও দ্বিতীয়টি গতিজাড্যের উদাহরণ। লং জাম্পের আগে খেলোয়াড় প্রথমে কিছু দুর দৌড়ে এসে তবে লাফ দেয়। তার গতিজাড্য তাকে বেশি লাফাতে সাহায্য করে।

দ্বিতীয় সূত্রের ব্যাখ্যা—দ্বিতীয় সূত্র থেকে আমরা বলের পরিমাপ এবং বল ও ত্বরণের সম্পর্ক জানতে পারি। দ্বিতীয় সূত্রের আলোচনার আগে ভরবেগের সংজ্ঞা জানতে হবে।

ভরবেগ : কোন গতিশীল বস্তুতে ভর ও বেগের সমন্বয়ে যে ধর্মের সৃষ্টি হয় তাকে ভরবেগ বা মোমেন্টাম বলে। ভরবেগের মান বস্তুর ভর ও বেগের গুণফলের সমান। ভরবেগ একটি ভেক্টর রাশি। বেগের দিক অনুযায়ী ভরবেগের দিক স্থির করা হয়। ভরবেগের একক সি জি এস পদ্ধতিতে g.cm/s, এস আই পদ্ধতিতে kg. m/s এবং এফ পি এস পদ্ধতিতে lb. ft/s। প্রতীক p।

মনে কর, সরলরেখায় চলমান কোন বস্তুর ভর m, প্রাথমিক বেগ u এবং একটি বল F বস্তুটির উপর কাজ করছে। t সেকেণ্ড পরে প্রযুক্ত বলের প্রভাবে বস্তুটির বেগ হল v।

অতএব ভরবেগের পরিবর্তন হবে $\frac{m(v-u)}{t} = ma$

অর্থাৎ প্রযুক্ত বলের প্রয়োগে বস্তুটিতে a ত্বরণের সৃষ্টি হয়েছে। সূত্র অনুযায়ী

$$F \propto ma,$$
$$= \mathrm{k}\, ma$$

k একটি সমানুপাতিক ধ্রুবক। যে বল একক ভরের একটি বস্তুর উপর প্রযুক্ত হয়ে একক ত্বরণের সৃষ্টি করে সেই বলকে একক বল বলা হয়। অর্থাৎ $m=1, a=1$ এবং $F=1$ হলে $\mathrm{k}=1$ হবে। অতএব $F=ma$।

বল একটি ভেক্টর রাশি, লেখা হয় F অক্ষর দিয়ে। উপরের সমীকরণ থেকে তোমরা বলের একক বার করতে পারবে। নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছ বলের একটি নির্দিষ্ট দিক ও একটি প্রয়োগ বিন্দু আছে।

সি জি এস পদ্ধতিতে বলের একক ডাইন, এস আই পদ্ধতিতে নিউটন এবং এফ পি এস পদ্ধতিতে পাউণ্ডাল।

ডাইন—যে বল 1 g ভরের উপর প্রযুক্ত হয়ে $1\ \mathrm{cm/s^2}$ ত্বরণ সৃষ্টি করে তাকে এক **ডাইন** বলে। ডাইন প্রকাশ করা হয় dyn লিখে। সুতরাং $1\ \mathrm{dyn} = 1\mathrm{g.\ cm/s^2}$।

নিউটন—যে বল 1 kg ভরের উপর প্রযুক্ত হয়ে $1\ \mathrm{m/s^2}$ ত্বরণ সৃষ্টি করে তাকে এক **নিউটন** বলে। নিউটনের প্রতীক চিহ্ন N। অতএব

$$1\ \mathrm{N} = 1\ \mathrm{kg.m/s^2}\text{।}$$

পাউণ্ডাল—যে বল 1 lb ভরের উপর প্রযুক্ত হয়ে $1\ \mathrm{ft/s^2}$ ত্বরণের সৃষ্টি করে তাকে এক **পাউণ্ডাল** বলে। 1 পাউণ্ডাল $= 1\ \mathrm{lb\ ft/s^2}$।

নিউটন ও ডাইনের সম্পর্ক : $1\ \mathrm{N} = 10^3\ \mathrm{g} \times 10^2\ \mathrm{cm/s^2} = 10^5\ \mathrm{dyn}$।

তৃতীয় সূত্রের ব্যাখ্যা—যদি কোন বস্তু অন্য একটি বস্তুর উপর বল প্রয়োগ করে তবে দ্বিতীয় বস্তুটিও প্রথম বস্তুর উপর একটি সমান ও বিপরীত বল প্রয়োগ করবে। প্রথম বলটিকে ক্রিয়া বলা হলে, দ্বিতীয়টিকে বলা হবে প্রতিক্রিয়া। এইটিই নিউটনের তৃতীয় সূত্র।

(ক) টেবিলের উপর একটা বই রেখেছ। বইটা ওজনের জন্য সোজা পৃথিবীর কেন্দ্রে যাওয়ার কথা। কিন্তু টেবিলের উপর স্থির ভাবে পড়ে থাকার একমাত্র কারণ হতে পারে টেবিল নিশ্চয়ই উপর দিকে সমান বল প্রয়োগ করছে।

টেবিলের প্রযুক্ত বল বেশি হলে বইটা আপনা আপনি উপর দিকে উঠত আর কম হলে টেবিল ভেদ করে নিচের দিকে নামত। টেবিলে না রেখে হাতে রাখলে অনুভব করতে পারবে মাংসপেশীর সাহায্যে তোমরা উপর দিকে বল প্রয়োগ করছ।

(খ) যখন তোমরা হাঁট তখন পা দিয়ে মাটিতে বল প্রয়োগ কর। মাটিও তোমার উপর বল প্রয়োগ করে। এই বলের সামনের অংশ তোমাকে হাঁটতে সাহায্য করে।

(গ) নৌকো থেকে লাফ দিয়ে যদি তীরে নেমে পড় দেখবে নৌকোটা পিছনে সরে যাচ্ছে। তুমি যেই নৌকোতে বল প্রয়োগ করলে, নৌকোর প্রতিক্রিয়া তোমাকে সামনের দিকে ঠেলে তীরে নামতে সাহায্য করল।

(ঘ) একটি বেলুনকে ফুলিয়ে যদি ছেড়ে দাও, দেখবে, বেলুনের মুখ দিয়ে যে দিকে হাওয়া বেরুচ্ছে, বেলুনটা তার উলটো দিকে সরে যাচ্ছে। বেলুনের মুখ দিয়ে বাতাস যখন বেরিয়ে যাচ্ছিল তখন তার প্রতিক্রিয়া বেলুনকে পিছন দিকে ঠেলে দিচ্ছিল।

(ঙ) তোমরা রকেটের কথা নিশ্চয় শুনেছ। হাউই বাজী আকাশে উঠতে নিশ্চয় দেখেছ। হাউই-এর এক প্রান্ত মোটা। তার ভিতর বিস্ফোরক পদার্থ থাকে। হাউইকে মাটির উপর বসিয়ে মাটির দিকে মুখ করে যে পলতে থাকে তাতে আগুন লাগিয়ে দিতে হয়। পলতেটা ধরলে ভিতরের বিস্ফোরক পদার্থে আগুন লাগে ও ভিতরে প্রচুর গ্যাস সৃষ্টি হয়। এই গ্যাস নিচের দিকের মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলে গ্যাসের প্রতিক্রিয়া হাউইকে উপর দিকে ঠেলে দেয়।

রকেটও একই ভাবে আকাশে ওঠে। রকেটে পর্যাপ্ত বল সৃষ্টি হলে সেটি হাউই-এর মত পৃথিবীতে ফিরে না এসে পৃথিবীর অভিকর্ষ বল এড়িয়ে মহাশূন্যে চলে যায়। রকেটের মধ্যে কঠিন বা তরল জ্বালানি থাকে। এই জ্বালানি যখন অক্সিজেনের সংস্পর্শে এসে পুড়তে থাকে তখন প্রচণ্ড গ্যাস নিচের দিকে নামতে থাকলে রকেটটি প্রতিক্রিয়ার জন্য জোরে উপর দিকে উঠতে থাকে। অনেক রকেটে পারমাণবিক জ্বালানি ব্যবহার করা হয়। অভিকর্ষ বলের প্রভাব মুক্ত হওয়ার জন্য প্রচণ্ড বল প্রয়োজন হওয়ায় রকেট সাধারণত অনেকগুলি থাক বা স্তরে বিভক্ত। একটি স্তর পুড়ে উপরে উঠে যাওয়ার পর অন্যটিতে আগুন লাগে এবং সেটি কাজ করতে থাকে।

জাড্য ভর

তোমরা পড়েছ জাড্য পদার্থের একটি ধর্ম। ধর, দুটো মার্বেল নিয়েছ, একটি অন্যটির চেয়ে ভারী। দুটো বস্তুতে যদি একই টোকা দাও অর্থাৎ একই বল প্রয়োগ কর তবে হালকা মার্বেলটি বেশি দূর যায় এবং ভারীটি কম দূর যায়। একই বল প্রয়োগে হালকাটিতে বেশি ত্বরণ ও ভারীটিতে কম ত্বরণ সৃষ্টি হয়েছে।

কোন বস্তুতে F বল প্রয়োগ করলে যদি a ত্বরণের সৃষ্টি হয়, তবে F বল a ত্বরণের সমানুপাতিক। F ও a র অনুপাতকে বস্তুর ভর বলে। বস্তুর এই ভরকে জাড্য ভর বলা হয়। দুইটি বস্তুর ভর যদি m_1 ও m_2 হয় এবং একই বলের প্রয়োগে তাদের মধ্যে a_1 ও a_2 ত্বরণের সৃষ্টি হয় তবে তাদের মধ্যের সম্পর্ক হবে

$$\frac{m_1}{m_2} = \frac{a_2}{a_1} \text{ ।}$$

সুতরাং দেখতে পাচ্ছ, একই নির্দিষ্ট বল প্রয়োগ করলে যে বস্তুতে বেশি ত্বরণের সৃষ্টি হয়, তার জড়তা কম ও যে বস্তুতে কম ত্বরণের সৃষ্টি হয় তার জড়তা বেশি।

৫ কাজ, শক্তি ও ক্ষমতা

কাজ

কাজ বা কার্য বা ইংরেজীতে ওয়ার্ক কথাটি তোমাদের অজানা নয়। নিজেরাও যে প্রতিদিন কত কাজ কর তার ঠিক নেই। খেলাধূলা, দৌড়ান, হাঁটা, মোট বওয়া, বাসন মাজা, সবই কাজ। এমন কি বই পড়াকেও তোমরা কাজ করা বল। বই পড়া কিন্তু কাজ নয়। বিজ্ঞানের ভাষায় কাজ কাকে বলে জান?

বল কাকে বলে পড়েছ। কোন বস্তুর উপর বল প্রয়োগ করলে বস্তুটি স্থানান্তরিত হয়। বস্তুটির উপর বলের প্রয়োগবিন্দু যে দূরত্বে স্থানান্তরিত হয় সেই সরণ ও বলের গুণফলকে বিজ্ঞানের ভাষায় কাজ বলে। বই পড়তে কোন বলের প্রয়োজন হয় না। সুতরাং এটা কাজ নয়। আবার কোন বস্তুর উপর বল প্রয়োগ করলে বস্তুটি যদি কোন দূরত্বে সরে না যায় তবে সেটাকেও কাজ বলা হবে না। যেমন ধর ঘরের দেওয়ালকে যত জোরেই ঠেল না কেন, নড়াতে পারবে না, সুতরাং এটাও কাজ করা হবে না।

ধর কোন বস্তুর উপর বল F প্রয়োগ করে বস্তুটিকে s দূরত্বে সরিয়েছ (চিত্র 5·1a)। এক্ষেত্রে বলের অভিমুখ ও বস্তুটির স্থানচ্যুতি একই দিকে। সংজ্ঞা অনুযায়ী কাজ $W=F.s$।
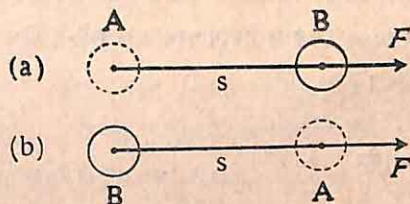
চিত্র 1.5

$F=0$ অর্থাৎ কোন স্থির বস্তুকে চুপচাপ ধরে বসে থাকলে কাজের পরিমাণ হবে শূন্য। আবার $s=0$ হলে অর্থাৎ যত জোরেই ঠেলা দাও না কেন, বস্তুটিকে না সরাতে পারলে, কাজের পরিমাণ হবে শূন্য।

বস্তুর স্থানচ্যুতি যে সব সময় বলের দিকে হবে তার কোন অর্থ নেই। চিত্র 5.1b দেখলে বুঝতে পারবে। মনে কর, একটি চলমান বস্তুকে থামাবার জন্য F বল তীর চিহ্নিত দিকে বস্তুটির চলার বিপরীত দিকে প্রয়োগ করা হল। বস্তুটির প্রাথমিক অবস্থান A এবং শেষ অবস্থান B হলে বলের প্রয়োগবিন্দু AB দূরত্বে স্থানান্তরিত হয়েছে বলের উলটো দিকে। সুতরাং কাজের মান হচ্ছে $F\times AB$। এক্ষেত্রে বলের বিরুদ্ধে কাজ হয়েছে।

কাজের মান বুঝতে কোন দিকের প্রয়োজন হয় না। বল যে দিকেই হোক না কেন বস্তু যে দূরত্বে স্থানান্তরিত হয় সেই দূরত্ব ও বল এই দুইয়ের গুণফলকে কাজ বলে। সুতরাং কাজ একটি স্কেলার রাশি। প্রতীক চিহ্ন W।

একক বল এবং বলের প্রয়োগবিন্দুর একক দূরত্বে স্থানচ্যুতির গুণফলকে বলে **একক কাজ**। সি জি এস পদ্ধতিতে কাজের একক হচ্ছে **আর্গ**। কোন বস্তুর উপর এক ডাইন বল প্রয়োগ করলে যদি বস্তুটি এক সেন্টিমিটার দূরত্ব সরে যায়, তবে মোট কাজের পরিমাণ হবে এক আর্গ। আর্গ এককটি erg অক্ষর দিয়ে প্রকাশ করা হয়। সুতরাং $1\ \text{erg} = 1\ \text{g. cm}^2/\text{s}^2$।

এস আই পদ্ধতিতে কাজের একক **জুল**। যদি এক নিউটন বল কোন বস্তুকে প্রয়োগ করলে বস্তুটি এক মিটার সরে যায় তবে সেই কাজকে এক জুল বলা হয়। জুল এককটিকে J অক্ষর দিয়ে লেখা হয়। সুতরাং $1\ \text{J} = 1\ \text{kg. m}^2/\text{s}^2$।

এফ পি এস পদ্ধতিতে কাজের একককে বলে **ফুট পাউণ্ডাল**। এক পাউণ্ডাল বল কোন বস্তুর উপর কাজ করে যদি বস্তুটিকে এক ফুট দূরত্ব সরায় তবে কাজের পরিমাণ হবে এক ফুট-পাউণ্ডাল। এককটিকে ft-poundal লেখা হয়।

শক্তি

কাজ যে সব সময় মানুষ করে তাই নয়। জড় বস্তুতেও কাজ করতে পারে। যেমন মালগাড়ি মাল বয়, পাখা ঘোরে, স্প্রিং দম দেওয়া অবস্থায় ঘড়ির কাঁটা ঘোরায়, জল টারবাইনের চাকা ঘুরিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করে ইত্যাদি। যে কোন বস্তুর কাজ করার সামর্থ্যকে বলে **শক্তি** বা ইংরেজীতে এনার্জি।

কোন বস্তুর উপর কাজ করলে বস্তুটির শক্তি বৃদ্ধি পায়। যেমন কোন বস্তুকে মাটি থেকে তুললে তার শক্তি বৃদ্ধি পায়, ঘড়ির স্প্রিংকে দম দিলে স্প্রিংটির শক্তি বৃদ্ধি পায়। আবার বস্তুটি যখন কাজ করে তখন তার শক্তি হ্রাস পায়। উপর থেকে মাটিতে পড়লে বস্তুর শক্তি হ্রাস পায়।

কাজের মত শক্তিও একটি রাশি। শক্তির একক ও কাজের একক হুবহু এক। E অথবা W অক্ষর দুটি হচ্ছে শক্তির প্রতীক চিহ্ন।

সি জি এস পদ্ধতিতে শক্তির একক আর্গ, এস আই পদ্ধতিতে জুল ও এফ পি এস পদ্ধতিতে ফুট-পাউণ্ডাল।

ক্ষমতা

এতক্ষণ কাজ করার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু সময়ের কথা বলা হয়নি। কোন কাজ এক সেকেণ্ডে করা যায়, আবার এক বছরেও করা যায়। কিন্তু কাজ করার হার দুটি ক্ষেত্রে এক নয়। মনে কর কোন কাজ W, t সময়ে করা হল। তাহলে প্রতি একক সময়ে কাজ করার হার W/t। কাজ করার হারকে **ক্ষমতা** বা পাওয়ার বলে। ক্ষমতা একটি স্কেলার রাশি। প্রকাশ করা হয় P অক্ষর দিয়ে।

এস আই পদ্ধতিতে কাজ করার একককে বলে **ওয়াট**। এক সেকেণ্ডে এক জুল কাজ করার ক্ষমতাকে বলে এক ওয়াট। এই একক W অক্ষর দিয়ে প্রকাশ করা হয়। পরে জানতে পারবে যে বিদ্যুতের ক্ষেত্রে ওয়াট এককটি ব্যবহার হয়। এক ভোল্ট বিভব প্রভেদের মধ্যে দিয়ে এক অ্যাম্পিয়র বিদ্যুৎ-প্রবাহ চলাচল করলে তার ক্ষমতা হয় এক ওয়াট। এক ওয়াট ব্যবহারিক একক হিসেবে ছোট হওয়ায় কিলোওয়াটের সংজ্ঞা থেকে আর একটি একক বর্তমানে খুব বেশি ব্যবহার করা হয়। একে বলে **কিলোওয়াট-ঘণ্টা**। এককটি লেখা হয় kWh অক্ষর দিয়ে। আমরা বাড়িতে যে বিদ্যুৎশক্তি ব্যবহার করি তার দাম দেওয়া হয় কিলোওয়াট-ঘণ্টা এককে।

এফ পি এস পদ্ধতিতে ক্ষমতার একককে বলে হর্স-পাওয়ার। প্রতি সেকেণ্ডে 550 ফুট পাউণ্ড কাজ করার ক্ষমতাকে বলে এক হর্স-পাওয়ার। লেখা হয় hp অক্ষর দিয়ে। 1 hp = 745·7 W।

স্থিতিশক্তি

স্থিতিশক্তি বা পোটেনশিয়াল এনার্জি হচ্ছে যান্ত্রিক শক্তির একটি বিশেষ রূপ। অবস্থা বা অবস্থানের জন্য কোন বস্তুর শক্তিকে বলে স্থিতিশক্তি।

মনে কর, একটি বস্তুর ওজন হচ্ছে mg। তুমি বস্তুকে h উচ্চতায় উঠিয়ে রাখলে। ওজন পৃথিবীর কেন্দ্রের অভিমুখী বল। ভূপৃষ্ঠ থেকে h উচ্চতায় বস্তুকে তুলে ধরতে তুমি এই বলের বিরুদ্ধে কাজ করেছ। সংজ্ঞা অনুযায়ী এই

কাজের পরিমাণ, বল ও যে উচ্চতায় বস্তুটিকে সরিয়ে রাখলে তাদের গুণফল। এক্ষেত্রে এই কাজের পরিমাণ mgh (চিত্র 5.2)। তুমি যে কাজ করলে সেই কাজ বস্তুতে শক্তি হয়ে জমা থাকল। শুধু যে উঁচুতে কোন বস্তুকে রাখলে স্থিতিশক্তি হয় তা নয়। বস্তুর অবস্থার জন্যও হতে পারে। কোন স্প্রিংকে দম দিলে স্প্রিংএ স্থিতিশক্তির সঞ্চার হয়। এই স্থিতিশক্তি ধীরে ধীরে ঘড়ির কাঁটা ঘোরায় অর্থাৎ কাজ করে। তীর ছোড়ার সময় ধনুকের স্থিতিশক্তি তীর ছোড়ার কাজ করে। সংকুচিত গ্যাস স্টীম এঞ্জিনে যখন পিস্টনকে সামনের দিকে ছুড়ে দেয় সেটাও স্থিতিশক্তির উদাহরণ। স্থিতিশক্তির আর একটা সুন্দর উদাহরণ দেখ। মনে কর বেশ বড় ভারী একটা পাথর মাটির উপর পড়ে আছে। তোমরা নির্ভয়ে তার পাশে দাঁড়াতে বা তার উপর উঠে বসতে পার। কিন্তু সেই পাথরটি যদি একটা দড়ি দিয়ে বেঁধে তোমার মাথার একটু উপরে ঝুলিয়ে রাখা হয়, তুমি ভয়ে কাঁপবে। একটু ভাবলেই বুঝতে পারবে ভয় তোমার পাথরটিকে নয়, অবস্থানের জন্য পাথরের স্থিতিশক্তিকে।
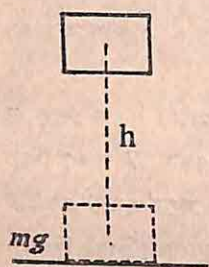
চিত্র 5.2

দৈনন্দিন জীবনে স্থিতিশক্তির অনেক উদাহরণ তোমরা পাবে।

গতিশক্তি

গতিশক্তি বা কাইনেটিক এনার্জি যান্ত্রিক শক্তির আর একটি বিশেষ রূপ। গতির জন্য কোন গতিশীল বস্তুর যে শক্তি তাকে বলে গতিশক্তি।

মনে কর, কেউ হাতুড়ি দিয়ে দেয়ালে একটা পেরেক ঠুকছে. হাতুড়িটাকে দ্রুতগতিতে টেনে এনে পেরেকের গায়ে মারছে, অর্থাৎ হাতুড়ির গতিশক্তি এখানে কাজ করছে।

বস্তুর ভর m এবং বেগ u হলে গতিশক্তি $=\frac{1}{2}m\,v^2$। এর প্রমাণ তোমরা পরে পড়বে।

গতিশক্তির অনেক উদাহরণ লক্ষ্য করলেই দেখতে পাবে। এই শক্তিকে কাজে লাগিয়ে অন্য শক্তি উৎপাদন করা যায়। জলপ্রপাতের পড়ন্ত জলের স্রোতে যখন কোন টারবাইন ঘোরান হয়, তখন তার গতিশক্তিকে কাজে

লাগিয়ে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন করা হয়। বহু প্রাচীন কাল থেকে বায়ুশক্তিকে কাজে লাগান হয়ে থাকে। এই যন্ত্রকে উইণ্ডমিল বা বাতচক্র বলে। হল্যাণ্ড দেশে সব সময় প্রচণ্ড হাওয়া বয়, সেখানে উইণ্ডমিলের খুব চলন আছে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি উইণ্ডমিল আছে। জোয়ার-ভাটার জন্য জলে যে স্রোত হয়, তাও কাজে লাগিয়ে কোন কোন দেশে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন করা হয়ে থাকে।

গতিশক্তি ও স্থিতিশক্তির রূপান্তর

তোমরা পড়েছ, গতিশক্তিকে স্থিতিশক্তিতে এবং স্থিতিশক্তিকে গতিশক্তিতে রূপান্তরিত করা যায়। সরল দোলক একটি উদাহরণ। দোলকটি যখন তার পথের সবচেয়ে নিচে আসে তখন তার বেগ সবচেয়ে বেশি হওয়ায় গতিশক্তিও সবচেয়ে বেশি। আবার দোলকটি যখন তার পথের শেষ প্রান্ত দুটির যে কোন একটিতে আসে, তখন তার বেগ শূন্য কিন্তু অবস্থানের উচ্চতা সবচেয়ে বেশি। তখন তার স্থিতিশক্তিও সবচেয়ে বেশি। দোলনের সময় দোলকটির স্থিতিশক্তি গতিশক্তিতে এবং গতিশক্তি স্থিতিশক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে থাকে। পথের অন্য যে কোন স্থানে দোলকটির স্থিতিশক্তি ও গতিশক্তি দুই থাকে এবং এই দুই শক্তির মোট পরিমাণ সর্বত্র সমান।
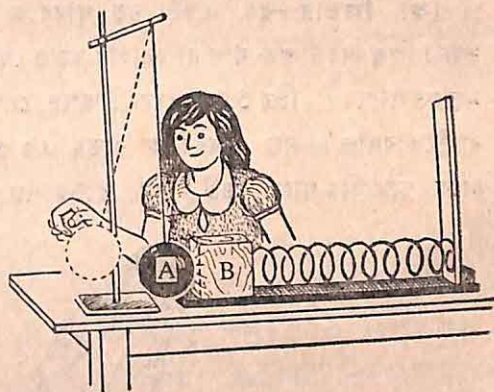
চিত্র 5.3

পরীক্ষা করে দেখ। একটা ছোট দোলক A নাও (চিত্র 5.3)। দোলকটির দোলন পথের একপাশে একটি স্প্রিং রাখা আছে। এর একটি মাথায় একটি ছোট প্লেট আটকান আছে এবং অন্য প্রান্তটি একটা বড় প্লেটে শক্ত ভাবে আটকান। A দোলকটি যখন B প্লেটে এসে সজোরে আঘাত দেয়, তখন স্প্রিংটি সংকুচিত হয়। দোলকটির গতিশক্তি স্প্রিংএর স্থিতিশক্তিতে রূপান্তরিত

হয়। এখন দোলকটি স্থির অবস্থায় এলে সংকুচিত স্প্রিংটি দোলকটিকে সজোরে ঠেলে দেয়। ফলে স্প্রিং-এর স্থিতিশক্তি আবার দোলকের গতিশক্তিতে রূপান্তরিত হয়। এই অবস্থায় গতিশক্তি ও স্থিতিশক্তি একে অন্যতে রূপান্তরিত হতে পারে।

সাধারণ যন্ত্র

যুগ যুগান্তর ধরে মানুষ তার পরিশ্রম কমাবার জন্য বিভিন্ন যন্ত্রের উদ্ভাবন করেছে। আজকের দিনে কত বড় কলকারখানা তোমরা দেখতে পাবে চার পাশে। কিন্তু সে যুগে যখন মানুষের জ্ঞান ছিল সীমাবদ্ধ, তখনও বিভিন্ন ছোটখাট যন্ত্রের সাহায্যে সে তার পরিশ্রমের লাঘব করত। লিভার এবং চাকা ও অক্ষদণ্ড বহুদিনকার ব্যবহৃত দুটি যন্ত্র।

(ক) **লিভার**—ধর, একটা বড় পাথরকে তুমি সরাবে। কাজটা বেশ শক্ত। কিন্তু একটা শক্ত বাঁশ বা লোহার রডও ছোট পাথরের সাহায্যে এটাকে নড়াতে পারবে। চিত্র 5.4-এ যেমনটি আছে, সেভাবে ছোট পাথর ও লোহার রডটিকে বসাও। বড় পাথরটিকে রডের এক প্রান্তে রেখে ছোট পাথরটিকে মাঝে রেখে তার গায়ে রডটি রাখ। রডের অন্য প্রান্তে তোমাকে চাপ দিতে হবে। লক্ষ্য কর ছোট পাথর ও বড় পাথরের মাঝের রডের অংশ, ছোট পাথর ও তোমার হাতের মাঝের রডের অংশের চেয়ে অনেক ছোট। এইবার চাপ দিলেই দেখবে বড় পাথরটি নড়ে উঠবে। তোমার দিকের রডের অংশের চেয়ে অন্য প্রান্তকে যতই ছোট করবে কাজ করার সুবিধা ততই বেশি হবে।

চিত্র 5.4

বড় বোঝা সরাবার জন্য এই ধরনের যন্ত্রকে বলা হয় **লিভার**। যে বিন্দুর

উপর লিভার রাখা হয়, তাকে বলা হয় **আলম্ব** বা ফালক্রাম। বোঝা ও আলম্বের মধ্যের লিভার অংশকে বলে **ভার বাহু** এবং প্রয়াস ও আলম্বের মধ্যের লিভারের অংশকে বলে **প্রয়াস বাহু**।

লিভারের কাজ বুঝবার আগে বলের ভ্রামক কাকে বলে দেখ। দরজা লাগাবার সময় দরজার এক প্রান্ত হাত দিয়ে ঠেল। দরজাটা কব্জাকে কেন্দ্র করে ঘোরে। কিন্তু কব্জার বেশ কাছে হাত এনে যদি দরজাটাকে ঠেল, দেখবে একই দরজাকে ঠেলতে বেশি জোর লাগছে। শুধু দরজা কেন, যে কোন জিনিসের বেলায় তোমাদের একই অভিজ্ঞতা হবে। কব্জাকে আমরা যদি অক্ষ বলি তবে বলের প্রয়োগবিন্দু যতই অক্ষের কাছে আসবে বলের পরিমাণ ততই বেশি হবে এবং প্রয়োগবিন্দু যতই অক্ষ থেকে দূরে হবে বলের পরিমাণ ততই কম হবে। চিত্র 5.5 এর ছবিটি লক্ষ্য কর। A বিন্দুটি অক্ষ এবং B বিন্দুতে F বল প্রয়োগ করা হয়েছে। বল এবং বলের প্রয়োগবিন্দু ও অক্ষের মধ্যবর্তী দূরত্বের গুণফলকে বলের **ভ্রামক** বলে। এক্ষেত্রে $F \times AB$ হচ্ছে বলের ভ্রামক। যদি AB দূরত্ব ছোট হয় তবে বলের পরিমাণ বেশি হবে। একই ভাবে AB বেশি হলে প্রয়োজনীয় বল F কম লাগবে।
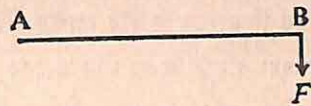
চিত্র 5.5

এইবার লিভারের কথায় ফিরে আসা যাক। চিত্র 5.6 দেখ। AB একটি লিভার এবং C বিন্দুটি AB লিভারের আলম্ব। A বিন্দুতে ভার W এবং B বিন্দুতে প্রয়াস P প্রয়োগ করা হয়েছে। AB অনুভূমিক থাকলে বলের ভ্রামক অনুযায়ী
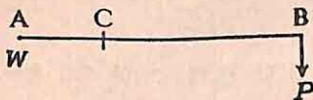
$$W \times AC = P \times BC\text{।}$$

অথবা $\dfrac{W}{P} = \dfrac{BC}{AC}$

চিত্র 5.6

উপরের সমীকরণে দেখছ BC/ACর অনুপাত বল দুটির অনুপাতের সমান। বল দুটির এই অনুপাতকে যন্ত্রের **যান্ত্রিক সুবিধা** বলে। অনুপাতটি যত বড় হবে যান্ত্রিক সুবিধা ততই বেশি হবে।

গল্প আছে, আর্কিমিডিস একবার বলেছিলেন, যদি বিরাট লম্বা একটি রড আমাকে দেওয়া হয়, আর দেওয়া হয় পৃথিবীর বাইরে দাঁড়াবার মত

একটু জায়গা, তবে আমি একাই সমস্ত পৃথিবীটাকে নড়াতে পারব। কথাটি কি ঠিক ?

লিভার তিন শ্রেণীর। উপরে বর্ণিত লিভারকে প্রথম শ্রেণীর লিভার বলে। এই লিভারে আলম্ব বিন্দুটি ভার এবং প্রয়াসের মধ্যে অবস্থিত।

তোমরা সুপারি কাটা জাঁতি দেখেছ। লক্ষ্য করলে দেখবে এখানে আলম্ব বিন্দুটি এক প্রান্তে অবস্থিত এবং ভার (এক্ষেত্রে সুপারি) আলম্ব ও প্রয়াসের মাঝখানে। এই শ্রেণীর লিভারকে দ্বিতীয় শ্রেণীর লিভার বলে। আগের মত যান্ত্রিক সুবিধা অঙ্ক কষে বার করলে দেখবে যান্ত্রিক সুবিধা একের বেশি এবং প্রযুক্ত বলের মান ভারের চেয়ে কম।

চিমটেও এক শ্রেণীর লিভার। একে মাঝখানটা টিপে ধরে খোলা প্রান্তে কয়লার বা অন্য কোন জিনিসের টুকরো চেপে তুলতে হয়। এখানেও আলম্ব বিন্দুটি এক প্রান্তে অবস্থিত এবং প্রয়াস, আলম্ব ও ভারের মধ্যে অবস্থিত। এই শ্রেণীর লিভারকে তৃতীয় শ্রেণীর লিভার বলে। এখানে যান্ত্রিক সুবিধা একের কম এবং প্রযুক্ত বলের মান ভারের চেয়ে বেশি।

তিন শ্রেণীর লিভারের আরও কয়েকটি উদাহরণ 5.7 চিত্রে দেখান হল।

চিত্র 5.7

(খ) **চাকা ও অক্ষদণ্ড**—চাকার সাহায্যে কুয়ো থেকে জল তুলতে তোমরা দেখেছ। গ্রাম অঞ্চলে বিশেষ করে বিহার, উত্তর প্রদেশের গ্রামাঞ্চলে এর প্রচলন খুব বেশি। এই ধরনের একটি যন্ত্র (চিত্র 5.8) পরের পৃষ্ঠায় দেখান হল। বড় চাকার দড়িটি ধরে যখন টানা হয় তখন চোঙের গায়ে জড়ান দড়িটি জড়িয়ে ছোট হতে থাকে এবং বালতিটা কুয়ো থেকে উঠতে থাকে।

একটা বড় চাকা, একটি সমাক্ষ চোঙে লাগান থাকে। সমাক্ষ চোঙটির দুই প্রান্ত দুটি খুঁটির উপর রাখা আছে। চোঙের গায়ে আটকান দড়িটার

এক প্রান্ত সমাক্ষ দণ্ডে লাগান থাকে, অন্য প্রান্তে বালতিটা ঝোলান থাকে। বড় চাকার গায়ের দড়ির এক প্রান্ত চাকার গায়ে লাগান থাকে, অন্য প্রান্তে বল প্রয়োগ করতে হয়। যখন দড়িটা ধরে টানা হয়, তখন বড় চাকা ঘুরতে থাকে এবং সেই সঙ্গে ছোট চাকাও ঘোরে। এবার দেখা যাক এই যন্ত্রের যান্ত্রিক সুবিধা কত। মনে কর, বড় চাকার ব্যাসার্ধ a এবং চোঙের ব্যাসার্ধ b। বড় চাকার দড়িতে টান P এবং বালতির ওজন ধর Q। বলের ভ্রামক অনুযায়ী যান্ত্রিক সুবিধা $\frac{Q}{P}=\frac{a}{b}$। a এবং bর অনুপাত যতই বাড়ান যাবে, যান্ত্রিক সুবিধাও তত বাড়বে। বড় চাকার বদলে অনেক সময় চোঙের গায়ে একটা হাতল লাগান থাকে। এক্ষেত্রে চোঙের অক্ষ থেকে হাতলের দূরত্ব চোঙের ব্যাসার্ধের চেয়ে বড় হওয়া দরকার।
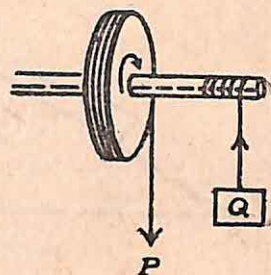
চিত্র 5.8

নত তল

তোমরা হয়ত দেখে থাকবে ঢালু কাঠের তক্তা পেতে তার উপর ভারী বোঝা গড়িয়ে উপরে তোলা হয়ে থাকে। বিশেষ করে ট্রাকে ভারী বোঝা বা তেলের পিপে তোলার সময় কাঠের পাটাতনের সাহায্য নেওয়া হয়। এ ভাবে বোঝা
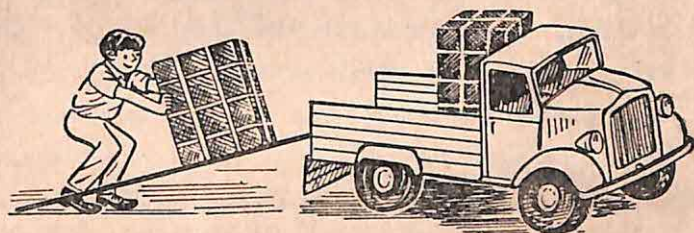
চিত্র 5.9

তুলতে বোঝার ওজনের তুলনায় কম বল প্রয়োগ করতে হয়। কোন সমতল অনুভূমিক ভাবে না থেকে তলটি যদি ভূমিতলের সঙ্গে একটি কোণ করে থাকে তাকে বলে **নত তল** বা **আনত তল** এবং ইংরেজীতে ইনক্লাইনড প্লেন।

মনে কর AB ভূমিতলের সঙ্গে কোণ করে একটি পাটাতন AC রাখা আছে (চিত্র 5.10)। সুতরাং AC একটি নত তল, বোঝাটি নত তলের নিচ A থেকে উপরে C পর্যন্ত নেওয়া হল এবং তার জন্য P বল প্রয়োগ করতে হল। এর জন্য কাজ হল $P \times AC$। নত তল দিয়ে তোলা হলেও আসলে বোঝাটি তোলা হয়েছে ভূমিতল B থেকে C পর্যন্ত। বোঝার ওজন যদি W হয় তবে সোজাসুজি BC পথে তুললে কাজের পরিমাণ হয় $W \times BC$। ভিন্ন পথে তোলা হলেও কাজের পরিমাণ দুক্ষেত্রেই সমান।
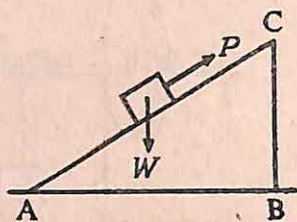
চিত্র 5.10

অর্থাৎ $W \times BC = P \times AC$

$$\therefore \text{ যান্ত্রিক সুবিধা } \frac{W}{P} = \frac{AC}{BC}$$

কোণটি যত ছোট হবে তত BC অপেক্ষা AC বড় হবে এবং যান্ত্রিক সুবিধা বাড়বে।

৬ তাপ

তাপ কী

কোন্ বস্তু গরম বা কোন্ বস্তু ঠাণ্ডা তা তোমরা সহজেই বুঝতে পার। ধূমায়িত এক কাপ চা যে গরম সেটা কাউকে বলে দিতে হয় না। সেই গরম চা-ই আবার খানিকক্ষণ রেখে দিলে ঠাণ্ডা হয়ে যায়। তাপে বস্তু গরম হয়, সবাই জানে। কিন্তু তাপ কী এবং তা কি ভাবে পাওয়া যায়?

প্রায় দুহাজার বছর আগে গ্রীক দার্শনিক প্লেটো বলেছিলেন, 'তাপ পাওয়া যায় ধাক্কা, ঘর্ষণ এবং গতি থেকে।' সপ্তদশ শতাব্দীতে ফ্রান্সিস বেকন বলেন, 'তাপ গতি ছাড়া অন্য কিছু নয়।' তিনি সরষেকে বলতেন 'গরম' এবং চাঁদের আলোকে বলেছিলেন 'ঠাণ্ডা'। ওই একই শতাব্দীতে হয়গেন্স্ বলতেন যে, আগুন ও আগুনের শিখায় দ্রুতগতিসম্পন্ন এক ধরনের কণা থাকে যা কঠিন বস্তুকে গলাতে পারে। কয়েক বছর পরে জন লক নামে একজন বৈজ্ঞানিক বলেন, তাপ হচ্ছে বস্তুর অচেতন অংশের দ্রুত আলোড়ন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে রবার্ট হুক বলেন, কোন বস্তুর গরম হওয়ার কারণ বস্তুর দেহে কণাগুলির দ্রুত আলোড়ন। রবার্ট বয়েল এই মতবাদ সমর্থন করেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে লাভয়সিয়ে এবং লাপ্লাস এই মতবাদ সমর্থন করেন। এই মতবাদকে সে যুগে যান্ত্রিক মতবাদ বা মেক্যানিকাল থিওরি বলা হত। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে আর একটি মতবাদ প্রচলিত হয়—নাম ক্যালরিক মতবাদ। এই মতবাদ অনুযায়ী তাপ হচ্ছে এক ধরনের অদৃশ্য বস্তু, যা গরম বস্তু থেকে ঠাণ্ডা বস্তুতে যেতে পারে। এই অদৃশ্য বস্তুকে বলা হত ক্যালরিক।

তাপের সঠিক ব্যাখ্যা দেবার প্রথম চেষ্টা করেন কাউণ্ট রামফোর্ড (1798)। গল্প আছে, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে তিনি তুরপুন দিয়ে কামানের মাঝে গর্ত করার কাজের তদারকি করছিলেন। একদিন লক্ষ্য করেন যে, এই কাজে প্রচণ্ড তাপ উৎপন্ন হচ্ছে। তাপের পরিমাণ এত বেশি যে আগুন ছাড়াই বেশ কিছুটা জল ফোটাতে তিনি সমর্থ হন। তিনি এটাও লক্ষ্য করেন যে, এই তাপের পরিমাণ সীমাহীন অর্থাৎ যতক্ষণ গর্ত করার কাজ চলবে

ততক্ষণ তাপ উৎপন্ন হবে। ঠিক একই সময়ে (1778—1829) ইংরেজ বৈজ্ঞানিক হামফ্রে ডেভি বায়ুশূন্য স্থানে শূন্য তাপমাত্রার নিচে দু টুকরো বরফ কেবলমাত্র ঘষে গলান। তাপ যে বস্তুকণার গতিশক্তির বাহ্য প্রকাশ এই মতবাদ ক্রমশ দানা বাঁধতে লাগল। এই মতবাদকে চূড়ান্ত রূপ দেন ইংরেজ বৈজ্ঞানিক জেমস প্রেস্কট জুল তাঁর দীর্ঘ ছ বছরের (1843—1849) পরীক্ষার সাহায্যে। তিনি পরীক্ষা করে দেখান, এক একক তাপ উৎপাদন করতে নির্দিষ্ট পরিমাণ যান্ত্রিক শক্তির প্রয়োজন। সেই থেকে জানা গিয়েছে—তাপ হচ্ছে এক ধরনের শক্তি—অণুগুলির মোট গতিশক্তির সমান। কোন বস্তুর 'উষ্ণতা' বাড়লে অণুগুলির গতিশক্তিও সঙ্গে সঙ্গে বাড়ে।

তাপ ও শক্তি

যে কোন দুটো বস্তু নিয়ে ঘষতে থাক, দেখবে দুটো বস্তুই গরম হয়ে উঠেছে। একটা লোহার মাথায় যদি হাতুড়ি দিয়ে ঠুকতে থাক দেখবে লোহার টুকরোটা গরম হয়ে উঠেছে। শীতের দিনে হাত দুটো ঘষে গরম করার অভিজ্ঞতা তোমাদের অনেকেরই আছে। এক টুকরো পাথর মেঝেতে ঘষলে দেখবে, পাথরটা গরম হয়ে উঠেছে। যখন দেশলাই তৈরি হয়নি, চকমকি পাথর ঠুকে আগুন ধরান হত। আজকাল লাইটারেও পাথর ঘষে আগুন জালান হয়। ছুরি কাঁচি শান দেওয়ার সময় আগুনের ফুলকি ছোটে দেখেছ। উপরের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই তাপ উৎপন্ন হয়—বস্তুগুলির গতিশক্তি তাপে রূপান্তরিত হওয়ার জন্য। এক টুকরো শিরীষ কাগজ নিয়ে মাটিতে ঘষে হাত দিয়ে দেখবে কাগজের টুকরোটা গরম হয়ে উঠেছে। এক্ষেত্রে গতিশক্তি তাপে রূপান্তরিত হয়েছে। আর একটা পরীক্ষা করে দেখ। একটা ছোট টেস্ট টিউবে ধাতুর কিছু টুকরো নাও। একটা থার্মোমিটারের সাহায্যে ধাতুর টুকরোগুলোর তাপমাত্রা দেখে নাও। এইবার থার্মোমিটারটা বার করে নিয়ে টেস্ট টিউবের মুখে একটা ছিপি আটকে দাও। পরে বেশ কিছুক্ষণ ধরে ছিপি সমেত টেস্ট টিউবের মুখটা উপরে ও নিচে নামিয়ে উলটো ও সোজা করতে থাক। থার্মোমিটার দিয়ে আর একবার ধাতুর টুকরোগুলোর তাপমাত্রা নাও। দেখবে, তাপমাত্রা বেড়েছে। এইক্ষেত্রে টুকরোগুলোর স্থিতিশক্তি তাপমাত্রায় পরিণত হয়েছে।

উপরের উদাহরণ থেকে বুঝতে পারছ যে, যান্ত্রিক শক্তি তাপে রূপান্তরিত হতে পারে। যখন কয়লা পোড়াও তখন কয়লার রাসায়নিক শক্তি তাপে রূপান্তরিত হয়। সেই ভাবে বিদ্যুৎ বা তড়িৎ প্রবাহ যখন রোধে বাধা প্রাপ্ত হয়, তখন বিদ্যুৎশক্তি তাপে রূপান্তরিত হয়। সুতরাং তাপও শক্তির একটা বিশেষ রূপ।

তাপ ও তাপমাত্রা

কোনটা গরম কোনটা ঠাণ্ডা সহজেই তোমরা বলতে পার। চায়ের কাপে আঙুল ডুবিয়ে বলতে পার চা গরম, আবার আইসক্রিম হাতে নিয়ে সহজেই বলতে পার এটা ঠাণ্ডা। কোন বস্তু কি পরিমাণ গরম বা কি পরিমাণ ঠাণ্ডা জানা যায় তাপমাত্রা দিয়ে। কিন্তু হাত দিয়ে বা আঙুল ডুবিয়ে তাপমাত্রা অনুভব করা সম্ভব নয়। কেন নয়, তোমরা আগেই পড়েছ।

অনেক সময় তাপ ও তাপমাত্রা আমরা একই অর্থে ব্যবহার করি। তাপ হল শক্তি, আর সেই তাপ প্রয়োগে বস্তুর উষ্ণতা কতটা বাড়ল, তার মান হল তাপমাত্রা। একই তাপশক্তির প্রয়োগে বিভিন্ন বস্তুর উষ্ণতা বা তাপমাত্রা ভিন্ন ভিন্ন হয়। সেটা বস্তুটির ধর্ম। ধর, এক কেটলি ফুটন্ত জল, একটি ছোট ও একটি বড় পাত্রে রাখা হল। এই অবস্থায় দেখা যাবে, দুটির তাপমাত্রা এক। কিন্তু বড়টিতে তাপের পরিমাণ ছোটটির চেয়ে অনেক বেশি।

যখন কোন বস্তুতে তাপ প্রয়োগ কর, অর্থাৎ বস্তুকে গরম কর, তখন বস্তু তাপ শোষণ করে। তাপশোষণের জন্য বস্তুর অণু বা পরমাণুর গতি বাড়ে, ফলে গতিশক্তিও বাড়ে। সব অণু পরমাণুগুলির গতিশক্তি কিন্তু এক নয়। তবে নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় তাদের গতিশক্তির গড় মান নির্দিষ্ট থাকে। যে কোন তাপমাত্রায় গতিশক্তির গড় মান সেই তাপমাত্রার সমানুপাতিক। তাপমাত্রা বাড়লে গতিশক্তির গড় মান বাড়ে, কমলে এই মান কমে।

একটা গরম বস্তুকে একটা ঠাণ্ডা বস্তুর সংস্পর্শে নিয়ে এলে গরম বস্তুটি তাপ হারায় ও ঠাণ্ডা বস্তুটি তাপ গ্রহণ করে। গরম বস্তু থেকে ঠাণ্ডা বস্তুতে তাপপ্রবাহ ততক্ষণ চলবে, যতক্ষণ না বস্তু দুটির তাপমাত্রা সমান হয়। সুতরাং দুটি অসম তাপবিশিষ্ট বস্তুকে একত্রে আনলে তাপ কোন দিকে প্রবাহিত হবে নির্ভর করে বস্তু দুটির তাপমাত্রার পার্থক্যের উপর।

তাপের প্রয়োগে বস্তুর কোন ভৌত ধর্মের পরিবর্তন হলে সেই পরিবর্তিত ধর্মের সাহায্যে তাপমাত্রা মাপা হয়। যেমন পারদের এবং গ্যাসের আয়তনের পরিবর্তনের সাহায্যে বা তড়িৎ-পরিবাহীর রোধ পরিবর্তনের সাহায্যে তাপমাত্রা মাপা হয়।

পারদ থার্মোমিটারে কি ভাবে তাপমাত্রা মাপা হয়, আগে পড়েছ। বরফের হিমাঙ্ক ও প্রমাণ চাপে জলের স্ফুটনাঙ্ককে থার্মোমিটারের নিম্ন ও উচ্চ স্থিরাঙ্ক ধরা হয়। তাপমাত্রার এই অন্তরফলকে বিভিন্ন থার্মোমিটারে বিভিন্ন ভাবে ভাগ করা হয়ে থাকে।

তাপ পরিমাপের একক

বিভিন্ন পদ্ধতিতে তাপের একক বিভিন্ন। তাপ একটি শক্তি। সেইজন্য এস আই পদ্ধতিতে তাপ জুল (J) এককে প্রকাশ করা হয়। সি জি এস পদ্ধতিতে তাপের এককের নাম ক্যালরি। 4°C উষ্ণতায় বিশুদ্ধ এক গ্রাম জলের 1°C তাপমাত্রা বাড়াতে যে তাপশক্তির প্রয়োজন হয়, তাকে এক **ক্যালরি** বলে। তাপকে Q চিহ্ন দিয়ে ক্যালরিকে cal কথা দিয়ে প্রকাশ করা হয়। ক্যালরি একটা ছোট একক। সেজন্য আর একটা বড় একক ব্যবহার করা হয়—নাম কিলোক্যালরি। 1 kg জলের তাপমাত্রা 1°C বাড়াতে যে তাপের প্রয়োজন হয় তাকে এক কিলোক্যালরি বলে। কিলোক্যালরি প্রকাশ করা হয় kcal কথা দিয়ে। অনেক সময় Cal কথাটি লিখেও প্রকাশ করা হয়। ব্রিটিশ পদ্ধতিতে তাপ পরিমাপের জন্য যে একক ব্যবহার করা হয় তাকে **ব্রিটিশ থার্মাল একক** বলে। এই একক এক পাউণ্ড জলের এক ডিগ্রি ফারেনহাইট তাপমাত্রা বাড়াতে প্রয়োজনীয় তাপশক্তির সমান। ব্রিটিশ থার্মাল একককে B Th U লেখা হয়। থার্ম নামে আর একটি বড় একক এই পদ্ধতিতে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। 1 থার্ম $=10^5$ B Th U। এক ব্রিটিশ থার্মাল একক = 252 ক্যালরি।

আপেক্ষিক তাপ

তোমরা যদি লোহা, তামা, পিতল, দস্তা প্রভৃতি বিভিন্ন বস্তুকে গরম করতে থাক, তবে দেখবে সকলে একই হারে গরম হচ্ছে না। লোহা, তামা, পিতল

প্রভৃতি ধাতুর কয়েকটি গোলক নাও। ধর, গোলকগুলির ভর সমান। যদি গোলকগুলিকে গরম করতে থাক তবে দেখা যাবে, সকলে একই হারে গরম হচ্ছে না। অর্থাৎ তাদের তাপগ্রহণের মাত্রা সমান নয়। সেই রকম যদি গোলকগুলিকে ঠাণ্ডা করতে থাক তবে তাদের তাপ বর্জনের পরিমাণও দেখা যাবে এক নয়। তাপগ্রহণ ও বর্জনের হার বস্তুটির ধর্মের উপর নির্ভর করে। একটি পরীক্ষা করে দেখ। উপরের বিভিন্ন পদার্থের সম ভরের গোলকগুলিকে নির্দিষ্ট তাপ দেওয়ার পর ট্রেতে জমানো মোমের স্তরের উপর রাখ। দেখবে নির্দিষ্ট সময়ে মোম গলার পরিমাণ সকল ক্ষেত্রে সমান নয়। তামা বেশি মোম গলিয়েছে, কিন্তু লোহা অনেক কম। বস্তুর তাপ গ্রহণ ও বর্জনের ধর্মকে তার আপেক্ষিক তাপ বলে।

আপেক্ষিক তাপের সংজ্ঞা হল—একক ভরের বস্তুর একক তাপমাত্রা বৃদ্ধির জন্য যে পরিমাণ তাপশক্তির প্রয়োজন তাকে বস্তুটির **আপেক্ষিক তাপ** বলে।

সি জি এস পদ্ধতিতে কোন বস্তুর আপেক্ষিক তাপ হল বস্তুর 1 g ভরের 14·5°C থেকে 15·5°C পর্যন্ত 1°C তাপমাত্রা বৃদ্ধির জন্য ক্যালরি এককে যে পরিমাণ তাপশক্তির প্রয়োজন। আপেক্ষিক তাপের একক সি জি এস পদ্ধতিতে হল cal/g°C। 4°C উষ্ণতার জলের আপেক্ষিক তাপকে এক ধরা হয়। এস আই পদ্ধতিতে বস্তুর এক কিলোগ্রাম ভরের এক কেলভিন তাপমাত্রা বৃদ্ধির জন্য জুল এককে যে পরিমাণ তাপশক্তির প্রয়োজন তাকে বস্তুটির আপেক্ষিক তাপ বলে। এস আই পদ্ধতিতে আপেক্ষিক তাপের একক হল J/kgK। তোমরা আগেই পড়েছ O°C = 273.16K। কিন্তু এক ডিগ্রি তাপমাত্রার অন্তর কেলভিন ও সেলসিয়াস এককে এক। সুতরাং আপেক্ষিক তাপের ক্ষেত্রে J/kgK কে অনেক সময় J/kg°C লেখা হয়।

ব্রিটিশ পদ্ধতিতে কোন বস্তুর এক পাউণ্ড ভরেরএক ফারেনহাইট তাপমাত্রা বৃদ্ধির জন্য ব্রিটিশ থার্মাল এককে যে তাপশক্তির প্রয়োজন তাকে বস্তুটির আপেক্ষিক তাপ বলে। এফ পি এস পদ্ধতিতে আপেক্ষিক তাপের একক B Th U/lb°F লেখা হয়।

বস্তুর তাপগ্রাহিতা

কোন বস্তুর একক তাপমাত্রা পরিবর্তন করতে যেপরিমাণ তাপের প্রয়োজন হবে তাকে বস্তুর **তাপগ্রাহিতা** বা **থার্মাল ক্যাপ্যাসিটি** বলে। যদি বস্তুর

ভর m এবং আপেক্ষিক তাপ c হয় তবে একক তাপমাত্রা পরিবর্তন করতে মোট তাপের প্রয়োজন হবে mc, এবং এটিই হচ্ছে বস্তুর তাপগ্রাহিতা। যদি বস্তুটির ভর এক হয়, তবে বস্তুর তাপগ্রাহিতা বস্তুর আপেক্ষিক তাপের সমান হবে। অতএব, একক ভর বিশিষ্ট বস্তুর তাপগ্রাহিতা বস্তুর আপেক্ষিক তাপের সমান। সি জি এস পদ্ধতিতে তাপগ্রাহিতা ক্যালরি এককে, ব্রিটিশ পদ্ধতিতে ব্রিটিশ থার্মাল এককে এবং এস আই পদ্ধতিতে জুল এককে প্রকাশ করা হয়।

বস্তুর জল-তুল্যাঙ্ক

কোন বস্তুর 1°C তাপমাত্রা বৃদ্ধির জন্য যে পরিমাণ তাপ লাগে, সেই তাপ যে পরিমাণ জলের 1°C তাপমাত্রা বাড়াতে পারে সেই পরিমাণ জলকে বস্তুর **জল-তুল্যাঙ্ক** বা ওয়াটার ইকুউইভ্যালেন্ট বলে। কোন বস্তুর ভর m ও আপেক্ষিক তাপ c। বস্তুটির তাপগ্রাহিতা তাহলে mc ক্যালরি। কিন্তু সংজ্ঞা অনুযায়ী এক ক্যালরি তাপশক্তি 1 g জলের 1°C তাপমাত্রা বৃদ্ধি করতে পারে। অতএব, mc ক্যালরি তাপশক্তি mc গ্রাম জলকে 1°C উষ্ণ করতে পারে। অতএব, ঐ বস্তুর জলতুল্যাঙ্ক হচ্ছে mc গ্রাম।

তাপগ্রাহিতা ও জল-তুল্যাঙ্ক প্রত্যেকটিই ভর ও আপেক্ষিক তাপের গুণফল। প্রথমটির একক ক্যালরি এবং দ্বিতীয়টির একক গ্রাম।

তাপ ও কাজ

ইংরেজ বৈজ্ঞানিক জেমস্ প্রেস্কট জুলের কথা তোমরা আগেই শুনেছ। তিনিই প্রথম পরীক্ষা করে দেখান যে, যখন কোন যান্ত্রিক শক্তি তাপশক্তিতে রূপান্তরিত হয়, তখন নির্দিষ্ট পরিমাণ যান্ত্রিক শক্তি থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ তাপশক্তি পাওয়া যায় এবং একটি অন্যটির সমানুপাতিক। যান্ত্রিক শক্তিকে W এবং তাপশক্তিকে H অক্ষর দিয়ে যদি প্রকাশ করা হয় তবে $W \propto H$ অথবা $W = JH$। J একটি ধ্রুবক। যদি H এক ক্যালরি হয় তবে $W = J$।

সুতরাং ধ্রুবক J হচ্ছে এক ক্যালরি তাপ উৎপন্ন করতে প্রয়োজনীয় যান্ত্রিক শক্তি। এই ধ্রুবককে বলা হয় **তাপের যান্ত্রিক তুল্যাঙ্ক** বা মেক্যানিকাল ইকুউইভ্যালেন্ট অফ হীট। জুলের নাম অনুসারে ধ্রুবকটি J অক্ষর দিয়ে প্রকাশ

করা হয়। এই ধ্রুবকের মান 4·18 J/cal। ধ্রুবক J এবং শক্তির একক J দুটি আলাদা মনে রেখো।

তাপের সাহায্যে কিভাবে কাজ করা হতে পারে একটি পরীক্ষার সাহায্যে দেখ। একটি ফ্লাস্কে কিছু জল নাও। ফ্লাস্কটির মুখ ছিপি আটকে ভিতরে একটি ছোট নল প্রবেশ করাও (চিত্র 6.1)। একটি কাচের নল আলগাভাবে ছিপির নলটির উপর বসাও। উপরের নলটির দুই স্থচলো প্রান্ত বিপরীত দিকে লম্বভাবে মুখ করে আছে একই অনুভূমিক তলে। ফ্লাস্কের জল কিছুক্ষণ গরম কর। দেখবে বাষ্প নলের দুই প্রান্ত দিয়ে যখন বেরিয়ে আসছে তখন নলটি ঘুরতে থাকবে। এটি তাপশক্তির যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত হওয়ার উদাহরণ।
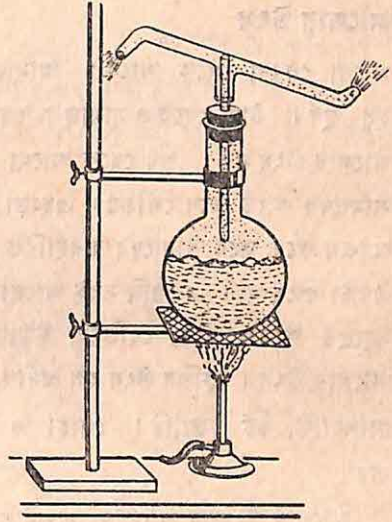
চিত্র 6.1

স্টীম এঞ্জিনের সাহায্যে ট্রেন চলতে তোমরা দেখে থাকবে। পেট্রোল এঞ্জিনে মোটর গাড়ি বা বাস চলে। ডিজেল এঞ্জিনে বড় বড় ট্রাক চলে। আসলে কিন্তু সব এঞ্জিন চলার মূলে রয়েছে—তাপ। তাপ স্থষ্টি হয় বলেই এঞ্জিনগুলি চলে।

৭ আলোক

আলোর উৎস

আলো কোথা থেকে আসে? আমাদের পৃথিবীতে আলোর সর্বপ্রধান উৎস হল সূর্য। চাঁদ থেকেও সামান্য আলো আমরা পাই, যদিও চাঁদ নিজে ঠিক আলোর উৎস নয়। সূর্য থেকে আলো এসে চাঁদে পড়ে, সেখান থেকে আবার আমাদের কাছে এসে পৌঁছয়। এছাড়া রাতের আকাশে আরও অসংখ্য নক্ষত্র জলজল করে, তবে আমাদের ব্যবহারিক কাজে এইসব আলোর উৎসগুলি বড় একটা লাগে না। এইগুলি সবই আলোর স্বাভাবিক উৎস। জোনাকি, গভীর সমুদ্রের অনেক মাছ, রেডিয়ম, ইউরেনিয়মের লবণ ইত্যাদিও স্বাভাবিক আলোর উৎস। কৃত্রিম উৎস হল প্রদীপ, মোমবাতি, লণ্ঠন, ইলেকট্রিক আলো, গ্যাসবাতি, টর্চ ইত্যাদি। লোহা ও পাথর ঘষলে আলোর ফুলকি পাওয়া যায়।

আলোর উৎসকে আলোর **প্রভব** বলা হয়ে থাকে। একটু লক্ষ্য করলেই বুঝবে যে আলোর উৎস দু রকমের। যে উৎস নিজেই আলো দিতে পারে তাকে **স্বপ্রভ** বস্তু বলে। যেমন—সূর্য, নক্ষত্র, মোমবাতি ইত্যাদি। আর এক রকমের উৎস আছে যারা পরের আলোয় আলোকিত। এদের বলে **অপ্রভ** বস্তু। চাঁদ এবং বৃহস্পতি, শুক্র প্রভৃতি গ্রহগুলি অপ্রভ বস্তু। আমাদের চারপাশের বেশির ভাগ বস্তুই, যেমন চেয়ার, টেবিল, পেন ইত্যাদি সবই অপ্রভ বস্তু।

স্বচ্ছ ও অনচ্ছ বস্তু

যে বস্তুর ভিতর দিয়ে আলো যেতে পারে তাকে আমরা **স্বচ্ছ** বস্তু বলি, যেমন কাচ। কাচ ভেদ করে আমরা দেখতে পাই। যে বস্তুর ভিতর দিয়ে আলো যায় না এবং আমরা দেখতে পাই না তাকে **অনচ্ছ** বস্তু বলে। স্বচ্ছ ও অনচ্ছ বস্তুর মাঝামাঝি আর এক ধরনের বস্তু আছে যাদের মধ্যে দিয়ে আলো আংশিক ভাবে যেতে পারে। এদের বলে **ঈষদচ্ছ** বস্তু। ঘষা কাচ তোমরা নিশ্চয়ই দেখেছ। তেলে ভেজা কাগজও এই জাতীয় উদাহরণ। পরিষ্কার

জলের পাতলা স্তর স্বচ্ছ, কিন্তু জলের স্তর পুরু হলে ঈষদচ্ছ হয়। অনেকগুলি স্বচ্ছ কাচ উপরে রাখলে ঈষদচ্ছ দেখায়।

আলো-রশ্মি

উৎসকে কেন্দ্র করে আলো চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। আলোর যে কোন একটি পথকে আলো-রশ্মি বলে। সেই আলো-রশ্মির গুচ্ছকে আলো-রশ্মিগুচ্ছ বলে। আলো-রশ্মিগুচ্ছ থেকে একটি আলো-রশ্মি আলাদা করা সম্ভব নয়। আলো-

চিত্র 7.1

রশ্মি বা রশ্মিগুচ্ছের পথ তীর চিহ্নিত সরলরেখা দিয়ে প্রকাশ করা হয়। তীরের মুখটি আলোর গতিপথ নির্দেশ করে।

রশ্মিগুচ্ছ তিন রকমের: (ক) **সমান্তরাল,** (খ) **অপসারী** ও (গ) **অভিসারী**। সমান্তরাল রশ্মিগুচ্ছে রশ্মিগুলো একে অন্যের সমান্তরাল (চিত্র 7.1a)। বহু দূর থেকে আসা আলোর রশ্মিগুচ্ছকে সমান্তরাল বলা যেতে পারে। অপসারী রশ্মিগুলি একটি বিন্দু থেকে বার হয়ে বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়েছে মনে হয় (চিত্র 7.1b)। কোন মাধ্যমে রশ্মিগুচ্ছের রশ্মিগুলি যদি একটি বিন্দুতে এসে মিলিত হয় তবে তাদের অভিসারী আলো-রশ্মিগুচ্ছ বলে (চিত্র 7.1c)।

আলোর প্রতিফলন

ঘরের বাইরে সূর্যের আলো ঝলমল করছে, অথচ ঘরে ঢোকে না। একটা আয়নার উপর সেই আলো ফেলে আয়নাটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সহজেই ঘরের মধ্যে আলো ঢোকানো যায়। তোমরা অনেকেই নিশ্চয় এ রকম করে দেখেছ। আয়না থেকে ঘরে যে আলো এল তা প্রতিফলনের সাহায্যে। একটি টেনিস

৭ আলোক

আলোর উৎস

আলো কোথা থেকে আসে ? আমাদের পৃথিবীতে আলোর সর্বপ্রধান উৎস হল সূর্য। চাঁদ থেকেও সামান্য আলো আমরা পাই, যদিও চাঁদ নিজে ঠিক আলোর উৎস নয়। সূর্য থেকে আলো এসে চাঁদে পড়ে, সেখান থেকে আবার আমাদের কাছে এসে পোঁছয়। এছাড়া রাতের আকাশে আরও অসংখ্য নক্ষত্র জলজল করে, তবে আমাদের ব্যবহারিক কাজে এইসব আলোর উৎসগুলি বড় একটা লাগে না। এইগুলি সবই আলোর স্বাভাবিক উৎস। জোনাকি, গভীর সমুদ্রের অনেক মাছ, রেডিয়ম, ইউরেনিয়মের লবণ ইত্যাদিও স্বাভাবিক আলোর উৎস। কৃত্রিম উৎস হল প্রদীপ, মোমবাতি, লণ্ঠন, ইলেকট্রিক আলো, গ্যাসবাতি, টর্চ ইত্যাদি। লোহা ও পাথর ঘষলে আলোর ফুলকি পাওয়া যায়।

আলোর উৎসকে আলোর **প্রভব** বলা হয়ে থাকে। একটু লক্ষ্য করলেই বুঝবে যে আলোর উৎস দু রকমের। যে উৎস নিজেই আলো দিতে পারে তাকে **স্বপ্রভ** বস্তু বলে। যেমন—সূর্য, নক্ষত্র, মোমবাতি ইত্যাদি। আর এক রকমের উৎস আছে যারা পরের আলোয় আলোকিত। এদের বলে **অপ্রভ** বস্তু। চাঁদ এবং বৃহস্পতি, শুক্র প্রভৃতি গ্রহগুলি অপ্রভ বস্তু। আমাদের চারপাশের বেশির ভাগ বস্তুই, যেমন চেয়ার, টেবিল, পেন ইত্যাদি সবই অপ্রভ বস্তু।

স্বচ্ছ ও অনচ্ছ বস্তু

যে বস্তুর ভিতর দিয়ে আলো যেতে পারে তাকে আমরা **স্বচ্ছ** বস্তু বলি, যেমন কাচ। কাচ ভেদ করে আমরা দেখতে পাই। যে বস্তুর ভিতর দিয়ে আলো যায় না এবং আমরা দেখতে পাই না তাকে **অনচ্ছ** বস্তু বলে। স্বচ্ছ ও অনচ্ছ বস্তুর মাঝামাঝি আর এক ধরনের বস্তু আছে যাদের মধ্যে দিয়ে আলো আংশিক ভাবে যেতে পারে। এদের বলে **ঈষদচ্ছ** বস্তু। ঘষা কাচ তোমরা নিশ্চয়ই দেখেছ। তেলে ভেজা কাগজও এই জাতীয় উদাহরণ। পরিষ্কার

জলের পাতলা স্তর স্বচ্ছ, কিন্তু জলের স্তর পুরু হলে ঈষদচ্ছ হয়। অনেকগুলি স্বচ্ছ কাচ উপরে রাখলে ঈষদচ্ছ দেখায়।

আলো-রশ্মি

উৎসকে কেন্দ্র করে আলো চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। আলোর যে কোন একটি পথকে আলো-রশ্মি বলে। সেই আলো-রশ্মির গুচ্ছকে আলো-রশ্মিগুচ্ছ বলে। আলো-রশ্মিগুচ্ছ থেকে একটি আলো-রশ্মি আলাদা করা সম্ভব নয়। আলো-

চিত্র 7.1

রশ্মি বা রশ্মিগুচ্ছের পথ তীর চিহ্নিত সরলরেখা দিয়ে প্রকাশ করা হয়। তীরের মুখটি আলোর গতিপথ নির্দেশ করে।

রশ্মিগুচ্ছ তিন রকমের : (ক) **সমান্তরাল,** (খ) **অপসারী** ও (গ) **অভিসারী**। সমান্তরাল রশ্মিগুচ্ছে রশ্মিগুলো একে অন্যের সমান্তরাল (চিত্র 7.1a)। বহু দূর থেকে আসা আলোর রশ্মিগুচ্ছকে সমান্তরাল বলা যেতে পারে। অপসারী রশ্মিগুলি একটি বিন্দু থেকে বার হয়ে বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়েছে মনে হয় (চিত্র 7.1b)। কোন মাধ্যমে রশ্মিগুচ্ছের রশ্মিগুলি যদি একটি বিন্দুতে এসে মিলিত হয় তবে তাদের অভিসারী আলো-রশ্মিগুচ্ছ বলে (চিত্র 7.1c)।

আলোর প্রতিফলন

ঘরের বাইরে সূর্যের আলো ঝলমল করছে, অথচ ঘরে ঢোকে না। একটা আয়নার উপর সেই আলো ফেলে আয়নাটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সহজেই ঘরের মধ্যে আলো ঢোকানো যায়। তোমরা অনেকেই নিশ্চয় এ রকম করে দেখেছ। আয়না থেকে ঘরে যে আলো এল তা প্রতিফলনের সাহায্যে। একটি টেনিস

বল দেওয়ালে ছুঁড়ে দিলে যেমন ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসে, আলোর প্রতিফলন অনেকটা সেই ধরনের। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে যখন নিজেকে দেখতে পাও তখন তোমার দেহের বিভিন্ন অংশ থেকে আলো-রশ্মি আয়নায় প্রতিফলিত হয়ে তোমার চোখে এসে পড়ে। আলো-রশ্মির কোন একটি তলে প্রতিহত হয়ে দিক পরিবর্তন করে ফিরে আসাকে **আলোর প্রতিফলন** বলে। যে বস্তু থেকে আলো প্রতিফলিত হয় তাকে বলে **প্রতিফলক**।

যে কোন তল থেকেই আলো-রশ্মি প্রতিফলিত হতে পারে। কিন্তু একটি নির্দিষ্ট দিকে প্রতিফলনের জন্য প্রতিফলকের তল মসৃণ হওয়া দরকার। লক্ষ্য করলে দেখবে আয়নার উপরতল খুবই মসৃণ। ধাতুর ফলকের উপরতল মসৃণ হলে তাতেও আয়নার মত মুখ দেখা যায়। অমসৃণ তল থেকে প্রতিফলিত আলো কোন একটি নির্দিষ্ট দিকে যায় না।

সুতরাং একটি নির্দিষ্ট দিক থেকে আসা সমান্তরাল রশ্মিগুচ্ছ যখন কোন আয়নায় বা প্রতিফলকে প্রতিফলিত হয়ে নির্দিষ্ট দিকে সমান্তরাল ভাবে যায় তখন তাকে **নিয়মিত প্রতিফলন** বলে। প্রতিফলনের পর সমান্তরাল রশ্মিগুচ্ছ
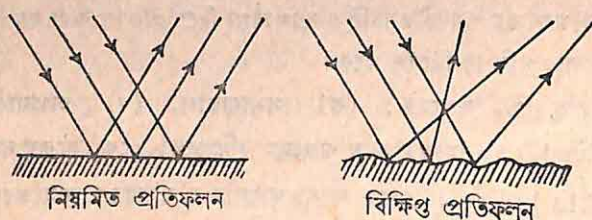
চিত্র 7.2

যদি নির্দিষ্ট দিকে সমান্তরালভাবে না গিয়ে কোন রশ্মি এদিকে কোন রশ্মি ওদিকে যায় তাহলে তাকে **অনিয়মিত বা বিক্ষিপ্ত প্রতিফলন** বলে। যে কোন অমসৃণ তলে বিক্ষিপ্ত প্রতিফলন হয় (চিত্র 7.2)।

XY একটি দর্পণ এবং AO রেখা বরাবর আলোর রশ্মি দর্পণের O বিন্দুতে আপতিত হয়েছে (চিত্র 7.3)। AO রেখা O বিন্দুতে OB পথে প্রতিফলিত হয়েছে। পাতলা কাচের প্লেট বা চাদরের উপর নিচ দুই তলই মসৃণ তবে কাচ স্বচ্ছ হওয়ায় তাতে যথেষ্ট পরিমাণে আলো প্রতিফলিত হয় না। কাচের নিচের তলে পারদ মিশ্রিত ধাতুর প্রলেপ দিলে প্রতিফলন অনেক গুণ বৃদ্ধি পায়। এই ভাবেই আয়না বা দর্পণ তৈরি করা হয়। সমতল কাচের তৈরি

দর্পণকে **সমতল দর্পণ** বলে। ছবিটি দেখ। XY রেখাটি দর্পণের একটি ছেদ। রেখাটির তলায় ড্যাশ রেখা দিয়ে দর্পণ বোঝান যায়। AO রেখা বরাবর আলো-রশ্মি দর্পণের O বিন্দুতে পড়েছে এবং OB রেখাপথে প্রতিফলিত হচ্ছে। O বিন্দুতে XY রেখার উপর OC লম্ব টান।
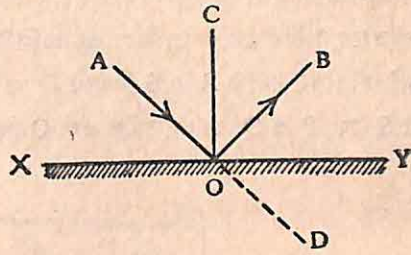
চিত্র 7.3

AO কে **আপতিত রশ্মি**, OB কে **প্রতিফলিত রশ্মি** এবং OC কে **অভিলম্ব** বলে। O বিন্দুকে **আপতন বিন্দু** বলা হয়।

অভিলম্ব ও আপতিত রশ্মির মধ্যের কোণকে **আপতন কোণ** এবং অভিলম্ব ও প্রতিফলিত রশ্মির মধ্যের কোণকে **প্রতিফলন কোণ** বলা হয়। আপতন কোণ i অক্ষর দিয়ে ও প্রতিফলন কোণ r অক্ষর দিয়ে প্রকাশ করা হয়। উপরের ছবিতে AOC আপতন কোণ এবং BOC প্রতিফলন কোণ।

দর্পণ না থাকলে AO রশ্মি OD পথে যেত কিন্তু দর্পণের জন্য AOD রশ্মি AOB পথে যাচ্ছে। উপরের ছবি দেখে নিশ্চয় বুঝতে পারছ। দর্পণের জন্য আলোর রশ্মির স্বাভাবিক পথ থেকে বিচ্যুতি হল BOD কোণ।

প্রতিফলন সূত্র

আলোর প্রতিফলন দুটি সূত্র মেনে চলে : (ক) আপতিত রশ্মি, প্রতিফলিত রশ্মি ও প্রতিফলকের উপর আপতন বিন্দুতে অঙ্কিত অভিলম্ব একই সমতলে অবস্থিত। (খ) আপতন কোণ এবং প্রতিফলন কোণ পরস্পর সমান।

প্রতিফলন সূত্রের প্রমাণ

পিন পদ্ধতি : একটি সমতল বোর্ডের উপর একটা সাদা কাগজ পাত এবং চারটি বোর্ডপিন দিয়ে কাগজের চারকোণ বোর্ডে লাগাও যাতে কাগজ না সরে যায়। কাগজের মাঝখানে একটি সরলরেখা XY টান (চিত্র 7.4) এবং সেই রেখা বরাবর খাড়াভাবে একটি সমতল দর্পণ বসাও। দুটি আলপিন নাও

এবং দর্পণের সামনে ডানদিকে সেই দুটিকে P এবং Q বিন্দুতে কাগজে বসাও। PQ রেখা যে বিন্দুতে দর্পণের XY রেখায় মিশবে তাকে O চিহ্নিত কর। বাঁদিক থেকে দর্পণের দিকে দেখলে P এবং Q এর প্রতিবিম্ব দেখতে পাবে। এইভাবে বাঁদিক থেকে তাকিয়ে এই প্রতিবিম্ব এক সরলরেখায় রেখে আরও দুটি আলপিন বসাও R ও S বিন্দুতে। ভালো করে দেখ, যে চারটি পিন R,S এবং P ও Q এর প্রতিবিম্ব এবং O বিন্দু এক সরলরেখায় আছে। এবার
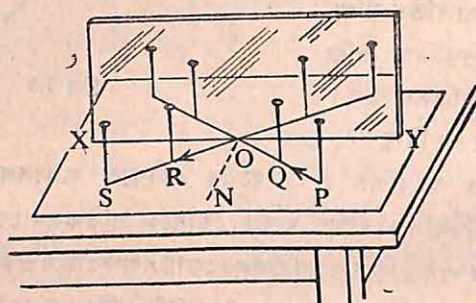
চিত্র 7.4

পিন ও দর্পণ সরিয়ে দিয়ে PQO এবং SRO রেখা টান এবং O বিন্দুতে XY রেখার উপর ON লম্ব টান। এখানে PQ আপতিত রশ্মি, RS প্রতিফলিত রশ্মি, ON লম্ব। PON আপতন কোণ, SON প্রতিফলন কোণ। চাঁদার সাহায্যে মেপে দেখ কোণ দুটি সমান কিনা। PQ, RS এবং ON তিনটিই কাগজের সমতলে অবস্থিত, সুতরাং ওরা এক সমতলেই আছে। সাধারণত এই ধরনের পরীক্ষায় কোণ মাপতে আধ ডিগ্রির মত পার্থক্য হতে পারে। দুটির জায়গায় তিনটি পিন দিয়ে পরীক্ষাটি করলে এবং বড় আকারের চাঁদা ব্যবহার করলে মাপের ভুল কম হবে।

প্রতিবিম্ব

যখন কোন বস্তুকে সরাসরি দেখ তখন বস্তু থেকে আলো সোজা তোমার চোখে এসে পড়ে। কিন্তু দর্পণ বা আয়নায় যখন কোন বস্তু দেখ তখন বস্তু থেকে আলো দর্পণে প্রতিফলিত হয়ে তোমার চোখে এসে পড়ে। তখন মনে হয়

যেন বস্তুটি অন্য কোন স্থানে আছে এবং সেখান থেকে আলো তোমার চোখে এসে পড়ছে। বস্তুর এই আপাত অবস্থানকে বস্তুর বিম্ব বা প্রতিবিম্ব বলে।

প্রতিবিম্বের সংজ্ঞা : কোন বিন্দু-প্রভব থেকে অপসৃত আলোর রশ্মি প্রতিফলিত হয়ে যদি অন্য কোন বিন্দুতে মিলিত হয় বা অন্য কোন বিন্দু থেকে অপসৃত হচ্ছে মনে হয় তখন দ্বিতীয় বিন্দুটিকে প্রথম বিন্দুর **প্রতিবিম্ব** বলা হয়। প্রতিবিম্ব দুই ধরনের—**সদবিম্ব** এবং **অসদবিম্ব**। যখন কোন প্রভব থেকে অপসৃত আলোর রশ্মি দ্বিতীয় কোন বিন্দুতে মিলিত হয় তখন তাকে সদবিম্ব বলে। একটা থালায় কিছু জল ভর্তি করে যদি ঠিকমত ঘরের বাইরে
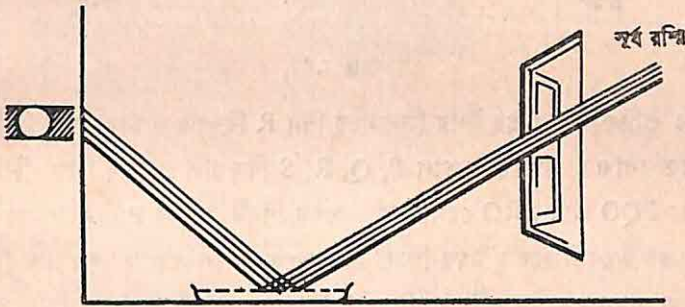
চিত্র 7.5

রাখ তবে সূর্যের প্রতিবিম্ব দেখতে পাবে (চিত্র 7.5)। অবশ্য থালার জল স্থির হতে হবে। এটি সদবিম্বের উদাহরণ। মনে রেখ, এই ভাবে নিরাপদে ও খুব ভালভাবে সূর্যগ্রহণ দেখা যায়। সদবিম্বেরই আরও উদাহরণ সিনেমার পর্দায় ছবি বা ক্যামেরায় তোলা ছবি। যখন কোন আলোর উৎস থেকে অপসৃত আলোর রশ্মি প্রতিফলনের পর অন্য কোন বিন্দু থেকে আসছে বলে মনে হয় তখন সেই প্রতিবিম্বকে অসদবিম্ব বলে। আয়নায় বা পুকুরের জলে যে বিম্ব দেখা যায় সেগুলি অসদবিম্ব। সদবিম্ব চোখে দেখা যায় ও পর্দায় ধরা যায়। অসদবিম্ব চোখে দেখা যায় কিন্তু পর্দায় ধরা যায় না।

সমতল দর্পণে প্রতিবিম্ব

সমতল দর্পণে প্রতিবিম্ব কিভাবে হয় এবং প্রতিবিম্বটির অবস্থান কোথায় পরীক্ষা করে দেখ। একটি বোর্ডের উপর একটা সাদা কাগজ পিন দিয়ে আটকাও। কাগজের মাঝখানে একটি সরল রেখা টান এবং সরল রেখা বরাবর একটি দর্পণ

রাখ (চিত্র 7.6)। দর্পণের সামনে দুটো পিন বসাও। এক নম্বর পিন P বিন্দুতে এবং দু নম্বর পিন Q বিন্দুতে। আরও দুটো পিন নাও এবং P Q আপতিত

চিত্র 7.6

রশ্মির প্রতিফলিত রশ্মির উপর তিন নম্বর পিন R বিন্দুতে ও চার নম্বর পিন S বিন্দুতে বসাও। পিনগুলি তুলে P, Q, R, S বিন্দুগুলি পেন্সিল দিয়ে চিহ্নিত কর। PQO এবং SRO রেখা টান। প্রথম পিনটি আবার P বিন্দুতে বসাও। আর একটি রেখা ধরে দু নম্বর পিনটি A বিন্দুতে বসাও এবং আগের মত তিন নম্বর ও চার নম্বর পিন দুটির সাহায্যে PA আপতিত রশ্মির প্রতিফলিত রশ্মি নির্ণয় কর, তিন নম্বর পিন B বিন্দুতে ও চার নম্বর পিন C বিন্দুতে বসিয়ে। এবার পিনগুলি তুলে A, B, C বিন্দুগুলি চিহ্নিত কর। PAD এবং CBD রেখা টান। এখন CBD ও SRO রেখা দুটো বাড়াও। এরা P′ বিন্দুতে ছেদ করবে। P′ বিন্দুটি P বিন্দুর প্রতিবিম্ব।

P, P′ বিন্দু দুটো যোগ কর। PP′ রেখা দর্পণটিকে E বিন্দুতে ছেদ করবে। PE ও P′E স্কেল দিয়ে মাপ। দেখবে PE=P′E। PE যে PE′ এর সমান তা তোমরা জ্যামিতির সাহায্যে প্রমাণ করতে পারবে। একটা চাঁদা নিয়ে PED ও P′ED কোণ দুটো মাপ। দেখবে দুটিই সমকোণ।

এই পরীক্ষা থেকে তোমরা তিনটি সিদ্ধান্তে আসতে পার : (ক) দর্পণ থেকে বস্তুর দূরত্ব এবং প্রতিবিম্বের দূরত্ব পরস্পর সমান। (খ) বস্তু ও প্রতিবিম্বের দূরত্ব রেখা দর্পণকে লম্বভাবে ছেদ করে। (গ) প্রতিবিম্বটি অসৎ।

পার্শ্বীয় বিপর্যয়

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের দিকে চাইলে ডান হাতকে বাঁ হাত ও বাঁ হাতকে ডান হাত মনে হয়। তোমার বাঁ গালে যদি কোন তিল থাকে দেখবে
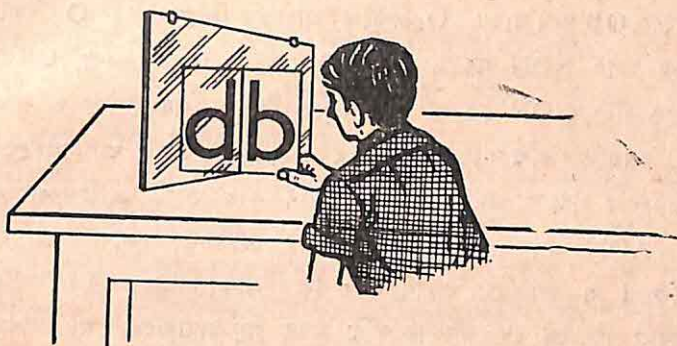
চিত্র 7.7

প্রতিবিম্বে ডান গালে আছে মনে হবে। মনে কর একটা কাগজে b অক্ষর লিখে সরল দর্পণের কাছে ধরেছ। প্রতিবিম্বে অক্ষরটা d মনে হবে। 7.7 চিত্র দেখ। একে পার্শ্বীয় বিপর্যয় বলে। প্রতিসম বস্তুগুলোর বেলায় পার্শ্বীয় বিপর্যয় কেমন হবে? **AIXOUMY** অক্ষরগুলোর বিপর্যয় কেমন হবে ছবি এঁকে দেখ।

প্রতিসরণ

আলো বাতাসের ভিতর দিয়ে চলে, জলের মধ্যে দিয়ে এবং কাচের মধ্যেও যায়। তাই বাতাস, জল বা কাচ, এরা আলোর মাধ্যম। স্বচ্ছ ও সমসত্ত্ব বস্তু যার ভিতর দিয়ে আলো যেতে পারে সেই বস্তুকেই আলোর মাধ্যম বলে। আলো যখন এক মাধ্যম থেকে অন্য মাধ্যমে যায় তখন দুই মাধ্যমের বিভেদতলে আলোর রশ্মি দিক পরিবর্তন করে। দুই মাধ্যমের বিভেদতলে আলো-রশ্মির দিক পরিবর্তনকে **প্রতিসরণ** বলে।

একটা গেলাস বা বীকারে জল নাও। একটি পেন্সিল ডুবিয়ে উপর থেকে দেখ। মনে হবে জলের উপর তল থেকে পেন্সিলটা হঠাৎ বেঁকে গেছে। এর কারণ কি? জলের মধ্যে পেন্সিলের যে অংশ আছে সেখান থেকে আলো-রশ্মি জলে যে রেখা বরাবর যাচ্ছিল বাতাসে এসে তার দিক পরিবর্তন হয়েছে।

প্রতিসরণের সংজ্ঞা

মনে কর PQ দুটি মাধ্যমের বিভেদতল এবং AO আপতিত রশ্মি O বিন্দুতে PQ তলের উপর এসে পড়েছে (চিত্র 7.8 a)। দ্বিতীয় মাধ্যমে আলোর রশ্মি বেঁকে OB পথে যায়। O বিন্দুকে **আপতন বিন্দু** বলে। O বিন্দুতে PQ এর উপর NON′ লম্ব টান। AO কে **আপতিত রশ্মি**, OB-কে **প্রতিসৃত রশ্মি**, NON′ কে আপতন বিন্দুতে বিভেদতলের উপরে **অভিলম্ব** বলে। আপতিত রশ্মি অভিলম্বের সঙ্গে যে কোণ করে তাকে **আপতন কোণ** এবং প্রতিসৃত রশ্মি অভিলম্বের সঙ্গে যে কোণ করে তাকে **প্রতিসরণ কোণ** বলে। AON আপতন কোণ এবং BON′ প্রতিসরণ কোণ। আপতন কোণকে i ও প্রতিসরণ কোণকে r দিয়ে প্রকাশ করা হয়। পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে যে আলোর রশ্মি যখন লঘু মাধ্যম থেকে ঘন মাধ্যমে
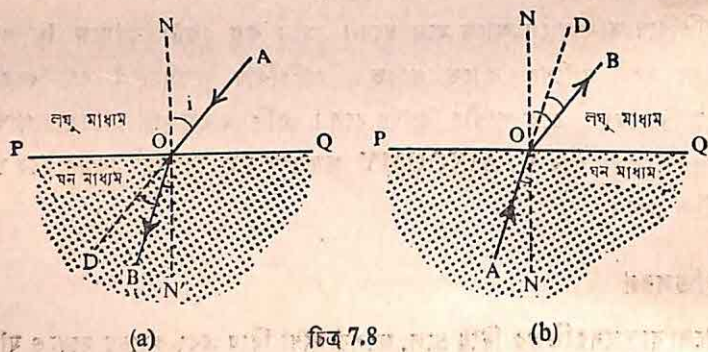
(a) চিত্র 7.8 (b)

আসে তখন প্রতিসৃত রেখা অভিলম্বের দিকে বেঁকে যায়। ছবিতে AOB রশ্মি লঘু মাধ্যম থেকে ঘন মাধ্যমে এসে পড়েছে। এক্ষেত্রে আপতন কোণের চেয়ে প্রতিসরণ কোণ ছোট। আলোর রশ্মি যখন ঘন মাধ্যম থেকে লঘু মাধ্যমে যায় তখন প্রতিসৃত রেখা অভিলম্ব থেকে দূরে সরে যায় (চিত্র 7.8 b)। এক্ষেত্রে আপতন কোণের চেয়ে প্রতিসরণ কোণ বড়।

প্রতিসরণে আলোর রশ্মির চ্যুতি

উপরের ছবি দুটিতে দেখ AO আলোক রেখা লঘু মাধ্যম থেকে ঘন মাধ্যমে অথবা ঘন মাধ্যম থেকে লঘু মাধ্যমে এসে OB পথে গিয়েছে। মাধ্যমের

পরিবর্তন না হলে AO রশ্মি OD পথে যেত। সুতরাং আলো-রশ্মির চ্যুতি হচ্ছে BOD কোণ।

প্রতিসরণের সূত্র

এক মাধ্যম থেকে অন্য মাধ্যমে যাবার সময় আলো-রশ্মির প্রতিসরণ দুটো নিয়ম মেনে চলে: (ক) আপতিত রশ্মি, প্রতিসৃত রশ্মি এবং আপতন বিন্দুতে বিভেদতলের উপর অভিলম্ব একই তলে থাকে। (খ) দুটো নির্দিষ্ট মাধ্যমের ভিতর দিয়ে একটা নির্দিষ্ট রঙের আলো-রশ্মির প্রতিসরণ হলে আপতন কোণের সাইন ও প্রতিসরণ কোণের সাইনের অনুপাত ধ্রুবক হয়। কোন কোণের sine কাকে বলে তোমরা অঙ্কের ক্লাসে পড়েছ। যদি আপতন কোনকে i ও প্রতিসরণ কোণকে r বলা হয় তবে $\sin i/\sin r$ ধ্রুবক। এই ধ্রুবককে মাধ্যম দুটির **প্রতিসরাঙ্ক** বলা হয় ও n অক্ষর দিয়ে প্রকাশ করা হয়।

দুটি নির্দিষ্ট মাধ্যম ও নির্দিষ্ট বর্ণের আলো-রশ্মির জন্য প্রতিসরাঙ্কের মান সর্বদা সমান থাকে। মনে রেখ মাধ্যমের ক্ষেত্রে তাপমাত্রা সমান থাকা দরকার। দ্বিতীয় সূত্রটি বিজ্ঞানী স্নেল আবিষ্কার করেন, সেজন্য এই সূত্রকে অনেক সময় স্নেলের সূত্র বলা হয়।

প্রতিসরণের প্রমাণ

একটা বোর্ডের উপর চারটে পিন দিয়ে একটা কাগজ আটকাও। একটা কাচের আয়তাকার ফলক কাগজের উপর রেখে বাইরের সীমারেখা ABCD টেনে নাও (চিত্র 7.9a)। ফলকটির AB পাশে দুটো পিন P ও Q খাড়া ভাবে বসাও। ফলকের CD পাশে আরও দুটো পিন R এবং S এমন ভাবে বসাও যেন P এবং Q পিন, R ও S এর প্রতিবিম্বের সঙ্গে একই রেখায় থাকে। P, Q ও R, S পিনগুলোর অবস্থান চিহ্নিত কর এবং ফলকটি সরাও। P, Q এবং R, S যোগ কর ও বাড়াও যাতে PQ এবং RS রশ্মি দুটো AB, CD রেখা দুটোকে O এবং O′ বিন্দুতে ছেদ করে।

O এবং O′ বিন্দুতে AB ও CD এর উপর লম্ব টান। NON′তে O বিন্দু রেখা ABর উপর লম্ব। PON আপতন কোন এবং O′ON′ প্রতিসরণ কোণ।

PON ও O′ON′ কোণ দুইটি sin এর মান ত্রিকোণমিতির তালিকা থেকে বার করো। দেখবে sin PON এবং sin O′ON′ দুটির অনুপাত একটি ধ্রুবক।
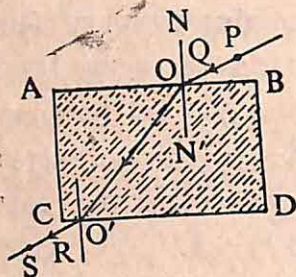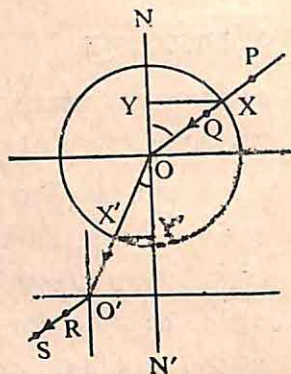
(a) চিত্র 7.9 (b)

ধ্রুবকটি *n* অক্ষর দিয়ে প্রকাশ করা হয়। PON কোণ এবং OON′ কোণের মান বিভিন্ন নিয়ে দেখ *n* এর মান প্রতিবারেই এক হবে। অন্যভাবেও প্রতিসরাঙ্কের মান বার করতে পার। O বিন্দুকে কেন্দ্র করে যে কোন ব্যাসার্ধের একটা বৃত্ত আঁক (চিত্র নং 7.9b)। এই বৃত্ত PQ ও OO′ রেখা দুটোকে যথাক্রমে X ও X′ বিন্দুতে ছেদ করল। X ও X′ থেকে NON′ এর উপর XY ও X′Y′ লম্ব টান।

অতএব $\sin \text{PON} = \frac{\text{XY}}{\text{OX}}$ এবং $\sin \text{O'ON'} = \frac{\text{X'Y'}}{\text{OX'}}$, কিন্তু OX = OX′

কারণ একই বৃত্তের ব্যাসার্ধ। অতএব $\frac{\sin \text{PON}}{\sin \text{O'ON}} = \frac{\text{XY}}{\text{X'Y'}}$। XY ও X′Y′ এর অনুপাত বার করলেই কোণ দুটির সাইনের অনুপাত পাবে। যদি আপতন কোণ ও প্রতিসরণ কোণের মান পরিবর্তন করে অনুপাত একই পাও তবে প্রতিসরণের দ্বিতীয় সূত্র প্রমাণিত হল। প্রতিসৃত রেখা, আপতিত রেখা এবং আপতন বিন্দুতে বিভেদতলের উপর অভিলম্ব একই তলে আছে। এক্ষেত্রে কাগজের তলে আছে। এটিই প্রতিসরণের প্রথম সূত্র।

প্রতিসরণের কয়েকটি দৃষ্টান্ত

(ক) জলে ডোবানো জিনিস জলের বাইরে থেকে দেখলে কেমন দেখাবে?

জলভর্তি একটা পাত্র নাও। পাত্রের ঠিক নিচে একটা দশ পয়সা রাখ। পয়সার ঠিক উপরে খাড়াখাড়ি ভাবে যদি দেখ মনে হবে পয়সাটা উপর দিকে উঠে এসেছে। জলের চৌবাচ্চা বা জলভর্তি বালতির নিচের দিকে চাইলে জলের গভীরতা কমে গিয়েছে মনে হয়।

(খ) জলের ভিতর চোখ রেখে উপরে বাতাসে রাখা জিনিস কেমন দেখাবে? মনে কর বাতাসে A বিন্দুতে একটা বস্তু রেখেছ এবং জলে চোখ রেখে বস্তুটা দেখছ (চিত্র 7.10)। AO রশ্মি জলের তলে পড়ার পর OB পথে জলের ভিতর দিয়ে যাবে অভিলম্বের দিকে সরে গিয়ে। সেই রকম আর একটি রশ্মি AO′ পথে লম্বভাবে পড়ে সোজা AO′N পথে যাবে। BO এবং NO′ বাড়ালে A′ বিন্দুতে ছেদ করবে। A′ হচ্ছে A বিন্দুর প্রতিবিম্ব। প্রতিবিম্ব জলের তল থেকে দূরে সরে গিয়েছে।
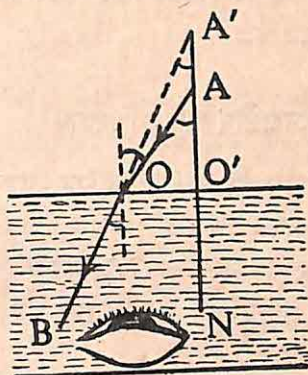
চিত্র 7.10

প্রতিসরণের প্রাকৃতিক দৃষ্টান্ত

বায়ুমণ্ডলে প্রতিসরণ : ভূপৃষ্ঠে বাতাসের চাপ বেশি এবং উপর দিকে যতই ওঠা যাবে বাতাসের চাপ ততই কমবে। চাঁদ, সূর্য বা কোন নক্ষত্র থেকে
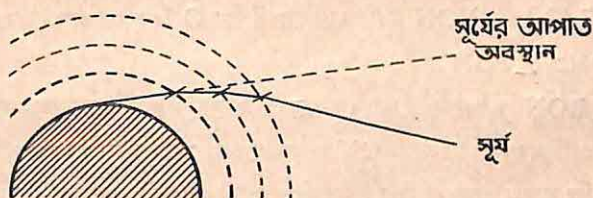
চিত্র 7.11

যখন আলো আসে তখন লঘু মাধ্যম থেকে ঘন মাধ্যমে আসার জন্য প্রতিসৃত রশ্মি বিভিন্ন স্তরে প্রতিসরণের পর অভিলম্বের দিকে সরে আসে। প্রতিসৃত

রশ্মি যখন দর্শকের চোখে এসে পড়ে তখন সেই রশ্মিকে সরলরেখায় টানলে মূল উৎসটি সেখানে আছে মনে হয়। এই আপাত অবস্থান প্রকৃত অবস্থান থেকে কিছুটা উপরে (চিত্র 7.11)। ছবিতে ভাঙা সরল রেখার সাহায্যে সূর্যের আপাত অবস্থান ও গোটা রেখার সাহায্যে প্রকৃত অবস্থান দেখান হয়েছে। এই জন্য সূর্য ওঠার কিছু আগে এবং অস্ত যাওয়ার কিছু পরেও আমরা সূর্যকে দেখতে পাই।

আভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলন

আলোকরশ্মি যখন ঘন মাধ্যম থেকে লঘু মাধ্যমে আসে তখন প্রতিসৃত রেখা অভিলম্ব থেকে দূরে সরে যায়। তখন প্রতিসরণ কোণ আপতন কোণ অপেক্ষা বড় হয়। মনে কর XY একটি লঘু ও ঘন মাধ্যমের বিভেদতল। PO রশ্মি বিভেদতল O বিন্দুতে আপতিত হয়ে OQ দিকে প্রতিসৃত হল
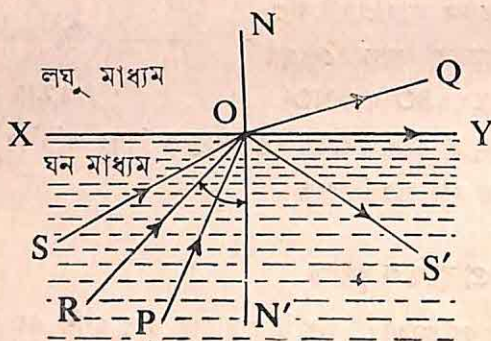
চিত্র 7.12

(চিত্র 7.12)। NON′ বিভেদতলের উপরে O বিন্দুতে লম্ব। ছবিতে দেখ $\angle QON > \angle PON'$।

$\angle RON'$ আপতন কোণের জন্য প্রতিসৃত রশ্মি বিভেদতল বরাবর যায়, অর্থাৎ প্রতিসরণ কোণ তখন 90°। আপতন কোণ যদি আরও বাড়ানো যায় তবে রশ্মি লঘু মাধ্যমে প্রতিসৃত না হয়ে সাধারণ প্রতিফলনের নিয়ম অনুযায়ী ঘন মাধ্যমে প্রতিফলিত হবে। ছবিতে $\angle SON'$ কোণ $\angle RON'$ কোণের চেয়ে বড় হওয়ায় SO রশ্মি OS′ পথে ঘন মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়েছে। এই প্রতিফলনকে **আভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলন** বলে।

যে আপতন কোণের জন্য প্রতিসরণ কোণ 90° হয় তাকে মাধ্যম দুটির সংকট কোণ বলে। এখানে ∠RON′ সংকট কোণ। সুতরাং আভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলনের জন্য (ক) আলোর রশ্মিকে ঘন মাধ্যম থেকে লঘু মাধ্যমে যেতে হবে এবং (খ) আপতন কোণ সংকট কোণের চেয়ে বড় হওয়া দরকার। আভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলন প্রতিসরণের একটি বিশেষ অবস্থা মাত্র।

পূর্ণ প্রতিফলনের দৃষ্টান্ত

(ক) একটা জলভর্তি কাচের গেলাসকে ধীরে ধীরে চোখের উপর তুললে দেখতে পাবে একটা বিশেষ উচ্চতায় জলের উপরতল চকচকে দেখাচ্ছে। গেলাসটাকে উপর দিকে তোলার সময় একটা বিশেষ উচ্চতায় আলোকরশ্মির আপতন কোণ সংকট কোণের চেয়ে বেশি হয় (চিত্র 7.13)। সেই সময় পূর্ণ প্রতিফলনের জন্য জলের উপরতল চকচকে দেখায়।
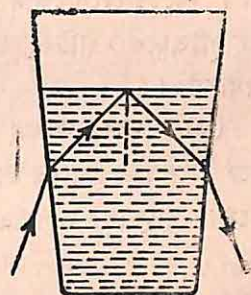
চিত্র 7.13

(খ) একটা বীকারে জল নাও। একটা টেস্ট টিউবকে আংশিক জলভর্তি করে বীকারের জলে তেরচা ভাবে রেখে জলের ভেতর দিয়ে দেখলে দেখবে টিউবের যে অংশে জল নেই সেই অংশ চকচক করছে (চিত্র 7.14)। বাইরে থেকে আলো এসে টিউবের গায়ে পড়ে যখন আপতন কোণ সংকট কোণের চেয়ে বড় হয় তখন পূর্ণ প্রতিফলন হয়। পূর্ণ প্রতিফলন রশ্মি চোখে পড়ায় টিউবের শরীর চকচকে দেখায়।
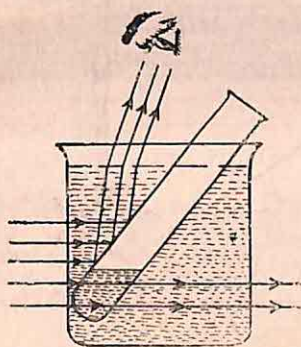
চিত্র 7.14

এছাড়া পেপারওয়েটের ভিতরের বুদবুদকে চোখের বিশেষ অবস্থায় চকচকে দেখায়। একটা কালো ভুসো মাখা বলকে জলে ডোবালে দেখবে বলের শরীর চকচক করছে। ভুসোর

মাঝে মাঝে যে বাতাসের কণা আছে জল থেকে আলোর রশ্মি কণাগুলিতে এসে পড়লে পূর্ণ প্রতিফলন হয়। পূর্ণ প্রতিফলিত রশ্মি চোখে এসে পড়লে বল চকচক করে। হীরা চকচক করার কারণ পূর্ণ প্রতিফলন। বাতাসের সাপেক্ষে হীরার সংকট কোণ 24·5°। যদি আলো-রশ্মি বাতাস থেকে হীরায় প্রবেশ করে তবে আপতন কোণ সংকট কোণের চেয়ে বড় হলে পূর্ণ প্রতিফলিত হয়ে বার হয়ে আসে।

পূর্ণ প্রতিফলনের প্রাকৃতিক দৃষ্টান্ত

মরু অঞ্চলে অনেক দূরের গাছপালা অনেক সময় জলাশয়ে প্রতিফলিত হচ্ছে মনে হয়। শীতের দেশে কোন বস্তুর প্রতিবিম্বকে উলটো হয়ে ঝুলতে দেখা যায়। এই দৃষ্টিভ্রমকে মরীচিকা বলে। আলোর পূর্ণ প্রতিফলনের জন্য মরীচিকা দেখা যায়।

(ক) **মরু অঞ্চলের মরীচিকা :** সূর্যের তাপে মরুভূমির বালি গরম হয়ে উঠলে ঠিক উপরের স্তরের বাতাস গরম হয়ে আয়তনে বাড়ে এবং ঘনত্ব কমে। বায়ুস্তরের তাপমাত্রা উপরের দিকে ক্রমশ কমতে থাকে। মনে কর
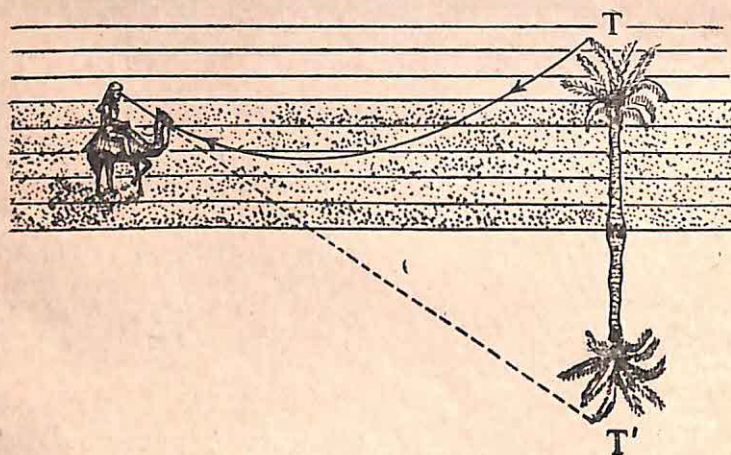
চিত্র 7·15

T একটি গাছ। বালির উপরের বাতাসকে যদি ঘনত্ব অনুযায়ী কয়েকটি স্তরে ভাগ করা যায় তবে গাছের মাথা থেকে কোন আলোকরশ্মি যখন নিচের দিকে

নামবে তখন ঘন মাধ্যম থেকে লঘু মাধ্যমে প্রবেশ করবে (চিত্র 7.15)। ঘন থেকে লঘু মাধ্যমে প্রবেশ করার জন্য প্রতিসরণ কোণ আপতন কোণের চেয়ে বড় হবে। আলো-রশ্মি যতই নিচের দিকে নামবে, প্রতিসরণ কোণ ততই বাড়তে থাকবে। আলো-রশ্মি যখন এমন কোনও স্তরে এসে পৌঁছবে যেখানে আপতন কোণ সংকট কোণের চেয়ে বড় সেখানে রশ্মিটি প্রতিসৃত না হয়ে সেই স্তরেই পূর্ণ প্রতিফলিত হবে। এইবার আলো-রশ্মি ক্রমশ উপর দিকে উঠতে থাকবে অর্থাৎ লঘু থেকে ঘন মাধ্যমে যাবে ও প্রতিসৃত রশ্মি অভিলম্বের দিকে সরে যাবে। এই ভাবে উপর দিকে উঠতে উঠতে শেষে মানুষের চোখে এসে পড়বে। মনে হবে যেন রশ্মিটি T´ বিন্দু থেকে আসছে। T´ বিন্দুটি T বিন্দুর প্রতিবিম্ব।

তাপমাত্রার দ্রুত পরিবর্তনের জন্য বিভিন্ন স্তরের ঘনত্ব ও প্রতিসরাঙ্ক দ্রুত পরিবর্তিত হয়। এই পরিবর্তনের জন্য জলে বিম্ব যেমন কাঁপে সেইভাবে প্রতিবিম্বটি কাঁপছে মনে হয়। ফলে গাছের পাশে জল আছে ভ্রম হয়।

(খ) **শীতের দেশের মরীচিকা:** শীতের দেশে বাতাসের ঘনত্ব উপর দিকে কম। ফলে দূরের কোন বস্তু থেকে আলোর রশ্মি যখন উপর দিকে যায়
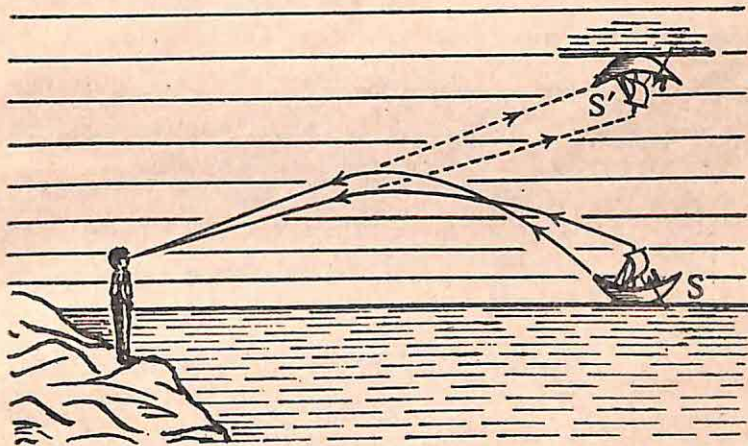
চিত্র 7.16

তখন ঘন মাধ্যম থেকে লঘু মাধ্যমে যাওয়ায় প্রতিসৃত রশ্মি অভিলম্ব থেকে দূরে সরে যায় এবং প্রতিসরণ কোণ আপতন কোণের চেয়ে বড় হয়। এইভাবে

ক্রমশ উপর দিকে ওঠার পর কোন স্তরে আপতন কোণ সংকট কোণের চেয়ে বড় হলে পূর্ণ প্রতিফলন হয়। এই স্তরের পর আলো-রশ্মি নিচের দিকে নামতে থাকে এবং প্রতিসৃত রশ্মি অভিলম্বের দিকে সরতে থাকে। শেষে যখন কোন লোকের চোখে এসে পড়ে তখন মনে হয় রশ্মিটি S′ বিন্দু থেকে আসছে। S′ বিন্দু S বিন্দুর প্রতিবিম্ব (চিত্র 7.16)। বস্তুটি উলটো হয়ে আকাশে ঝুলছে মনে হয়।

লেন্স

লেন্সের ব্যবহার বহু যুগ আগে থেকে প্রচলিত আছে। এক ধরনের লেন্সের প্রচলিত নাম আতশী কাচ। লিউয়েন হোক নামে একজন বৈজ্ঞানিককে লেন্সের ব্যবহার করতে দেখে গ্যালিলিও লেন্সের ব্যবহার শিখে নেন। তিনি 1618 খ্রীস্টাব্দে এই লেন্স দিয়ে দূরবীন তৈরি করেন ও পরে বৃহস্পতির উপগ্রহ, চাঁদের পিঠ, শনির বলয় প্রভৃতি গ্রহ-উপগ্রহগুলি পর্যবেক্ষণ করেন। শোনা যায় আতশী কাচের সাহায্যে কাগজ পুড়িয়ে সময় দেখার ব্যবহারও সেযুগে প্রচলিত ছিল। বর্তমান কালে চশমা, ক্যামেরা, অণুবীক্ষণ, দূরবীক্ষণ প্রভৃতি নানারকম যন্ত্রে লেন্স ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

বিভিন্ন প্রকারের লেন্স

কোন স্বচ্ছ প্রতিসারক মাধ্যমকে যদি দুটো গোলাকার তল অথবা একটা গোলাকার ও অন্য একটা সমতল দিয়ে সীমাবদ্ধ করা যায় তবে সেই মাধ্যমকে লেন্স বলে। লেন্সকে সাধারণত দু শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—(ক) উত্তল বা কনভেক্স লেন্স ও (খ) অবতল বা কনকেভ লেন্স। উত্তল লেন্সের মাঝখান মোটা ও দুই প্রান্ত সরু এবং অবতল লেন্সের মাঝখান সরু ও দুই প্রান্ত মোটা (চিত্র 7.17)। লেন্স কাচ, প্লাস্টিক, কোয়ার্টজ ইত্যাদি দিয়ে তৈরি হতে পারে। কাচের লেন্সই বেশি ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

চিত্র 7.17

সমান্তরাল আলো-রশ্মি উত্তল লেন্সে এসে পড়লে প্রথমে একটি বিন্দুতে এসে কেন্দ্রীভূত হয় ও তারপর অপসারী আলো রশ্মির মত ছড়িয়ে পড়ে। উত্তল

লেন্স সূর্যের আলোয় ধরে কাগজ পোড়াতে তোমরাও দেখে থাকবে। উত্তল লেন্সকে **অভিসারী লেন্সও** বলা হয়। অবতল লেন্সে আলোর সমান্তরাল রশ্মিগুচ্ছ প্রতিসৃত হবার পর মনে হয় একটি বিন্দু থেকে যেন অপসৃত হচ্ছে। এইজন্য অবতল লেন্সকে **অপসারী লেন্স** বলে।

লেন্সের সংজ্ঞা

বক্রতা কেন্দ্র ও বক্রতা ব্যাসার্ধ: লেন্সের দুদিক যদি গোলাকার হয় তবে প্রত্যেক দিকই একটি নির্দিষ্ট গোলকের অঙ্গ (7.18 চিত্র)। গোলক দুটি ফুটকি দিয়ে দেখান হয়েছে। মনে কর MQS গোলকের কেন্দ্র C_1 এবং PRS গোলকের কেন্দ্র C_2। C_1 ও C_2 বিন্দুকে **বক্রতা কেন্দ্র** বলে। যদি কোন তল সমতল হয় তাহলে তার বক্রতা কেন্দ্র দেখা যাবে না। বলা যেতে পারে যে সেই তলের বক্রতা কেন্দ্র অসীমে অবস্থিত।
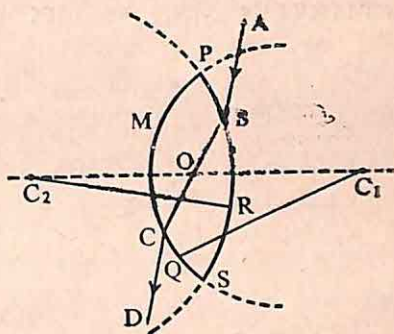
চিত্র 7.18

লেন্সের কোন তল যে গোলকের অংশ সেই গোলকের ব্যাসার্ধকে লেন্সের **বক্রতা ব্যাসার্ধ** বলে। C_1Q ও C_2R রেখা দুটি যথাক্রমে দুই তলের বক্রতা-ব্যাসার্ধ। সমতলের বক্রতা-ব্যাসার্ধ অসীম।

প্রধান অক্ষ: কোন লেন্সের গোলাকার তল দুটোর বক্রতা-কেন্দ্র যোগ করলে যে সরলরেখা পাওয়া যায় তাকে লেন্সটির **প্রধান অক্ষ** বলে। C_1C_2 সরলরেখা প্রধান অক্ষ। লেন্সের একটি তল সমতল হলে বক্রতলের বক্রতা-কেন্দ্র থেকে সমতলের উপর লম্ব টানলে যে রেখা পাওয়া যায় সেটিই এই লেন্সের প্রধান অক্ষ।

আলোক কেন্দ্র: লেন্সে আলোকরশ্মি পড়লে যদি আপতিত রশ্মি ও নির্গত রশ্মি পরস্পরের সমান্তরাল হয় তবে লেন্সের ভিতরের প্রতিসৃত রশ্মি প্রধান অক্ষকে যে বিন্দুতে ছেদ করে তাকে **আলোক কেন্দ্র** বলে। মনে কর AB রশ্মি লেন্সের B বিন্দুতে আপতিত হওয়ার পর BC পথে প্রতিসৃত হয়ে CD পথে

লেন্স থেকে বাইরে এসেছে (চিত্র 7.18)। এক্ষেত্রে আপতিত রশ্মি AB ও নির্গত রশ্মি CD পরস্পর সমান্তরাল। প্রতিসৃত রশ্মি BC প্রধান অক্ষ C_1C_2কে O বিন্দুতে ছেদ করেছে। O হল এই লেন্সের আলোক-কেন্দ্র। যদি লেন্সের উভয় তলের গোলাকৃতি সমান হয় তবে আলোক-কেন্দ্র লেন্সের কেন্দ্রে থাকবে। চিত্রে AB ও CD সমান্তরাল হলেও নির্গত রশ্মি, আপতিত রশ্মি থেকে খানিকটা সরে গিয়েছে। কিন্তু সরু লেন্সের বেলায় এই বিচ্যুতি খুব কম হওয়ায় আপতিত রশ্মি আলোক-কেন্দ্রের ভিতর দিয়ে সোজাসুজি বেরিয়ে যায়।

ফোকাস ও ফোকাস-দূরত্ব : কোন সমান্তরাল রশ্মিগুচ্ছ উত্তল লেন্সে প্রতিসরণের পর লেন্সের অন্য পাশে প্রধান অক্ষের উপর কোন বিন্দুতে
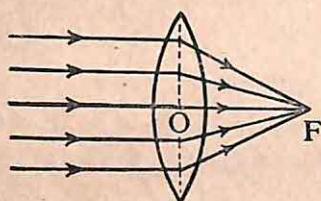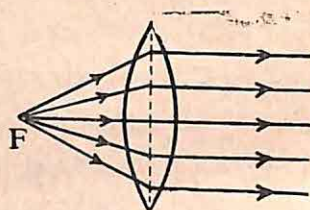
চিত্র 7.19 চিত্র 7.20

কেন্দ্রীভূত হয়। এই বিন্দুটিকে ঐ লেন্সের ফোকাস বলে। উত্তল লেন্সের ফোকাস 7.19 চিত্রে F বিন্দুতে অবস্থিত দেখানো হয়েছে।

উত্তল লেন্সের প্রধান অক্ষের উপর কোন বিন্দু থেকে আলোর রশ্মিগুচ্ছ অপসৃত হয়ে লেন্সে প্রতিসরণের পর যদি প্রধান অক্ষের সমান্তরাল হয়ে অন্য পাশ দিয়ে বেরিয়ে যায় তবে এই বিন্দুটিকেও উত্তল লেন্সের ফোকাস বলে। 7.20 চিত্রে দেখানো F বিন্দু উত্তল লেন্সের ফোকাস।

কোন লেন্সের ফোকাস থেকে আলোকবিন্দুর দূরত্বকে **ফোকাস দূরত্ব** বলে। 7.19 চিত্রে OF দূরত্ব ফোকাস দূরত্ব। কোন লেন্সের ফোকাস দূরত্ব f অক্ষর দিয়ে প্রকাশ করা হয়।

লেন্সের প্রতিবিম্ব

আলোক রশ্মি কোন মাধ্যমে প্রতিসৃত হলে প্রতিবিম্ব সৃষ্টি করে। লেন্স প্রতিসারক বস্তু, সুতরাং লেন্সও প্রতিবিম্ব সৃষ্টি করতে পারে। কোন লেন্সের

ফোকাস-দূরত্ব এবং বস্তুর আকৃতি ও অবস্থান জানা থাকলে কিভাবে প্রতিবিম্বের আকৃতি ও অবস্থান জানা যেতে পারে দেখ।

উত্তল লেন্স: মনে কর PQ বস্তু একটা উভোত্তল লেন্সের সামনে আছে। OF লেন্সের ফোকাস দূরত্ব (চিত্র 7.21)। P বিন্দু থেকে কোন রশ্মি প্রধান অক্ষের সমান্তরাল হয়ে লেন্সে প্রতিসরণের পর অন্য পাশের ফোকাসের মধ্যে দিয়ে গেল। PO রশ্মি আলোক-কেন্দ্রের ভিতর দিয়ে সোজা যায়। এই দুটো রশ্মি p বিন্দুতে ছেদ করে। p বিন্দু P বিন্দুর প্রতিবিম্ব। Q
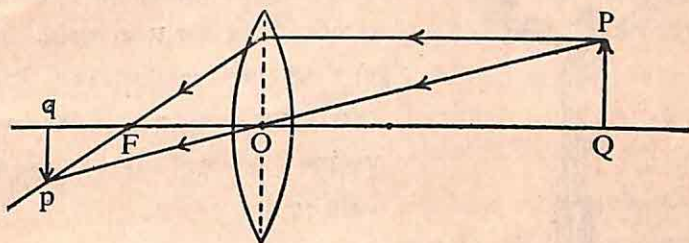
চিত্র 7.21

বিন্দু থেকে কোন রশ্মি লেন্সের মধ্য দিয়ে সোজা অন্য দিক দিয়ে বেরিয়ে যায়। এখন pq, PQ-এর প্রতিবিম্ব। এই প্রতিবিম্বের অবস্থিতি আছে বলে একে পর্দায় ধরা যাবে। এই জাতীয় প্রতিবিম্বটি সৎ, উলটো এবং আকারে ছোট হয়।

লেন্সের জন্য বস্তুর যে প্রতিবিম্ব হয় তার আকৃতি নির্ভর করে বস্তুর অবস্থানের
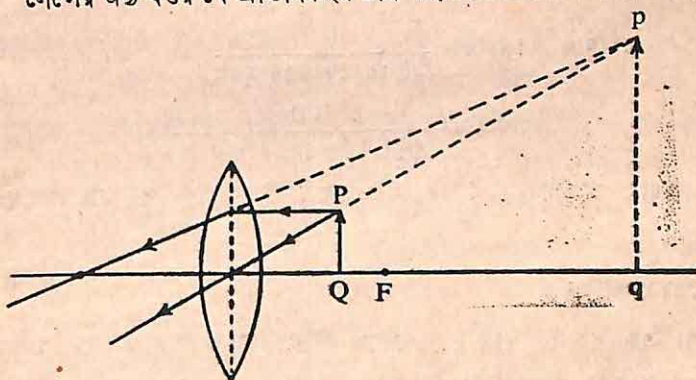
চিত্র 7.22

উপর। প্রতিবিম্বের দৈর্ঘ্য ও বস্তুর দৈর্ঘ্যের অনুপাতকে **রৈখিক বিবর্ধন** বলে। রৈখিক বিবর্ধন m হলে $m = \frac{pq}{PQ}$।

বস্তু যখন উত্তল লেন্সের ফোকাস দূরত্বের মধ্যে থাকে জ্যামিতির সাহায্যে প্রতিবিম্ব আঁকলে দেখা যাবে সেটি অসৎ, সোজা এবং আকারে বড় (চিত্র 7.22)। যে কোন উত্তল লেন্সের এক পাশে যে কোন একটি বস্তু রেখে অন্য পাশের কাছে চোখ নিয়ে দেখলে আকারে বড় অসদ্বিম্ব দেখা যায় (চিত্র 7.23)। এই জন্য উত্তল লেন্সকে **বিবর্ধক কাচ** বা অনেক সময় সহজ অণুবীক্ষণ যন্ত্র বলা হয়। উত্তল লেন্স দিয়ে ক্যামেরা, অণুবীক্ষণ, দূরবীক্ষণ ও নানা ধরনের যন্ত্রপাতি তৈরি হয়।

চিত্র 7.23

লেন্সের পাওয়ার : চশমার জন্য যে লেন্স ব্যবহার হয় তার নানা রকম পাওয়ারের কথা শোনা যায়। কোনটি আবার প্লাস, কোনটি মাইনাস। উত্তল লেন্সের ক্ষেত্রে প্লাস এবং অবতল লেন্সের জন্য মাইনাস বলাই প্রচলিত রীতি। এবং

$$\text{লেন্সের পাওয়ার} = \frac{1}{\text{মিটারে ফোকাস দূরত্ব}}।$$

$$\text{অথবা} = \frac{100}{\text{সেন্টিমিটারে ফোকাস দূরত্ব}}$$

চশমার পাওয়ার + 4 এর অর্থ লেন্সটি উত্তল এবং তার ফোকাস দূরত্ব 25 cm।

আলো ও শক্তি

আলো এক ধরনের শক্তি। অন্যান্য শক্তির মত আলোও অন্য শক্তিতে রূপান্তরিত হতে পারে। দুটো পাথর ঘষলে বা একটা পাথরে লোহা দিয়ে আঘাত করলে আগুন দেখা যায়। ছুরি, কাঁচি শান দেওয়ার সময় ঘুরন্ত পাথর থেকে আলোর ফুলকি বেরিয়ে আসতে তোমরা অনেকেই দেখে থাকবে। একটা মোমবাতি জালালে বা অ্যাসিটিলিন গ্যাস পোড়ালে রাসায়নিক শক্তি থেকে

আলোক শক্তি পাওয়া যায়। আলোকচিত্রের ফলকে আলো পড়ে রাসায়নিক শক্তিতে পরিণত হয়। ইলেকট্রিক আলোর বাল্‌বে বিদ্যুৎশক্তি আলোক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। কয়েক শ্রেণীর ধাতু আছে যেমন পট্যাসিয়ম, সিজিয়ম ইত্যাদি যাদের উপরে আলো পড়লে ইলেকট্রন বেরিয়ে আসে। আলোর স্পর্শে এই সব ধাতুর ব্যবহার কাজে লাগিয়ে ফোটোইলেকট্রিক সেল বা আলোক-তড়িৎ-কোষে বিদ্যুৎপ্রবাহের সৃষ্টি হয়। আধুনিক বিভিন্ন যন্ত্রপাতিতে আলোক-তড়িৎকোষের ব্যবহার হয়ে থাকে। খুব সামান্য হলেও আলো চাপ সৃষ্টি করতে পারে। 1900 খ্রীস্টাব্দে লেবেডিউ এই তথ্য প্রমাণ করেন। 1918 খ্রীস্টাব্দে মেঘনাদ সাহা আলোর চাপ মেপে দেখান। এই চাপ প্রায় 4×10^{-4} dyne-এর সমান।

আলোর সঞ্চরণ ও বেগ

সূর্যের কাছ থেকে আমরা আলো পাই। সূর্যের কাছ থেকে এই শক্তি কি ভাবে আমাদের কাছে আসে? এই প্রশ্নের প্রথম উত্তর দেবার চেষ্টা করেন একজন ওলন্দাজ বৈজ্ঞানিক খ্রীষ্টিয়ান হয়গেনস (1629-95)। তিনি বলেন এই শক্তি আসে তরঙ্গ মাধ্যমে। এই ধারণা তাঁর প্রথম হয় জলের তরঙ্গ লক্ষ্য করে। জলে যখন কোন ঢিল ফেলা হয় তখন ঢিলের শক্তি তরঙ্গের সৃষ্টি করে এবং সেই শক্তি তরঙ্গ মাধ্যমে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

চিত্র 7.24

শুধু আলো নয়, সূর্য থেকে অন্যান্য বিকিরণ শক্তিও তরঙ্গ মাধ্যমে পৃথিবীতে আসে। এই সব বিকিরণ শক্তি হচ্ছে রেডিও তরঙ্গ, অবলোহিত আলো, দৃশ্য আলো, অতি বেগুনি আলো, এক্‌স্ রশ্মি, গামা রশ্মি প্রভৃতি। এই সব বিকিরণ শক্তির সাধারণ নাম তড়িচ্চুম্বকীয় তরঙ্গ। এদের মধ্যের পার্থক্য এদের তরঙ্গের দৈর্ঘ্য। তরঙ্গদৈর্ঘ্য কাকে বলে? একটি পূর্ণ তরঙ্গের দৈর্ঘ্যকে তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য বলে। 7.24 চিত্রে OA দৈর্ঘ্য হচ্ছে তরঙ্গদৈর্ঘ্য। ছবি দেখে নিশ্চয় বুঝতে পারছ তরঙ্গ OX পথে সঞ্চারিত হচ্ছে। অর্থাৎ তরঙ্গগুলি ক্রমাগত পুনরাবৃত্তির পর OX পথে এগিয়ে যাচ্ছে। প্রতি সেকেণ্ডে যতগুলি মোট তরঙ্গ হতে পারে

বস্তু যখন উত্তল লেন্সের ফোকাস দূরত্বের মধ্যে থাকে জ্যামিতির সাহায্যে প্রতিবিম্ব আঁকলে দেখা যাবে সেটি অসৎ, সোজা এবং আকারে বড় (চিত্র 7.22)। যে কোন উত্তল লেন্সের এক পাশে যে কোন একটি বস্তু রেখে অন্য পাশের কাছে চোখ নিয়ে দেখলে আকারে বড় অসদ্বিম্ব দেখা যায় (চিত্র 7.23)। এই জন্য উত্তল লেন্সকে **বিবর্ধক কাচ** বা অনেক সময় সহজ অণুবীক্ষণ যন্ত্র বলা হয়। উত্তল লেন্স দিয়ে ক্যামেরা, অণুবীক্ষণ, দূরবীক্ষণ ও নানা ধরনের যন্ত্রপাতি তৈরি হয়।

চিত্র 7.23

লেন্সের পাওয়ার : চশমার জন্য যে লেন্স ব্যবহার হয় তার নানা রকম পাওয়ারের কথা শোনা যায়। কোনটি আবার প্লাস, কোনটি মাইনাস। উত্তল লেন্সের ক্ষেত্রে প্লাস এবং অবতল লেন্সের জন্য মাইনাস বলাই প্রচলিত রীতি। এবং

$$\text{লেন্সের পাওয়ার} = \frac{1}{\text{মিটারে ফোকাস দূরত্ব}}।$$

$$\text{অথবা} = \frac{100}{\text{সেন্টিমিটারে ফোকাস দূরত্ব}}$$

চশমার পাওয়ার + 4 এর অর্থ লেন্সটি উত্তল এবং তার ফোকাস দূরত্ব 25 cm।

আলো ও শক্তি

আলো এক ধরনের শক্তি। অন্যান্য শক্তির মত আলোও অন্য শক্তিতে রূপান্তরিত হতে পারে। দুটো পাথর ঘষলে বা একটা পাথরে লোহা দিয়ে আঘাত করলে আগুন দেখা যায়। ছুরি, কাঁচি শান দেওয়ার সময় ঘুরন্ত পাথর থেকে আলোর ফুলকি বেরিয়ে আসতে তোমরা অনেকেই দেখে থাকবে। একটা মোমবাতি জালালে বা অ্যাসিটিলিন গ্যাস পোড়ালে রাসায়নিক শক্তি থেকে

আলোক শক্তি পাওয়া যায়। আলোকচিত্রের ফলকে আলো পড়ে রাসায়নিক শক্তিতে পরিণত হয়। ইলেকট্রিক আলোর বাল্‌বে বিদ্যুৎশক্তি আলোক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। কয়েক শ্রেণীর ধাতু আছে যেমন পট্যাসিয়ম, সিজিয়ম ইত্যাদি যাদের উপরে আলো পড়লে ইলেকট্রন বেরিয়ে আসে। আলোর স্পর্শে এই সব ধাতুর ব্যবহার কাজে লাগিয়ে ফোটোইলেকট্রিক সেল বা আলোক-তড়িৎ-কোষে বিদ্যুৎপ্রবাহের সৃষ্টি হয়। আধুনিক বিভিন্ন যন্ত্রপাতিতে আলোক-তড়িৎকোষের ব্যবহার হয়ে থাকে। খুব সামান্য হলেও আলো চাপ সৃষ্টি করতে পারে। 1900 খ্রীস্টাব্দে লেবেডিউ এই তথ্য প্রমাণ করেন। 1918 খ্রীস্টাব্দে মেঘনাদ সাহা আলোর চাপ মেপে দেখান। এই চাপ প্রায় 4×10^{-4} dyne-এর সমান।

আলোর সঞ্চরণ ও বেগ

সূর্যের কাছ থেকে আমরা আলো পাই। সূর্যের কাছ থেকে এই শক্তি কি ভাবে আমাদের কাছে আসে? এই প্রশ্নের প্রথম উত্তর দেবার চেষ্টা করেন একজন ওলন্দাজ বৈজ্ঞানিক খ্রীষ্টিয়ান হয়গেনস (1629-95)। তিনি বলেন এই শক্তি আসে তরঙ্গ মাধ্যমে। এই ধারণা তাঁর প্রথম হয় জলের তরঙ্গ লক্ষ্য করে। জলে যখন কোন ঢিল ফেলা হয় তখন ঢিলের শক্তি তরঙ্গের সৃষ্টি করে এবং সেই শক্তি তরঙ্গ মাধ্যমে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

চিত্র 7.24

শুধু আলো নয়, সূর্য থেকে অন্যান্য বিকিরণ শক্তিও তরঙ্গ মাধ্যমে পৃথিবীতে আসে। এই সব বিকিরণ শক্তি হচ্ছে রেডিও তরঙ্গ, অবলোহিত আলো, দৃশ্য আলো, অতি বেগুনি আলো, এক্স্‌ রশ্মি, গামা রশ্মি প্রভৃতি। এই সব বিকিরণ শক্তির সাধারণ নাম তড়িচ্চুম্বকীয় তরঙ্গ। এদের মধ্যের পার্থক্য এদের তরঙ্গের দৈর্ঘ্য। তরঙ্গদৈর্ঘ্য কাকে বলে? একটি পূর্ণ তরঙ্গের দৈর্ঘ্যকে তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য বলে। 7.24 চিত্রে OA দৈর্ঘ্য হচ্ছে তরঙ্গদৈর্ঘ্য। ছবি দেখে নিশ্চয় বুঝতে পারছ তরঙ্গ OX পথে সঞ্চারিত হচ্ছে। অর্থাৎ তরঙ্গগুলি ক্রমাগত পুনরাবৃত্তির পর OX পথে এগিয়ে যাচ্ছে। প্রতি সেকেণ্ডে যতগুলি মোট তরঙ্গ হতে পারে

সেই সংখ্যাকে কম্পাঙ্ক বা ফ্রিকোয়েন্সি বলে। ধর c যদি আলোর বেগ, ν যদি কম্পাঙ্ক ও λ যদি তরঙ্গদৈর্ঘ্য হয় তবে সংজ্ঞা অনুযায়ী $c=\nu\lambda$।

সুতরাং আলোর বেগ যখন নির্দিষ্ট তখন কম্পাঙ্ক বাড়লে তরঙ্গদৈর্ঘ্য কমবে এবং কম্পাঙ্ক কমলে তরঙ্গদৈর্ঘ্য বাড়বে। তড়িচ্চুম্বকীয় তরঙ্গের কম্পাঙ্ক বা তরঙ্গদৈর্ঘ্য অনুযায়ী বিকিরণ শক্তির শ্রেণীবিন্যাস হয়ে থাকে। দৃশ্য আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য 4000 Å থেকে 7500Åর মধ্যে। সাধারণত তরঙ্গদৈর্ঘ্য অ্যাংস্ট্রম এককে প্রকাশ করা হয়। এই এককের প্রতীক Å। $1Å=10^{-10}m$।

আলোর বেগ মাপার প্রথম চেষ্টা করেন গ্যালিলিও। কিন্তু তখন সময়ের সূক্ষ্ম ব্যবধান মাপার কোন পদ্ধতি না থাকায় তাঁকে চেষ্টা ছেড়ে দিতে হয়। 1775 খ্রীস্টাব্দে ওলাফ রোমার নামে একজন বিজ্ঞানী প্রথম আলোর গতিবেগ মাপেন। তিনি বৃহস্পতির একটি উপগ্রহের গ্রহণ লক্ষ্য করতে থাকেন। পৃথিবী যখন বৃহস্পতির সব থেকে কাছে এবং সব থেকে দূরে, এই দুই অবস্থায় উপগ্রহটির গ্রহণ লাগার সময়ের ব্যবধান মাপেন। পৃথিবীর কক্ষপথের গড় ব্যাস জানা আছে। এই দূরত্বকে ঐ সময় দিয়ে ভাগ করে রোমার আলোর গতিবেগ বার করেন প্রতি সেকেণ্ডে 1,86,000 মাইল অর্থাৎ $2{\cdot}98\times10^{8}m$।

1926 খ্রীস্টাব্দে মাইকেলসন নামে আর একজন বিজ্ঞানী প্রায় 35 km দূরে দুটো ঘূর্ণ্যমান আয়নার সাহায্যে আলোর বেগ মাপেন। শূন্যে অলোর বেগ প্রায় $3{\cdot}0\times10^{8}$ m/s। ঘন মাধ্যমে আলোর বেগ কমে। জলে আলোর বেগ $2{\cdot}75\times10^{8}$ m/s।

সুতরাং দেখতে পাচ্ছ আলোক শক্তি তরঙ্গের আকারে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নির্দিষ্ট বেগে যেতে পারে। সূর্য থেকে পৃথিবীতে আলো আসতে মাত্র আট মিনিট সময় লাগে। বায়ুশূন্য স্থানেও আলো তরঙ্গ আকারে যায়। আইনস্টাইনের তত্ত্ব অনুসারে কোন কিছুই শূন্যে আলোর বেগের চেয়ে বেশি বেগে যেতে পারে না।

আলোর বিচ্ছুরণ

আকাশে রামধনু নিশ্চয়ই দেখেছ। বর্ষাকালে আকাশের গায়ে সূর্যের বিপরীত দিকে চাইলে অনেক সময় ধনুকের মত বাঁকা সাতটি রং দেখতে পাবে। সূর্যের আলো ভেঙে সাতটি রঙের সৃষ্টি হয়েছে। জলের উপর তেলের পাতলা স্তর যখন ভাসে তখন সেদিকে চাইলেও সাতটি রঙ দেখতে পাওয়া যায়। সাবানের

ফেনায়, মৌমাছি বা ফড়িং-এর পাথায়, মুক্তোর উপরের স্তরে, মাছের আঁশেও সূর্যের আলো পড়লে একাধিক রঙ দেখা যায়। গ্রাম অঞ্চলে প্রাচীন জমিদার বাড়ির ঝাড় লণ্ঠনে এক ধরনের ত্রিকোণাকৃতি কাচ দেখতে পাওয়া যায়। এই কাচকে প্রিজম বলে। পরীক্ষাগারে যে প্রিজম ব্যবহার করা হয় সেটা অনেকটা এই রকম দেখতে। যদি কোন সাদা আলো প্রিজমের কোন এক তলে এসে পড়ে তবে অন্য তল থেকে নির্গত হয়ে সাতটি রঙের সৃষ্টি করে।

প্রিজমে প্রতিসরণের ফলে সাদা রঙ ভেঙে সাতটি মূল রঙ পাওয়ার প্রণালীকে বলে **বিচ্ছুরণ** বা ডিসপারশন। সাতটি রঙের আলোক পটিকে বলা হয় **বর্ণালী** বা স্পেকট্রাম।

পরীক্ষাগারে বর্ণালী সৃষ্টি

কোন উৎস থেকে সাদা আলোর সমান্তরাল রশ্মি ছবিতে চিহ্নিত পথে প্রিজমে পড়লে প্রতিসরিত রশ্মি প্রিজমের ভিতর দিয়ে অপর তলে দ্বিতীয়বার প্রতিসরিত হয়ে যখন P পর্দার উপর পৌছোয় তখন সাদা আলো পর পর সাতটি রঙে পাশাপাশি ছড়িয়ে পড়ে। শুদ্ধ বর্ণালী পেতে হলে আলোর উৎস Sএর পর একটি উত্তল লেন্স L_1 রেখে রশ্মি সমান্তরাল করতে হয় এবং প্রিজমের অন্য পাশে আর একটি উত্তল লেন্স L_2 রেখে লেন্সের ফোকাস দূরত্বে পর্দা রাখলে ভিন্ন
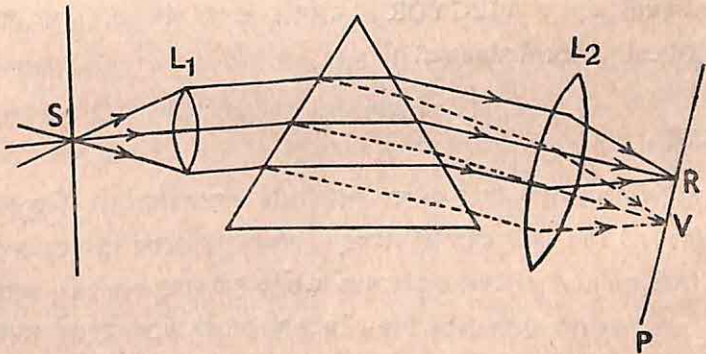
চিত্র 7.25

ভিন্ন রঙগুলি ঠিকমত আলাদা ও স্পষ্ট হয় (চিত্র 7.25)। বর্ণালী লক্ষ্য করলে দেখবে প্রতিটি আলো-রশ্মি প্রিজমের ভূমির দিকে বেঁকেছে। বেগুনি আলো

সবচেয়ে বেশি বেঁকেছে এবং লাল আলো সবচেয়ে কম। মাঝের রঙগুলো লাল ও নীলের মধ্যে বেঁকেছে। রঙগুলি কি পরিমাণে বাঁকবে অর্থাৎ তাদের চ্যুতি কত হবে তা নির্ভর করে প্রিজমের প্রতিসরাঙ্ক ও আলোর রঙের উপর। প্রতিসরণের দ্বিতীয় সূত্র পড়ার সময় তোমরা এ তথ্য জেনেছ। বেগুনি রঙের চ্যুতি সবচেয়ে বেশি এবং তার প্রতিসরাঙ্ক সবচেয়ে কম। লালের চ্যুতি সবচেয়ে কম, প্রতিসরাঙ্ক সবচেয়ে বেশি। পরীক্ষাগারে বর্ণালী লক্ষ্য করলে দেখবে বর্ণালীর পটিতে লাল রঙ উপরে থাকে কারণ তার চ্যুতি কম এবং বেগুনি রঙ সবচেয়ে নিচে থাকে কারণ তার চ্যুতি সবচেয়ে বেশি।

1666 খ্রীস্টাব্দে নিউটন প্রথম সাদা আলো ভেঙে সাতটি রঙ হতে দেখেন। কেম্ব্রিজ সহরে তাঁর বাড়ির জানালার খড়খড়ি দিয়ে অন্ধকার ঘরে আলো এসে পড়লে তিনি একটি প্রিজমের ভিতর দিয়ে আলো-রশ্মি পাঠিয়ে সাতটি রঙ করেন। তিনি এই সিদ্ধান্তে আসেন যে সাদা রঙ কোন রঙ নয়, সাতটি মূল রঙের সমষ্টি। এই মূল রঙের আলোকে বলে **মৌলিক একবর্ণ রশ্মি** বা মনোক্রোমেটিক রে।

এই সাতটি রঙ হল—বেগুনি (ভায়োলেট), সমুদ্র নীল (ইণ্ডিগো), আকাশী নীল (ব্লু), সবুজ (গ্রীন), হলুদ (ইয়েলো), কমলা (অরেঞ্জ) ও লাল (রেড)। মনে রাখার জন্য প্রতিটি রঙের ইংরেজী প্রতিশব্দের আদ্য অক্ষর নিলে কথাটি দাঁড়ায় VIBGYOR। বাংলায় প্রথম অক্ষরগুলো পর পর সাজালে শোনায় **'বেনীআসহকলা'**।

রামধনু

মেঘলা দিনে আকাশের জল-কণার উপর রোদ পড়লে আলোর বিচ্ছুরণে বর্ণালীর সৃষ্টি হয়। এই বর্ণালীই রামধনু। রামধনু অর্ধবৃত্তের আকারে দেখা যায়। বৃষ্টি হওয়ার পরে অথবা আকাশে গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি হচ্ছে এবং সূর্যও আছে এই রকম অবস্থায় সূর্যের দিকে পিছন ফিরে আকাশের দিকে চাইলে অনেক সময় রামধনু দেখা যায়।

জলপ্রপাত থেকে উপরে ছিটকে আসা জলের কণায় আলোর বিচ্ছুরণে রামধনু দেখা যায়। এক মুখ জল নিয়ে রোদের দিকে ফুঁ দিয়ে দ্রুত ছড়িয়ে দিলে জলকণাগুলোর মধ্যে রামধনুর মত দেখা যায়। তোমরা নিজেরাও

পরীক্ষা করে দেখতে পার সত্যি সত্যি দেখা যায় কিনা। রামধনু কেন দেখা যায় বড় হয়ে তোমরা পরে পড়বে।

বিচ্ছুরণের কারণ

আলোর প্রতিটি রঙের একটি নির্দিষ্ট তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য আছে। বর্ণালীতে যে সাতটি রঙ তোমরা দেখেছ অ্যাংস্ট্রম এককে তাদের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য হল : বেগুনি (4000—4500), সমুদ্র নীল (4500—4600), আকাশী নীল (4600—5000), সবুজ (5000—5820), হলুদ (5820—5900), কমলা (5900—6200), লাল (6200—7500)।

সাদা আলো হল ভিন্ন তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট এই সাতটি রঙের মিশ্রণ। যখন কোন প্রিজমের ভিতর দিয়ে আলো-রশ্মি যায় তখন এই সাতটি তরঙ্গ পৃথক হয়ে পড়ে। সাদা আলোর মিশ্রণ থেকে বিভিন্ন মূল রঙগুলির তরঙ্গের পৃথকীকরণকে আলোর বিচ্ছুরণ বলে।

আলোর প্রতিসরণ নির্ভর করে সংশ্লিষ্ট মাধ্যম দুটির উপর এবং আলোর রঙের উপর। সেইজন্য প্রিজমের ভিতর বিভিন্ন তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের আলো যখন এসে পড়ে তখন প্রতিসরণের জন্য তাদের চ্যুতি এক না হওয়ায় তারা একে অন্যের কাছ থেকে পৃথক হয়ে পড়ে ও বিচ্ছুরিত হয়।

আলোক-তরঙ্গের বিচ্ছুরণের কারণ তোমরা পড়লে। বাতাসে অসংখ্য ধূলিকণা আছে। সূর্যের আলো যখন এই কণাগুলির উপর এসে পড়ে তখন চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। স্বচ্ছ বস্তুর অথবা তরলের ভিতর দিয়ে আলো গেলেও চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এই ঘটনাকে বলে আলোর **বিক্ষেপণ**। বিক্ষেপণের ফলে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য পরিবর্তিত হয়। ভারতীয় বৈজ্ঞানিক সি. ভি. রামন বিক্ষেপণের উপর গবেষণা করে 1930 সালে নোবেল পুরস্কার পান। রামন ও তাঁর আবিষ্কারের কথা বড় হয়ে তোমরা পড়বে।

বস্তুর রঙ

কোন বস্তুর রঙ নির্ভর করে বস্তু নিজে রঙিন হলে অথবা তার উপর রঙিন আলো পড়লে। কোন অনচ্ছ বস্তুর উপর সাদা আলো আপতিত হলে বস্তু সাদা আলোর এক বা একাধিক রঙ শোষণ করে এবং বাকি রঙগুলিকে প্রতিফলিত করে। যেমন ধর, গাছের পাতা দেখতে সবুজ। পাতার উপরে

যখন সাদা আলো এসে পড়ে তখন পাতাটি সাদা আলোর সবুজ রঙ ছাড়া অন্য সব রঙকে শোষণ করে এবং সবুজ রঙ পাতার গায়ে প্রতিফলিত হয়ে আমাদের চোখে এসে পড়লে সবুজ মনে হয়। সেই রকম একই কারণে লাল বস্তুকে লাল, হলুদ বস্তুকে হলুদ দেখাবে। কোন বস্তু সব কয়টি রঙকে প্রতিফলিত করলে সাদা এবং সব কয়টি রঙকে শোষণ করলে কালো দেখায়। সাদা বা কালো কোন রঙ নয়।

আবার স্বচ্ছ বস্তুর ভিতর দিয়ে সাদা আলো গেলে বস্তুটি কোন একটি রঙ ছাড়া অন্য সব কয়টি রঙ শোষণ করলে বস্তুটির রঙ নির্গত রশ্মির রঙের মত দেখাবে। যেমন ধর, একটি লাল কাচ। এর ভিতর দিয়ে সাদা আলো যাবার সময় লাল রঙ ছাড়া অন্যগুলি শোষিত হয়। লাল রঙ কাচের ভিতর দিয়ে শোষিত না হয়ে বেরিয়ে যায়। সেজন্য কাচটাকে লাল দেখায়।

একটা সবুজ কাচের ভিতর দিয়ে যদি লাল জবা ফুল দেখ তবে কেমন দেখাবে? ফুলটা কালো দেখাবে। কারণ জবা ফুল লাল রঙ প্রতিফলিত করে আর সবুজ কাচ সবুজ রঙ ছাড়া সব রঙকে শোষণ করে এবং এই লাল রঙকেও শোষণ করবে। সেই কারণে ফুলটি কালো দেখাবে।

৮ পদার্থের বিভিন্ন অবস্থা ও তার রূপান্তরের কারণ

পদার্থের কঠিন অবস্থা

তৃতীয় অধ্যায়ে তোমরা পড়েছ, পদার্থ তিনটি অবস্থায় থাকে—কঠিন, তরল ও গ্যাস। যে সব রাসায়নিক মৌল বা যৌগ সাধারণ চাপে ও তাপমাত্রায় কঠিন, তাদেরও মোটামুটি দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। খাদ্যলবণ, তুঁতে, ফটকিরি, মিছরি প্রভৃতি অধিকাংশ যৌগে নির্দিষ্ট আকার থাকে। এই আকার ছোট বা বড় অবস্থায় একই থাকে। একটি বড় টুকরো ভাঙলে একই আকারে ছোট টুকরো পাওয়া যাবে। এদের বলে **কেলাস** বা **ক্রস্টাল**। NaCl বা $CuSO_4$ ক্রস্টাল আকারে পাওয়া যায়। জলের দ্রবণ থেকে জল শুকিয়ে ফেললে, যখন NaCl বা $CuSO_4$ তলানি পড়ে লক্ষ্য করে দেখবে সেগুলিও ক্রস্টাল হয়ে পড়ে। কাচ, আলকাতরা, ছাই প্রভৃতি আরও এক ধরনের কঠিন বস্তু আছে যাদের কোন নির্দিষ্ট আকার নেই। অনিয়তাকার এই বস্তুগুলিকে **অকেলাসিত, ননক্রস্টালাইন** বা **অ্যামরফাস** বলা হয়।

ক্রস্টালে যৌগদের অণু ও পরমাণুগুলি একটি জ্যামিতিক আকারে সাজানো থাকে। প্রাকৃতিক অবস্থায় অনেক সময় বড় বড় ক্রস্টাল পাওয়া যায়। তামার খনিতে অনেক সময় যে তামার ক্রস্টাল পাওয়া যায় তার এক একটি তলের দৈর্ঘ্য এক সেন্টিমিটার পর্যন্ত হয়। যে কোন ধাতুপাতকে পালিশ করে মাইক্রোসকোপের সাহায্যে তলগুলি দেখলে ক্রস্টাল আকার পরিষ্কার দেখা যায়। যে কোন অ্যামরফাস পাউডার মাইক্রোসকোপে দেখলে কোন বিশেষ আকার দেখা যায় না। নানা আকারে ক্রস্টালে অণুপরমাণুগুলি যে ভাবে সাজানো থাকে তাকে ছয় রকম ভিন্ন ধরনের জ্যামিতিক আকারে ভাগ করা যায়। 8.1 চিত্রে জ্যামিতিক আকারগুলি দেখানো হল।

যে কোন একটি ক্রস্টালের ক্ষেত্রে তার সব থেকে ছোট আকারটি তার ইউনিট এবং সেই ইউনিট জুড়ে জুড়ে বড় আকারের ক্রস্টাল হয়। এইভাবে জোট বাঁধার কারণ অণুর মধ্যের পরমাণুগুলির নিজেদের মধ্যে আকর্ষণ বল। প্রত্যেকটি পরমাণু তাদের আশেপাশের পরমাণুগুলির সঙ্গে যুক্ত থাকে। তাদের বিচ্ছিন্ন করতে যে শক্তি লাগে তাকে **বন্ধন- শক্তি** বলে। প্রত্যেক ক্রস্টালের

এই বন্ধন-শক্তি তার বৈশিষ্ট্য এবং সেটা ঐ ক্রস্টালের ধর্ম বলেই ধরা হয়। বাইরে থেকে শক্তি প্রয়োগ না করলে ঐ ক্রস্টালের বিশিষ্ট আকার বদলানো যায় না।

চিত্র 8.1
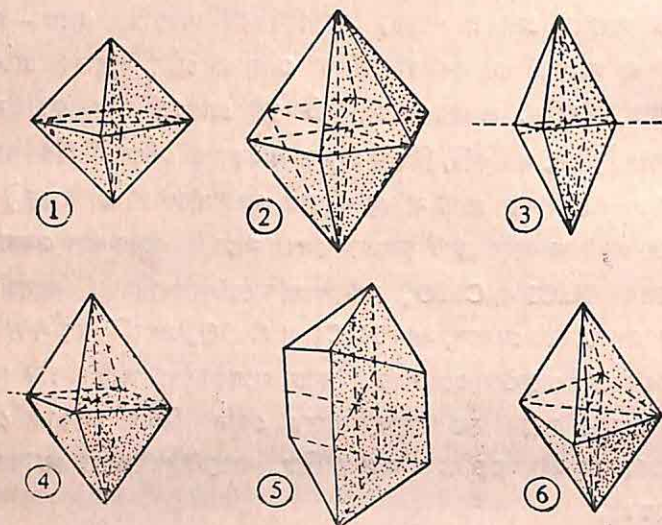
অণুগুলি কেমন ভাবে সাজান আছে তার উপর বস্তুটির আকার এবং অন্যান্য ভৌত গুণ নির্ভর করে। এর সব থেকে ভাল উদাহরণ গ্রাফাইট এবং হীরা। দুটি বস্তুই কার্বন অণু দিয়ে তৈরি। গ্রাফাইট দিয়ে পেনসিলের সীস তৈরি হয়। গ্রাফাইটের রং কালো। ঘষলেই উঠে আসে ও দামে সস্তা। আর হীরা স্বচ্ছ, অধাতু হওয়া সত্ত্বেও সব থেকে শক্ত বস্তু এবং দুর্মূল্য রত্ন। 8.2 চিত্রে হীরা আর গ্রাফাইটের আণবিক গঠন দেখ, তাহলে এই ভিন্ন ধর্মের

চিত্র 8.2
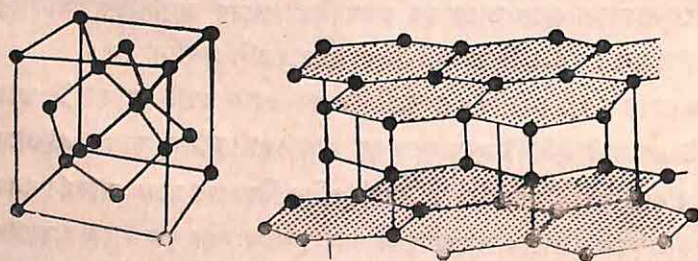
কারণ বুঝতে পারবে। ভূপৃষ্ঠের অনেক নিচে চাপ ও তাপের কোন একটি বিশেষ অবস্থায় কয়লার মধ্যেই হীরা তৈরি হয়। আফ্রিকার অনেক নাম করা হীরার খনির কথা তোমরা পড়ে থাকবে। আবার প্রাকৃতিক অবস্থায় নীলা বলে এক ধরনের দামী পাথর পাওয়া যায় যার মূল উপাদান অ্যালুমিনিয়ম অক্সাইড বা অ্যালুমিনা। অ্যালুমিনা এক ধরনের সাদা গুঁড়ো পাউডার কিন্তু প্রায় 2000°C তাপমাত্রায় গলিয়ে কৃত্রিম নীলা করা যায়। কৃত্রিম উপায়ে হীরা তৈরি ব্যবসায়িক ভিত্তিতে এখনও সম্ভব হয়নি।

ক্রস্টাল, তরল ও গ্যাস

অণুগঠন দিয়ে বিচার করলে ক্রস্টাল, তরল ও গ্যাস এ তিনটির মধ্যে পার্থক্য বেশ ভাল করে বোঝা যাবে। ক্রস্টালের ক্ষেত্রে অণু পরমাণুদের মধ্যে পারস্পরিক বন্ধন-শক্তিই তাদের বিশিষ্ট আকার দেয়। তরলে এই বন্ধন-শক্তি অত্যন্ত কম এবং এত কম যে অণুগুলিকে বিশেষ আকার দিতে পারে না, তাই তরলের কোন নিজস্ব আকার নেই। কোন অনুভূমিক তলে ফেললে ছড়িয়ে পড়ে। যে কোন পাত্রে রাখলে পাত্রের আকার নেয়। তরলের অণুদের মধ্যে কিছুটা বন্ধন আছে বলে তারা নিজে নিজে আলাদা হয় না। তরলের সব থেকে উপরের তলের অণুগুলি তাদের দুপাশের নিচের তলের অণুদের সঙ্গে বাঁধা। এই বন্ধন কম হলেই অণুগুলি ছিন্ন হয়ে বাতাসে উঠে যায় এবং বাষ্পায়ন হয়। অকেলাসিত বস্তুগুলিকে ক্রস্টাল ও তরলের অন্তর্বর্তী অবস্থা বলা চলে। এদের অণুদের মধ্যের বন্ধন-শক্তি ক্রস্টাল তৈরির মত যথেষ্ট নয় আবার তরলের থেকে বেশি। গ্যাসের অণুরা মুক্ত, যে যেমন খুশী দিকে বিচরণ

চিত্র 8.3
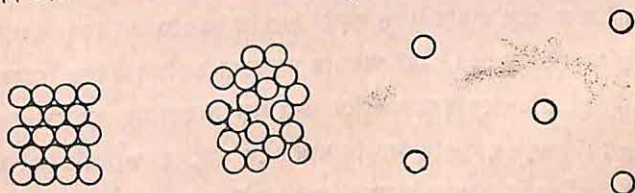
করতে পারে, তাই গ্যাসের কোন আকার বা আয়তন নেই। অণুর গঠন দিয়ে বিচার করলে ক্রস্টাল, তরল ও গ্যাস 8.3 চিত্রের মত দেখাবে।

ক্রস্টালে পরমাণুগুলি চলাফেরা করতে পারে না, নিজের চারপাশে ভাল

করে ঘুরতে পারে না, কেবল একটি মধ্যবর্তী কেন্দ্রবিন্দুর চারপাশে স্পন্দিত হতে পারে। গ্যাসে পরমাণুগুলি একদম ছাড়া। যে কোন দিকে ছুটে বেড়াবার, ঘুরবার বা স্পন্দিত হবার পূর্ণ স্বাধীনতা তাদের।

গরম করলে কি হয় ?

কেলাসিত বস্তু গরম করতে থাকলে বস্তুর পরমাণুগুলি তাপ শোষণ করে ও তাদের গতিশক্তি তাপমাত্রার অনুপাতে বাড়তে থাকে। গতিশক্তি বাড়লে পরমাণুগুলি চারপাশের অন্য পরমাণুর সঙ্গে বাঁধা থাকার জন্য কেবল মাত্র নিজের একটি গড় অবস্থানের দুপাশে স্পন্দিত হতে থাকে। তাপ বাড়তে থাকলে এমন একটা সময় আসে যখন গতিশক্তি পরমাণুটির বন্ধন-শক্তির সমান বা কাছাকাছি হয় ফলে বন্ধন আলগা হয়ে পড়ে। ক্রিস্টালের আকার ভেঙে পড়তে শুরু করে এবং গলন শুরু হয়। নির্দিষ্ট ক্রিস্টালে পরমাণুদের বন্ধন-শক্তি নির্দিষ্ট, সুতরাং যে তাপমাত্রায় গলন শুরু হয় তাও নির্দিষ্ট তাপমাত্রা। গলতে সময় লাগে, হঠাৎ সমস্ত ক্রিস্টাল গলে যায় না। একবার গলন শুরু হলে বাকি অংশ তাপ শোষণ করে ক্রিস্টাল থেকে তরলে পরিবর্তিত হতে থাকে, তখন আর পরমাণুগুলির গতিশক্তি বাড়ে না, ফলে তাপমাত্রা বাড়ে না। গলন শুরু হওয়া থেকে শেষ হওয়া পর্যন্ত যতটা তাপ লাগে তাই গলনের লীন তাপ।

পিচ, রবার প্রভৃতি অনিয়তাকার রাসায়নিকগুলির ক্ষেত্রে পরমাণুগুলির বন্ধন-শক্তি অপেক্ষাকৃত কম এবং নির্দিষ্ট নয়। তাই এদের গলনাঙ্ক নির্দিষ্ট নয় এবং গলন শুরু হলেও তাপমাত্রা বাড়তে থাকে।

বস্তুটি তরল হয়ে যাবার পরও তাপ প্রয়োগ করতে থাকলে পরমাণুদের গতিশক্তি আরও বাড়বে। এই অবস্থায় অণুগুলো চলাচল করতে পারে, অল্প মাত্রায় নিজের চারপাশে ঘুরতে পারে এবং গড় অবস্থানের দুপাশে স্পন্দিত হতে পারে। অণুর গতিশক্তি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তরলের তাপমাত্রাও বাড়তে থাকবে। গতিশক্তি বাড়তে বাড়তে এমন একটা সময় আসবে যখন অণুগুলি আশেপাশের অণুদের থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে তরল থেকে গ্যাস হবে, স্ফুটন শুরু হবে। স্ফুটনও সময়সাপেক্ষ। একবার স্ফুটন শুরু হলে শোষিত তাপ অণুগুলিকে বিচ্ছিন্ন করার কাজে ব্যবহৃত হবে, স্ফুটনের লীন তাপ শোষণ করে স্ফুটন শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাপমাত্রা বাড়বে না। স্ফুটনাঙ্ক একটি

নির্দিষ্ট তাপমাত্রা। গ্যাসকে গরম করতে থাকলে কি হবে? গ্যাসের অণুগুলির গতিশক্তি এবং সেই সঙ্গে তাপমাত্রা বাড়বে। নির্দিষ্ট আয়তনে গ্যাসে তাপমাত্রা বাড়লে সমানুপাতিক হারে চাপ বাড়বে। এই বিষয়ে বয়েলের সূত্র তোমরা পরের বছর পড়বে।

আরও গরম করলে কি হবে—আমাদের জানা অধিকাংশ বস্তুই কয়েক হাজার ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার মধ্যে গলে, ফুটে, গ্যাস হয়ে যায়। তাপমাত্রা আরও বাড়তে থাকলে বস্তুর আর কি কি পরিবর্তন হতে পারে এ প্রশ্ন মনে আসা স্বাভাবিক। এক সময় অণুগুলি ভেঙে উপাদান মৌলের পরমাণু হয়ে পড়বে। আরও বেশি গরম করলে পরমাণুগুলি থেকে ইলেকট্রন বিচ্ছিন্ন হয়ে পরমাণুর আয়ন ও ইলেকট্রন আলাদা হয়ে পড়বে। তাপ প্রয়োগে আয়ন সৃষ্টি করাকে বলে **তাপ আয়নন**। তাপ-আয়নন তত্ত্ব আবিষ্কার করে বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহা বিশ্ববিখ্যাত হন। কয়েক হাজার ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় অধিকাংশ মৌলের পরমাণুতে তাপ-আয়নন হয়। এই অবস্থায় বস্তুর সাধারণ ধর্ম বদলাতে থাকে। গ্যাস তখন পজিটিভ তড়িতাহিত আয়ন ও নেগেটিভ তড়িতাহিত ইলেকট্রনের স্রোতে পরিণত হয় এবং বস্তুর ভৌত ও রাসায়নিক ধর্ম সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়। বস্তুর এই অবস্থাকে **প্লাজমা** বলে। **প্লাজমা বস্তুর চতুর্থ অবস্থা।**

এখন গবেষণাগারে উচ্চ তাপমাত্রা সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে এবং প্লাজমা প্রবাহ ব্যবহার করে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে তড়িৎ উৎপাদনের চেষ্টা চলেছে। এর নাম ম্যাগনেটো-হাইড্রো-ডাইনামিক-পাওয়ার-জেনারেশন বা সংক্ষেপে এম এইচ ডি।

আরও তাপ বাড়ালে কি হবে? তাপ আয়নন-তত্ত্ব প্রয়োগ করে দেখা গেছে যে সূর্য বা অন্যান্য নক্ষত্রের দেহের তাপমাত্রা দশ লক্ষ বা কোটি ডিগ্রি সেলসিয়াস। এই উত্তাপে হাইড্রোজেন, হিলিয়ম, লিথিয়ম থেকে শুরু করে কার্বন, নাইট্রোজেন ইত্যাদি পরমাণুর সমস্ত ইলেকট্রন বিচ্ছিন্ন হয়ে খালি নিউক্লিয়সগুলি ঘুরে বেড়ায় এবং এদের গতিশক্তি এত বেশি সেগুলি পরস্পরের সঙ্গে আঘাত করে নিউক্লিয়ার রিঅ্যাকশন বা কেন্দ্রীণ বিক্রিয়া করতে সক্ষম। কেন্দ্রীণ বিক্রিয়ার ফলে বস্তু লুপ্ত হয়ে শক্তি বেরোয়। এগুলি শুধুমাত্র কল্পনা বা খাতায় কষা অঙ্কের কথা নয়—পৃথিবীতে পরমাণু বোমা ও হাইড্রোজেন বোমার বিস্ফোরণে তা প্রমাণ হয়েছে। পরে এসব বিস্তারিত ভাবে পড়বে।

৯ ভৌত ও রাসায়নিক পরিবর্তন

পদার্থ কিভাবে সনাক্ত করা যায় : ভৌত ও রাসায়নিক ধর্ম

জল এবং তেল উভয়েই তরল পদার্থ। এদের রঙ কিন্তু এক নয়। স্পর্শেও যে পৃথক, হাতে নিলেই বেশ বোঝা যায়। আবার বাদাম তেল এবং নারকোল তেল উভয়েই দেখতে অনেকটা এক হলেও গন্ধ কিন্তু আলাদা। কয়লা দেখতে কালো, তুঁতে দেখতে নীল, লোহা দেখতে বাদামী, লবণ অনেকটা সাদা, মিছরি দানাও সাদা। তামার রঙ লালাভ, অ্যালুমিনিয়ম উজ্জ্বল সাদা, সোনার রঙ উজ্জ্বল হলুদ। সোনা, লোহা বা অ্যালুমিনিয়মের কোন স্বাদ নেই। কিন্তু লবণ স্বাদে লবণাক্ত বা লোণা, মিছরি মিষ্টি মিষ্টি, তুঁতে কষ কষ। কিন্তু সাবধান, না জানা কোন জিনিস খেয়ে দেখো না, তুঁতে বিষ।

আবার সোনা, রুপো, লোহা বা অ্যালুমিনিয়ম কোনটাই জলে গুলে যায় না। অথচ তুঁতে, লবণ, মিছরি, ফটকিরি সহজেই জলে গুলে যায়। কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস এবং কিছু পরিমাণে অক্সিজেন জলে গুলে যেতে পারে।

অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন গ্যাসগুলির কোনটির কোন গন্ধ নেই। ক্লোরিন, অ্যামোনিয়া গ্যাসে ঝাঁঝালো গন্ধ। নানা রকম পদার্থের মধ্যে শুধুমাত্র লোহা, নিকেল, কোবাল্ট প্রভৃতি কয়েকটি পদার্থ চুম্বক দ্বারা আকৃষ্ট হয়।

জল, তেল, পেট্রল প্রভৃতির আপেক্ষিক ঘনাঙ্ক কম। অথচ পারদের আপেক্ষিক ঘনাঙ্ক বেশ বেশি।

বেসম, ময়দা, এরারুট গুঁড়ো গুঁড়ো পাউডারের মত। এদের কোন বিশিষ্ট আকার নেই। কিন্তু চিনি, মিছরি, লবণ, ফটকিরি প্রভৃতি দানা-দানা। বড় দানা ভাঙলে ছোট দানা পাওয়া যায়, এবং যত ছোটই হোক এদের প্রত্যেকের নিজস্ব আকার বজায় রাখে।

এখন দেখা যাচ্ছে—স্বাদে, গন্ধে, বর্ণে, স্পর্শে, আকারে, ঘনাঙ্কে, দ্রবণীয়তায় ভিন্ন ভিন্ন সব পদার্থের ধর্মও ভিন্ন। পদার্থের এই ধর্মগুলিই তাদের ভৌত ধর্ম। কোন বস্তুর উপাদান পরিবর্তিত হয়ে অন্য কোন বস্তুতে রূপান্তরিত না হওয়া

পর্যন্ত যে সব গুণের দ্বারা আমরা বস্তুটিকে সনাক্ত করতে পারি সেই সব গুণকে বস্তুর **ভৌত ধর্ম** বলে।

ভৌত গুণের দ্বারা পদার্থের শুধু বাহিক অবস্থা বা বাইরের গুণের পরিচয় পাওয়া যায়। পদার্থের ভৌত ধর্ম নির্ণয়ের জন্য সাধারণত জানতে হয় : (ক) তার অবস্থা—কঠিন, তরল, না গ্যাস, (খ) বর্ণ, (গ) গন্ধ, (ঘ) স্বাদ, (ঙ) স্পর্শ, (চ) জলে বা অন্য তরলে দ্রবণীয়তা, (ছ) জল বা বায়ুর তুলনায় ঘনাঙ্ক, (জ) গলনাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্ক, (ঝ) চুম্বকের সঙ্গে সম্পর্ক, (ঞ) তাপ ও বিদ্যুৎ পরিবহণের ক্ষমতা, (ট) স্থিতিস্থাপকতা ইত্যাদি।

পদার্থের ভৌত ধর্ম ছাড়াও আরো একরকম স্বভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন সাধারণ অ্যাসিডের স্পর্শে সোনার কোন পরিবর্তন হয় না। অথচ তামার উপর কয়েক ফোঁটা নাইট্রিক অ্যাসিড ফেললেই একরকম বাদামী রঙের গ্যাস তৈরি হয়। দস্তার উপর লঘু সালফিউরিক অ্যাসিড ফেলামাত্রই ভুরভুর করে গ্যাস বেরুতে থাকে। চিনির উপর সালফিউরিক অ্যাসিড ঢাললে চিনি কালো হয়ে যায়। খোলা হাওয়ার সংস্পর্শে এলে সোডিয়ম ধাতু জ্বলে ওঠে। সব ক্ষেত্রেই মূল পদার্থ কিন্তু পরিবর্তিত হচ্ছে।

পদার্থের এই জাতীয় স্বভাবকে তার রাসায়নিক গুণ বা ধর্ম বলে। বস্তুর রাসায়নিক উপাদান বা রাসায়নিক বিক্রিয়া সংক্রান্ত ধর্মকে বস্তুর **রাসায়নিক ধর্ম** বলে। যে কোন পদার্থকে ঠিকভাবে সনাক্ত করতে রাসায়নিক ধর্ম জানাও বিশেষ প্রয়োজন। এবং তা জানতে হলে (ক) জল, (খ) বায়ু, (গ) অ্যাসিড, ক্ষারক ইত্যাদির সংস্পর্শে এলে পদার্থটির কি পরিবর্তন ঘটে দেখতে হবে। তা ছাড়া পদার্থটি উচ্চ তাপে বা অন্যান্য পদার্থের সংস্পর্শে এলে কোন পরিবর্তন হয় কিনা তাও জানা প্রয়োজন। এছাড়া পদার্থ কী উপাদান দিয়ে তৈরি সেটাও তার রাসায়নিক ধর্ম থেকে জানা যায়।

সুতরাং অজানা একটি পদার্থকে সনাক্ত করতে হলে তার ভৌত ও রাসায়নিক ধর্ম বিশ্লেষণ করতে হবে।

ভৌত ও রাসায়নিক পরিবর্তন

বস্তুর ভৌত ধর্মের পরিবর্তনকে ভৌত পরিবর্তন এবং রাসায়নিক ধর্মের পরিবর্তনকে রাসায়নিক পরিবর্তন বলে। ভৌত পরিবর্তন অস্থায়ী এবং

এই পরিবর্তনে নতুন কোন বস্তু তৈরি হয় না। ভৌত পরিবর্তনে পদার্থের ওজনের পরিবর্তন হয় না এবং আণবিক গঠন একই থাকে। বস্তুর রাসায়নিক পরিবর্তনে সম্পূর্ণ নতুন বস্তুর উদ্ভব হয় এবং মূল বস্তুর আণবিক গঠনের পরিবর্তন হয়। রাসায়নিক পরিবর্তনে ওজন ও তাপেরও পরিবর্তন হতে পারে।

একটা সহজ পরীক্ষা কর। দুটো কাচের পাত্র নাও। একটা পাত্রে কিছু অ্যালুমিনিয়মের টুকরো ও অন্য পাত্রে কিছু চিনির টুকরো নাও। দুটো পাত্রকেই বেশ কিছুক্ষণ গরম কর। দেখবে অ্যালুমিনিয়মের বাহ্যিক চেহারার কোন পরিবর্তন হয় নি, কেবল গরম হয়েছে। এটি ধাতুটির ভৌত পরিবর্তন। কিন্তু চিনির পাত্র গরম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তা থেকে জল বার হবে। পরে জল বাষ্প হওয়ার পর কালো কার্বন পাত্রে পড়ে থাকবে। এটি চিনির রাসায়নিক পরিবর্তন। অ্যালুমিনিয়ম টুকরোগুলোকে যদি 660·2°C পর্যন্ত গরম করা সম্ভব হয় তাহলে দেখবে ধাতুটি গলে যাবে। এটি অ্যালুমিনিয়মের অবস্থার পরিবর্তন, সুতরাং এটিও অ্যালুমিনিয়মের ভৌত পরিবর্তন, কারণ এতে ধাতুটির রাসায়নিক গঠন অর্থাৎ আণবিক গঠন একই আছে। জল কঠিন, তরল ও গ্যাসীয় অবস্থায় থাকতে পারে। কিন্তু জলের আণবিক গঠন তিনটি অবস্থাতে একই থাকে। সামান্য অ্যাসিড মেশানো জলে তড়িৎ প্রবাহিত করলে জল ভেঙে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন গ্যাস বেরোয়। এটি জলের রাসায়নিক পরিবর্তন, কারণ এতে জলের আণবিক গঠনের পরিবর্তন হয়েছে। মরচে এক ধরনের লোহার অক্সাইড। অক্সিজেনের সঙ্গে লোহার রাসায়নিক বিক্রিয়ায় মরচে পড়ে। তামার পাত্র বেশ কিছুদিন ব্যবহার না করলে উপরে একটা সবুজ স্তর পড়ে। এটি তামার অক্সাইড—রাসায়নিক পরিবর্তনের ফল। আমাদের শরীরে রাসায়নিক পরিবর্তন কম হয় না। আমরা যে খাবার খাই পাকস্থলীতে তার রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে। নিঃশ্বাসের সঙ্গে যে অক্সিজেন আমরা নিই তার হিমোগ্লোবিনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে শরীরে বহু রকম রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটায়।

যে কারণে বস্তুর পরিবর্তন ঘটে

অনেকগুলি কারণে বস্তুর ভৌত পরিবর্তন ঘটতে পারে। তাপ প্রয়োগে বস্তুর প্রসারণ ঘটে আবার যথেষ্ট তাপ শোষণে বস্তুর অবস্থার পরিবর্তন ঘটতে

পারে। বিদ্যুৎ প্রবাহিত করলে পরিবাহী গরম হয়। বায়ুশূন্য পরিবেশে যথেষ্ট গরম হলে পরিবাহী প্রথমে লাল ও পরে সাদা আলো দেয়। এই পদ্ধতিতেই ইলেকট্রিক বাল্ব আলো দেয়। কয়েকটি বিশেষ ধাতুকে চুম্বক দিয়ে ঘষলে ধাতুটি চুম্বকের মত ব্যবহার করে। কোন কোন বস্তু জলে দ্রবীভূত হয়। এগুলি বস্তুর ভৌত পরিবর্তন। এতে বস্তুর উপাদানের কোন পরিবর্তন হয় না।

আলো, উত্তাপ, বিদ্যুৎ ও চাপের প্রয়োগে এমন কি ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর স্পর্শেও বস্তুর রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটতে পারে। জল, বায়ু, অ্যাসিড, ক্ষার প্রভৃতির সংস্পর্শে এলে অনেক বস্তুর রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে। ক্যামেরার ফিল্মে আলো এসে পড়লে রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে—এই পদ্ধতিতে ফোটোগ্রাফ তৈরি হয়। আলোর প্রভাবে হাইড্রোজেন ও ক্লোরিন গ্যাস যুক্ত হয়ে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড হয় এবং নাইট্রোজেন অক্সাইড ভেঙে নাইট্রাস অক্সাইড এবং অক্সিজেন হয়। আলোর প্রভাবে রাসায়নিক পরিবর্তনকে ফোটো-কেমিস্ট্রি বলে। মারকিউরিক অক্সাইডকে গরম করলে পারদ ও অক্সিজেন পাওয়া যায়। তড়িৎ প্রবাহ দিয়ে জল থেকে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন পাওয়া যায় একটু আগেই বলা হয়েছে। ভুঁই পটকা যখন মাটিতে সজোরে ছুড়ে ফেলা হয় তখন চাপের প্রভাবে পটকার ভিতরের পট্যাসিয়ম ক্লোরেট ও গন্ধকের মধ্যে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে ও বিস্ফোরণ হয়। আয়োডিন ও ফসফরাস যতক্ষণ আলাদা থাকে কোন বিক্রিয়া হয় না, কিন্তু এদের স্পর্শ করালেই ফসফরাস জ্বলে ওঠে।

তাপগ্রাহী ও তাপমোচী রাসায়নিক বিক্রিয়া

দুটি বস্তুর রাসায়নিক বিক্রিয়ায় নতুন যৌগিক বস্তু গঠনের সময় যদি তাপ শোষিত হয় তবে সেই রাসায়নিক বিক্রিয়াকে **তাপগ্রাহী বিক্রিয়া** বলে। এইভাবে তৈরি যৌগিক বস্তুকে তাপগ্রাহী যৌগ বলে। নাইট্রোজেন ও অক্সিজেনের বিক্রিয়ার সময় তাপ শোষিত হয় এবং নাইট্রিক অক্সাইড তৈরি হয়। এই বিক্রিয়া তাপগ্রাহী এবং নাইট্রিক অক্সাইড তাপগ্রাহী বস্তু। কার্বন ডাইসালফাইড, ক্লোরিন মোনোক্সাইডও তাপগ্রাহী।

অনেক রাসায়নিক বিক্রিয়ায় তাপ উৎপন্ন হয়। এই বিক্রিয়াকে **তাপমোচী বিক্রিয়া** বলে। উদ্ভূত বস্তুকে তাপমোচী বস্তু বলে। হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের

বিক্রিয়ায় যখন জল উৎপন্ন হয় তখন তাপ উৎপন্ন হয়। কার্বন ডাইঅক্সাইড তাপমোচী বস্তু। কয়লা যখন পোড়ান হয় তখন কার্বনের সঙ্গে অক্সিজেনের বিক্রিয়ায় তাপ উৎপন্ন হয়। পাথুরে চুন জলে দিলে এত তাপ উৎপন্ন হয় যে জল ফুটতে থাকে। বাড়িতে চুনকাম হওয়ার সময় লক্ষ্য রেখ।

অনুঘটক ও তার কাজ

এতক্ষণ রাসায়নিক পরিবর্তনের কথা পড়লে। দুটি বস্তুর বিক্রিয়ার পর তাদের মিলনে নতুন বস্তু তৈরি হয়। কিন্তু কয়েকটি বস্তু আছে যারা রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করে না, কিন্তু তাদের উপস্থিতিতে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে। এদের **অনুঘটক** বলে। প্ল্যাটিনমের পাতের উপস্থিতিতে অ্যামোনিয়া গ্যাস থেকে নাইট্রিক অক্সাইড তৈরি হয়। এখানে প্ল্যাটিনম অনুঘটক।

ভৌত ও রাসায়নিক পরিবর্তনের তুলনা

ভৌত পরিবর্তন	রাসায়নিক পরিবর্তন
(1) ভৌত পরিবর্তনের ফলে পদার্থের মূল গঠনে কোন পরিবর্তন হয় না। পদার্থের অবস্থার রূপান্তর অর্থাৎ তার ভৌত ধর্মের পরিবর্তন ঘটে মাত্র, কোন নতুন পদার্থ গঠিত হয় না।	(1) রাসায়নিক পরিবর্তনের ফলে পদার্থের মূল গঠনে পরিবর্তন হয়। মূল পদার্থ পরিবর্তিত হয়ে নতুন পদার্থ গঠিত হয় এবং তার ধর্মেরও পরিবর্তন হয়।
(2) ভৌত পরিবর্তন অস্থায়ী এবং পরিবর্তিত পদার্থকে সহজেই আবার আগের পদার্থে ফিরিয়ে আনা যায়।	(2) রাসায়নিক পরিবর্তন স্থায়ী এবং পরিবর্তিত পদার্থকে আবার রাসায়নিক পরিবর্তন ছাড়া আগের পদার্থে ফিরিয়ে আনা যায় না।
(3) ভৌত পরিবর্তনে পদার্থের ওজনের কোন পরিবর্তন অর্থাৎ হ্রাস বা বৃদ্ধি হয় না।	(3) রাসায়নিক পরিবর্তনের ফলে গঠিত নতুন পদার্থের ওজনের অবশ্যই পরিবর্তন অর্থাৎ হ্রাস বা বৃদ্ধি হয়।
(4) ভৌত পরিবর্তনের সময় সাধারণত তাপের উদ্ভব বা অভাব হয় না। (অবশ্য ব্যতিক্রম আছে।)	(4) রাসায়নিক পরিবর্তনে পদার্থের মধ্যে তাপের উদ্ভব হয় অথবা শোষণ ঘটে।

১০ মৌল ও যৌগ

পদার্থের মৌলিক উপাদান কি কি ? আমরা চারপাশে যে সব জিনিস দেখতে পাই যেমন ইট, কাঠ, পাথর, লোহা, কাপড়-জামা, জীবজন্তু, মানবদেহ—এসব কি কি মূল উপাদানের সাহায্যে গড়ে উঠেছে ? একটি একটি ইট বসিয়ে যেমন বাড়ি তৈরি হয়—তেমনি অন্য সব বস্তু কি কয়েকটি মূল বস্তুর সমন্বয়ে তৈরি—যেগুলি বরাবরই ছিল, আছে এবং থাকবে—যেগুলি অন্য কিছু দিয়ে তৈরি নয় ? আড়াই হাজার বছর আগে থেকে প্রাচীন ভারতীয় ও গ্রীক পণ্ডিতেরা অনেক মাথা ঘামিয়েছেন এ বিষয়ে। এক সময়ে প্রাচীন ভারতীয়রা মনে করতেন—ক্ষিতি (মাটি), অপ্ (জল), তেজ (আগুন), মরুৎ (হাওয়া), ব্যোম (আকাশ)—এই পঞ্চভূত দিয়ে সকল বস্তু সৃষ্টি হয়েছে। এসব বিজ্ঞানের ইতিহাস পড়লে জানতে পারবে।

যে সব মূল উপাদান দিয়ে অন্য সব বস্তু তৈরি, যাকে বিশ্লেষণ করে নতুন কোন উপাদান পাওয়া যায় না, তাদের **মৌলিক পদার্থ** বা **মৌল** বলা হয়। পৃথিবীতে প্রাকৃতিক অবস্থায় 92টি মৌল আছে। এদের প্রত্যেকের রাসায়নিক নামকরণ করা হয়েছে। হাইড্রোজেন, হিলিয়ম, লিথিয়ম, বেরিলিয়ম, বোরন, কার্বন, নাইট্রোজেন, অক্সিজেন, লোহা, তামা, সোনা, প্ল্যাটিনম, ইউরেনিয়ম এসব মৌলদের নাম। তালিকায় প্রথম সব থেকে হালকা হাইড্রোজেন গ্যাস, আবার সব থেকে ভারী বিরানব্বইতম মৌল ইউরেনিয়ম। আগেই বলা হয়েছে যে, পৃথিবীতে প্রাকৃতিক অবস্থায় পাওয়া যায় 92টি মৌল। বিজ্ঞানীরা অবশ্য গবেষণাগারে ইউরেনিয়মের পরেও অনেক মৌল তৈরি করেছেন এবং আরও করার চেষ্টা করে চলেছেন। এগুলি সবই অস্থায়ী এবং প্রাকৃতিক পরিবেশে পাওয়া যায় না। মোট 103টি মৌলের নাম সর্বজনস্বীকৃত। 104 ও 105 নম্বর মৌলও সম্প্রতি আবিষ্কার হয়েছে। এদের নাম দেওয়া হয়েছে রাদারফোর্ডিয়ম আর হানিয়ম। মৌলদের নামের তালিকা পরের অধ্যায়ের শেষে দেওয়া আছে।

মৌলগুলি সাধারণ তাপমাত্রায় কঠিন, তরল ও গ্যাস তিন অবস্থাতেই পাওয়া যায়। সোনা, রুপো, লোহা, তামা, দস্তা, সীসা, টিন, কার্বন, গন্ধক, ক্যালসিয়ম, আয়োডিন, নিকেল, ম্যাঙ্গানিজ, সিলিকন, ফসফরাস, পট্যাসিয়ম, সোডিয়ম, অ্যালুমিনিয়ম, ম্যাগনেসিয়ম, প্ল্যাটিনম, রেডিয়ম, ইউরেনিয়ম প্রভৃতি

এরা সবই কঠিন। পারদ, ব্রোমিন প্রভৃতি তরল। অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, হাইড্রোজেন, হিলিয়ম, ক্লোরিন, নিয়ন, জিনন প্রভৃতি মৌল গ্যাস।

এক বা একাধিক মৌল মিলে যে পদার্থ তৈরি হয় তাকে **যৌগিক পদার্থ** বা **যৌগ** বলে। যৌগকে বিশ্লেষণ করলে তার উপাদান মৌলগুলি সবসময়ই পাওয়া যাবে। যৌগ জৈব এবং অজৈব দুইই হতে পারে। সাধারণত অধিকাংশ পদার্থ যৌগ অবস্থায় থাকে। প্রাকৃতিক অবস্থায় প্রায় কুড়িটি মৌল পাওয়া যায়। পৃথিবীতে যত রকমের বিভিন্ন যৌগ আছে—তার মধ্যে নিরানব্বই শতাংশ কম-বেশি কুড়িটি মৌল দিয়ে তৈরি। সমস্ত মৌলদের মধ্যে প্রায় 50 শতাংশ শুধু অক্সিজেন।

জল, লবণ, চিনি, লোহার মরচে, তুঁতে এগুলি সবই যৌগের উদাহরণ। হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন মৌল দিয়ে জল তৈরি। সোডিয়ম ও ক্লোরিন দিয়ে তৈরি খাদ্য লবণ। কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন দিয়ে চিনি, লোহা ও অক্সিজেন দিয়ে মরচে এবং তামা, গন্ধক ও অক্সিজেন দিয়ে তুঁতে তৈরি। তোমরা নিজেরা চেষ্টা করলে অজস্র উদাহরণ বার করতে পারবে।

যৌগ ও মিশ্রণ এক নয় : দুই বা তার বেশি মৌল যে কোন অনুপাতে মেশালে সেটা হবে মিশ্রণ, সেটা যৌগ নাও হতে পারে। যে সব মৌল দিয়ে যৌগ তৈরি, তাদের নিজেদের গুণ যৌগে থাকে না, যৌগের নিজস্ব গুণ থাকে। যেমন, হাইড্রোজেন বা অক্সিজেন দুই গ্যাস, কিন্তু মিলে তৈরি হয় জল, যা সাধারণ তাপমাত্রায় তরল। জলের নিজস্ব অনেক ধর্ম আছে—যার সঙ্গে হাইড্রোজেন বা অক্সিজেনের ধর্মের কোন সম্পর্ক নেই।

তাছাড়া জলে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের অনুপাত সবসময় নির্দিষ্ট থাকে। রাসায়নিক বিক্রিয়া না ঘটিয়ে জলের উপাদান মৌলদের আলাদা করা যায় না। আবার বাতাস নাইট্রোজেন, অক্সিজেন, জলীয় বাষ্প ও আরও নানা গ্যাসের মিশ্রণ। এই মিশ্রণে নাইট্রোজেন বা অক্সিজেনের নিজ নিজ ধর্মগুলি বর্তমান। এই মিশ্রণে নাইট্রোজেন বা অক্সিজেনের অনুপাত নির্দিষ্ট নয়, পরিবর্তিত হতে পারে। রাসায়নিক বিক্রিয়া না করেও বাতাস থেকে নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন আলাদা করা সম্ভব তোমরা পরে পড়বে।

আরও একটি সহজ উদাহরণ নিজেরা পরীক্ষা করে দেখতে পার। লোহার গুঁড়ো আর গন্ধকের গুঁড়ো খুব ভাল করে মেশাও। এটা হবে মিশ্রণ। এর থেকে

চুম্বকের সাহায্যে সমস্ত লোহা আলাদা করে নিতে পারবে। কিন্তু মিশ্রণটি বুনসেন দীপের তাপে গলিয়ে যখন একটি নতুন যৌগ তৈরি হয়—তার রঙ কালো। গলা পিণ্ডটি গুঁড়িয়ে দেখ এর সঙ্গে লোহা ও গন্ধকের কোন গুণের মিল নেই। চুম্বক দিয়ে পরীক্ষা কর, দেখবে চুম্বকে কিছুই ধরছে না। সোরা (পট্যাসিয়ম নাইট্রেট), গন্ধক ও কয়লা মিশিয়ে বারুদ তৈরি। বারুদ অবস্থায় এটি মিশ্রণ। বিভিন্ন তরলে গলিয়ে এবং ছেঁকে উপাদানগুলি আলাদা করা যায়। কিন্তু আগুন দিলে দপ করে বারুদ জলে উঠবে, তাপ ও গ্যাস সৃষ্টি হবে, কিছুই পড়ে থাকবে না—তখন যৌগে পরিণত হয়েছে। মিশ্রণের একটি বিশেষ রূপ দ্রবণ—লবণ বা চিনি জলে দিলে একদম গুলে গিয়ে লবণের বা চিনির দ্রবণ হয়। মনে রেখ দ্রবণও এক ধরনের মিশ্রণ, যৌগ নয়।

ধাতু ও অধাতু

মৌলগুলি কয়েকটি সাধারণ ধর্ম অনুযায়ী দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়—**ধাতু** বা মেটাল এবং **অধাতু** বা ননমেটাল। পৃথিবীতে যে **92**টি মৌল পাওয়া যায় তার অধিকাংশই ধাতু। সব থেকে বেশি ব্যবহার হয় লোহা, তামা, দস্তা, সীসা, টিন, অ্যালুমিনিয়ম, ম্যাগনেসিয়ম, সোনা, রুপো, নিকেল, পারদ—এদের অনেকগুলিই তোমরা দেখে থাকবে। আবার অধাতুর মধ্যে কার্বন, গন্ধক আয়োডিন প্রভৃতি মৌলগুলি কঠিন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, হিলিয়ম, নিয়ন, জিনন ইত্যাদি গ্যাস এবং ব্রোমিন তরল—এদের নামও তোমরা শুনে থাকবে। ধাতু ও অধাতুর সাধারণ ধর্ম অনুযায়ী পার্থক্য নিচে দেওয়া হল :

ধাতু ও অধাতুর পার্থক্য

ধাতু	অধাতু
(1) সাধারণ তাপমাত্রায় পারদ ছাড়া সব ধাতুই কঠিন অবস্থায় থাকে। পারদ তরল।	(1) অধাতু কঠিন, তরল এবং গ্যাস তিন অবস্থাতেই পাওয়া যায়।
(2) ধাতু নির্মিত তল পালিশ করা হলে চকচকে দেখায় এবং আলো প্রতিফলন করে। তরল হলেও পারদ তলও চকচকে।	(2) অধাতু কোন অবস্থাতেই চকচকে নয় এবং আলো প্রতিফলন করে না।

ধাতু	অধাতু
(3) ধাতু ভারী, শক্ত, নমনীয় ও প্রসারণক্ষম। ধাতু পিটিয়ে পাত করা যায়। ব্যতিক্রম : পটাসিয়ম ও সোডিয়ম জলের থেকে হালকা, অ্যান্টিমনি ও বিস্মাথ ভঙ্গুর।	(3) অধাতুর মধ্যে কঠিন মৌল-গুলি হালকা ও ভঙ্গুর, নমনীয় বা প্রসারণক্ষম নয় ; এগুলি পিটিয়ে পাত তৈরি করা যায় না। ব্যতিক্রম : হীরা যদিও অধাতু তবু বস্তুদের মধ্যে সব থেকে শক্ত।
(4) ধাতু তাপ ও বিদ্যুৎ পরিবাহী।	(4) অধাতু তাপ ও বিদ্যুৎ পরিবহণের উপযোগী নয়।
(5) লঘু খনিজ অ্যাসিডে ধাতুর সঙ্গে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে।	(5) লঘু খনিজ অ্যাসিডের সঙ্গে অধাতুর কোন বিক্রিয়া ঘটে না।
(6) ধাতু সাধারণত বিজারক বস্তু।	(6) হাইড্রোজেন ছাড়া সকল অধাতু জারক বস্তু।
(7) ধাতু ইলেকট্রোপজিটিভ।	(7) অধাতু ইলেক্‌ট্রোনেগেটিভ। ব্যতিক্রম—হাইড্রোজেন ইলেক্‌ট্রো-পজিটিভ।

উপরে লিখিত ধাতু ও অধাতুর গুণগুলি সাধারণভাবে খাটে ; তবে ব্যতিক্রম আছে একথা মনে রাখতে হবে। অ্যাসিডে বিক্রিয়া, জারক, বিজারক বস্তু এবং ইলেকট্রো-পজিটিভ ও ইলেকট্রো-নেগেটিভ কাকে বলে তোমরা এই বইতেই কিছু পরে পড়বে। তালিকাটি মোটামুটি সম্পূর্ণ করার জন্য এখনই বলে রাখা হল। তালিকায় বলা হয়েছে যে ধাতু বিদ্যুৎপরিবাহী এবং অধাতু বিদ্যুৎ অপরিবাহী। কিন্তুএর মাঝামাঝি কিছু মৌল আছে যেগুলি স্বল্প-পরিবাহী যেমন জারমেনিয়ম ও সিলিকন। জেনে রাখ যে এই স্বল্প-পরিবাহী বস্তু দিয়েই ট্রান-জিস্টর তৈরি হয়।

সংকর ধাতু

অনেক সময় একাধিক ধাতু মিলিয়ে মিশ্র বা সংকর ধাতু তৈরি করা হয়। অনেক কাজে বিশুদ্ধ ধাতুর চেয়ে সংকর ধাতু কাজের উপযোগী। ইস্পাত তৈরি হয় লোহাতে নির্দিষ্ট পরিমাণ কার্বন মিশিয়ে। পিতল তৈরি হয় প্রধানত তামায় 30 শতাংশ দস্তা মিশিয়ে। কাঁসায় থাকে তামা ও 20 শতাংশ টিন। ইস্পাত,

পিতল, কাঁসা, এগুলি সংকর ধাতু। নরম ধাতুতে সামান্য পরিমাণ অন্য ধাতু মেশালে সেটি বেশ শক্ত হয়। অল্প পরিমাণ অন্য ধাতু মেশানোকে 'পান' দেওয়া বলে। সোনা খুবই নরম। গয়না তৈরির জন্য সোনাকে শক্ত করা হয় তার সঙ্গে তামার পান দিয়ে। স্টেনলেস স্টীল, যাতে মরচে পড়ে না, তাতে লোহার সঙ্গে প্রায় 12—15 শতাংশ ক্রোমিয়ম এবং 0·1—0·7 শতাংশ কার্বন মেশান থাকে।

অণু ও পরমাণু

কোন এক টুকরো মৌল নিয়ে তাকে অর্ধেক করা হোল। অর্ধেক অংশটি আবার অর্ধেক করা হোল। সেই অর্ধেককে আবার অর্ধেক। কত দূর পর্যন্ত অর্ধেক করা সম্ভব? মৌলের সব থেকে ছোট অবস্থা—যখন পর্যন্ত মৌলটির ভৌত ও রাসায়নিক গুণ দিয়ে তাকে সনাক্ত করা যাবে—তাকে বলা হয় মৌলটির **পরমাণু**। পরমাণু কথাটি ইংরেজীতে **অ্যাটম**—এসেছে গ্রীক শব্দ অ্যাটমস থেকে। গ্রীক ভাষায় কথাটির মানে যাকে ভাঙা যায় না। অবশ্য এখন পরমাণুকেও ভাঙা হয়েছে, যদিও ভাঙবার পর সেটি আর ঐ বিশেষ মৌলের পরমাণু থাকবে না।

এক বা একাধিক মৌলের পরমাণু দিয়ে তৈরি হয়—যৌগের **অণু** বা **মলিকিউল**। অণু যে কোন যৌগের ক্ষুদ্রতম অবস্থা। জল একটি যৌগ। জলের অণুতে থাকে দুটি হাইড্রোজেন এবং একটি অক্সিজেন পরমাণু। খাদ্য লবণ সোডিয়ম ক্লোরাইডের অণুতে থাকে একটি সোডিয়ম ও একটি ক্লোরিন পরমাণু। আবার দুটি হাইড্রোজেন পরমাণু দিয়ে হয় হাইড্রোজেন অণু। যে কোন যৌগের অণুতে যৌগটির ভৌত ও রাসায়নিক ধর্ম বিদ্যমান থাকে। কোন ভৌত বা রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় অণুটিকে ভেঙে ফেললে সেটি তার উপাদান মৌলগুলির পরমাণু হয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে, তখন আর যৌগের গুণ থাকবে না। একটি দুটি বা একশো দুশো নয়, কয়েক হাজার পরমাণু দিয়ে অতিকায় অণুও সম্ভব —পরে জানবে। রক্তে যে হিমোগ্লোবিন থাকে তার অণুতেই কয়েক হাজার পরমাণু থাকে।

মৌলের পরমাণুও বস্তু গঠনের মৌলিক উপাদান নয়। সকল মৌলই তৈরি হয় তিনটি মৌলিক কণা—প্রোটন, নিউট্রন ও ইলেকট্রন—দিয়ে। এ বিষয়ে তোমরা সামনের বছর ভালো করে পড়বে।

১১ দ্রবণ, দ্রাব, দ্রাবক

দ্রবণ

একাধিক বস্তুর সমসত্ব মিশ্রণকে **দ্রবণ** বা সলিউশন বলে। দ্রবণ কথাটি সাধারণত জল বা অন্য তরলে নানা বস্তুর মিশ্রণের জন্য ব্যবহৃত হয়। ধর, এক চামচ খাদ্য লবণ আধ বীকার জলে দেওয়া হল। লবণ গুলে জলের মধ্যে মিলিয়ে যাবে। এখন জলে লবণের দ্রবণ তৈরি হল। লবণকে আর চোখে দেখা যাবে না। অথবা অনেকক্ষণ রেখে দিলেও লবণ তলায় থিতিয়ে পড়বে না। এইভাবে মিলিয়ে যাওয়াকে দ্রবীভূত হওয়া বলে। দ্রবণ জলে দ্রবীভূত হয়। এই দ্রবণের যে কোন অংশ সমান নোনতা। এই দ্রবণটি অনেক ভাগে সমান সমান ভাগ করে যদি জল শুকিয়ে ফেলা হয় তবে প্রত্যেক ভাগে সমান পরিমাণ লবণ পাওয়া যাবে। সমানভাবে মিশে যাওয়াই সমসত্ব মিশ্রণ।

দ্রবণের উপাদান নির্দিষ্ট নয়। লবণের দ্রবণের উপাদান কত পরিমাণ লবণ দেওয়া হল তার উপর নির্ভর করে। দ্রবণ কোন সংকেতের সাহায্যে প্রকাশ করা যায় না।

দ্রবণ কত রকম হতে পারে—(1) তরলে কঠিনের দ্রবণ, যেমন জলে লবণ বা জলে চিনি ; (2) তরলে তরলের দ্রবণ, যেমন জলের মধ্যে গ্লিসারিন, অ্যালকোহল, সালফিউরিক অ্যাসিড ; (3) তরলে গ্যাসের দ্রবণ, যেমন জলের মধ্যে অ্যামোনিয়া, কার্বন ডাইঅক্সাইড, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন গ্যাস ইত্যাদি ; (4) গ্যাসে গ্যাসের দ্রবণ,—যাদের মধ্যে বিক্রিয়া ঘটে না এমন যে কোন দুই বা তার বেশি গ্যাস যে কোন অনুপাতে মিশে যেতে পারে এবং মিশ্রিত অবস্থা সুস্থিত হলে তাকে গ্যাসের দ্রবণ বলে ; (5) কঠিনে কঠিনের দ্রবণ, যেমন কাঁসা (তামা ও টিন), পিতল (তামা ও দস্তা) ইত্যাদি ; (6) কঠিনে গ্যাসের দ্রবণ, যেমন প্যালেডিয়ম ধাতুতে হাইড্রোজেন গ্যাস।

দ্রাব ও দ্রাবক

দ্রবণের দুটি অংশ দ্রাব ও দ্রাবক। যে দুটি বস্তু দিয়ে দ্রবণ তৈরি তাদের মধ্যে যেটি পরিমাণে বেশি তাকে **দ্রাবক** বা সলভেণ্ট বলে, যেটির পরিমাণ কম

তাকে বলা হয় **দ্রাব** বা সলিউট। চিনি জলে দিয়ে যে দ্রবণ তাতে জল দ্রাবক এবং চিনি দ্রাব। কাঁসায় তামা দ্রাবক ও টিন দ্রাব। মনে রাখতে হবে দ্রবণে দ্রাবকের পরিমাণ দ্রাবর তুলনায় বেশি।

জল পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ দ্রাবক। সমুদ্রের জলে যত রকমের বস্তু দ্রবীভূত আছে তার রাসায়নিক বিশ্লেষণ করে প্রায় পঁয়ষট্টিটি মৌল পাওয়া গেছে।

সম্পৃক্ত ও অসম্পৃক্ত দ্রবণ

যে দ্রবণে আরও দ্রাব যোগ করলে সেটি দ্রবীভূত হয়, তাকে **অসম্পৃক্ত দ্রবণ** বা আনস্যাচুরেটেড সলিউশন বলে। আধ বীকার জলে এক চামচ খাদ্য লবণ দিলে সেটি দ্রবীভূত হয়। এটি অসম্পৃক্ত দ্রবণ কারণ আর এক চামচ লবণ দিলেও তা দ্রবীভূত হবে। ঐ দ্রবণে আরও কয়েক চামচ লবণ দিলে তাও দ্রবীভূত হবে। তখনও দ্রবণটি অসম্পৃক্ত দ্রবণ থাকবে। দ্রবণটিতে ক্রমাগত লবণ যোগ করতে থাকলে দেখবে এক সময় লবণ আর দ্রবীভূত না হয়ে দ্রবণের নিচে জমা হতে থাকবে। নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় যে কোন দ্রাবকের দ্রাব গ্রহণ করবার একটি সীমা থাকে যার বেশি দ্রাব যোগ করলে সেটি দ্রবীভূত হয় না। যে দ্রবণে আরও দ্রাব যোগ করলে সেটি দ্রবীভূত হয় না তাকে **সম্পৃক্ত দ্রবণ** বা স্যাচুরেটেড সলিউশন বলে।

যে দ্রবণে অল্প পরিমাণ দ্রাব আছে তাকে **লঘু দ্রবণ** বা ডাইলিউট সলিউশন বলা হয়। যে দ্রবণে দ্রাবর পরিমাণ খুব বেশি, প্রায় সম্পৃক্ত করার কাছাকাছি তাকে **গাঢ় দ্রবণ** বা কনসেনট্রেটেড সলিউশন বলে।

দ্রবণীয়তা

একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় যত গ্রাম দ্রাব কোন দ্রাবকের একশো গ্রাম ভরের সঙ্গে মিশে সম্পৃক্ত দ্রবণ তৈরি করে সেই সংখ্যাকে ঐ দ্রাবের **দ্রবণীয়তা** বা সলিউবিলিটি বলে। যদি বলা হয় 30°C তাপমাত্রায় খাদ্য লবণের দ্রবণীয়তা 36·3 তবে বুঝতে হবে 30°C তাপমাত্রায় 100 g জলে 36·3 g খাদ্য লবণ দ্রবীভূত হয়ে সম্পৃক্ত দ্রবণ তৈরি করবে। সুতরাং খাদ্য লবণের ($NaCl$) দ্রবণীয়তা 30°C তাপমাত্রায় 36·3। ঐ একই তাপমাত্রায় তুঁতের ($CuSO_4$) জলে দ্রবণীয়তা 25।

দ্রবণীয়তা একটি রাসায়নিক ধর্ম এবং বস্তুর সনাক্তকরণে কাজে লাগে।

দ্রবণীয়তার উপর তাপের প্রভাব : একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় সম্পৃক্ত দ্রবণকে আরও গরম করলে দেখা যায় যে দ্রবণটি অসম্পৃক্ত হয়ে পড়ে অর্থাৎ তখন আরও দ্রাব গ্রহণ করতে পারে। গরম অবস্থায় জলে লবণ দিয়ে দ্রবণটি আরও গাঢ় করা সম্ভব। কিন্তু দ্রবণটি ঠাণ্ডা হতে দিলে দেখা যাবে যে দ্রবণের নিচে দ্রাব জমা হতে শুরু করেছে। তার অর্থ দ্রবণটি আবার সম্পৃক্ত হয়ে পড়েছে। সুতরাং দ্রাবের দ্রবণীয়তা তাপমাত্রার উপর নির্ভরশীল। উদাহরণস্বরূপ খাদ্য
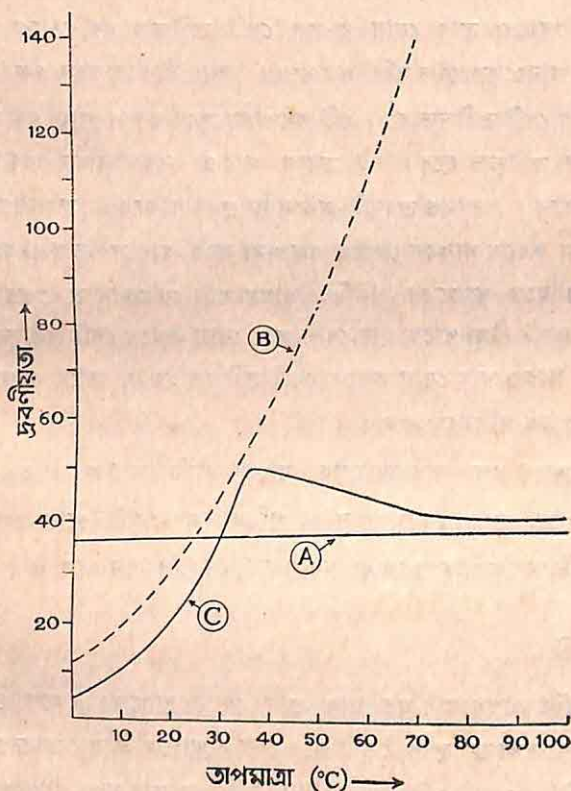
A=NaCl B=KNO_3 C=Na_2SO_4

চিত্র 11·1

লবণের দ্রবণীয়তা 10°C-এ 35·7, 30°C-এ 36·3, 50°C-এ 37, 70°C-এ 37·8। আবার তুতের দ্রবণীয়তা 10°C-এ 14·3, 30°C-এ 25, 50°C-এ

33·3, 80°C-এ 55। দ্রবণীয়তার উপর তাপমাত্রার প্রভাব লেখের সাহায্যে প্রকাশ করা হয়। লেখের X-অক্ষ বরাবর তাপমাত্রা এবং Y-অক্ষ বরাবর দ্রবণীয়তা আঁকা হয়। **11.1** চিত্রে দ্রবণীয়তা-লেখ বা দ্রবণীয়তা-রেখা দেখ। ইংরেজীতে একে সলিউবিলিটি কার্ভ বলে। তিনটি ভিন্ন দ্রাবের জলে দ্রবণীয়তা তাপমাত্রা বৃদ্ধির সঙ্গে কি ভাবে পরিবর্তিত হয় দেখান হয়েছে। খাদ্য লবণের (NaCl) দ্রবণীয়তা 0°C থেকে 100°C তাপমাত্রা পর্যন্ত বিশেষ কিছু বাড়ে না। পট্যাসিয়ম নাইট্রেটের (KNO_3) দ্রবণীয়তা তাপমাত্রা বাড়ার সঙ্গে খুব বেশি বাড়ে। আবার সোডিয়ম সালফেটের (Na_2SO_4) দ্রবণীয়তা 0°C থেকে 35°C তাপমাত্রা পর্যন্ত বাড়ে বটে কিন্তু তাপমাত্রা 35°C থেকে বেশি বাড়ালে দ্রবণীয়তা কমতে থাকে। তরলে গ্যাসের দ্রবণের ক্ষেত্রে কিন্তু ফল বিপরীত হয়। তাপমাত্রা বাড়ানোর সঙ্গে গ্যাসের দ্রবণীয়তা কমে যায়। জল গরম করলে দ্রবীভূত গ্যাস জল থেকে বেরিয়ে যায়। চাপের প্রভাবে গ্যাসের দ্রবণীয়তা বাড়ে। সোডা-ওয়াটার তৈরির সময় চাপ বাড়িয়ে বেশি পরিমাণ কার্বন ডাইঅক্সাইড দ্রবীভুত করে বোতলে ভর্তি করা হয়। বোতলের ছিপি খুললেই চাপ কমে যাওয়ায় কিছু গ্যাস বেরিয়ে যায়।

১২ প্রতীক চিহ্ন, সংকেত ও সমীকরণ

প্রতীক-চিহ্ন

তোমরা দেখেছ মৌলগুলির বা যৌগগুলির নাম বার বার উল্লেখ করার বা লেখার পক্ষে বেশ বড়। বহুকাল ধরেই লোকে এই অসুবিধা ভোগ করে অনেকে অনেক রকম **সংকেত** ব্যবহার করে থাকতেন। আধুনিক বিজ্ঞানের পত্তনের প্রথম যুগে জন ড্যালটন প্রত্যেকটি মৌলের জন্য একরকম প্রতীক চিহ্ন ব্যবহার আরম্ভ করেন। কার্বনের জন্য কালো বৃত্ত, রুপোর জন্য অর্ধচন্দ্র প্রভৃতি। কিন্তু এতে বিশেষ সুবিধে হয় নি। এখন যে প্রতীক-চিহ্ন ব্যবহার হয় তা সমস্ত আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক সভায় স্বীকৃত। মৌলের রাসায়নিক প্রতীক-চিহ্ন হিসাবে সাধারণত মৌলটির ইংরেজী বা ল্যাটিন নামের আদ্য অক্ষর রোমান হরফে লেখা হয়। একাধিক মৌলের আদ্য অক্ষর এক হলে দুটি অক্ষরও নেওয়া হয়। যেমন হাইড্রোজেন (**Hydrogen**) **H,** হিলিয়ম (**Helium**) **He,** লিথিয়ম (**Lithium**) **Li,** বেরিলিয়ম (**Beryllium**) **Be,** বোরন (**Boron**) **B,** কার্বন (**Carbon**) **C,** নাইট্রোজেন (**Nitrogen**) **N,** অক্সিজেন (**Oxygen**) **O,** ফ্লোরিন (**Fluorine**) **F,** সোডিয়ম (**Sodium**—ল্যাটিনে **Natrum**) **Na,** পট্যাসিয়ম (**Potassium** ল্যাটিনে **Kalium**) **K,** তামা (**Copper** বা **Cuprum**) **Cu,** টিন (**Tin** বা **Stannum**) **Sn,** লেড (**Lead** বা **Plumbum**) **Pb,** পারদ (**Mercury** বা **Hydragyrum**) **Hg,** লোহা (**Iron** বা **Ferrum**) **Fe,** জিঙ্ক (**Zinc**) **Zn** প্রভৃতি। এই অধ্যায়ের শেষে মৌলদের তালিকা ও প্রতীক-চিহ্ন দেওয়া আছে।

প্রতীক-চিহ্নের সাহায্যে কোন মৌল ও কতগুলি পরমাণু বোঝান সম্ভব। একটি হাইড্রোজেন পরমাণু—**H,** দুটি অক্সিজেন পরমাণু **2O,** তিনটি ইউরেনিয়ম পরমাণু **3U**। মনে রেখ রাসায়নিক প্রতীক রোমান হরফে (খাড়া) লেখা হয়। প্রতীক-চিহ্নের পর কোন স্টপ চিহ্ন (.) থাকবে না।

সংকেত

তোমরা আগেই জেনেছ হাইড্রোজেন অণুতে দুটি পরমাণু থাকে। প্রতীক চিহ্ন **2H** বললে দুটি **H** পরমাণু বোঝাবে। হাইড্রোজেন অণু বোঝাতে ব্যবহার

করতে হবে সংকেত বা ফরমূলা। হাইড্রোজেন অণুর সংকেত H_2। লক্ষ্য করবে H2 নয়। H এর ডানদিকে একটু নিচে ছোট হরফে 2 লিখতে হবে। একই নিয়মে O_2, N_2 যথাক্রমে অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন মৌলের অণুর সংকেত। তামা, লোহা, নিকেল প্রভৃতি ধাতুর অণুতে একটিই পরমাণু থাকে, তাই সংকেতগুলি যথাক্রমে Cu, Fe, Ni। আবার একাধিক অণু বোঝাতে সংখ্যাবাচক রাশিটি সংকেতের বাঁ দিকে বসবে। যেমন 3Cu, $4H_2$। যৌগগুলির অণু বোঝাতে সংকেত বিশেষ কাজে লাগে। যেমন জল H_2O, কার্বন ডাই অক্সাইড CO_2, সালফার ডাইঅক্সাইড SO_2, হাইড্রোজেন সালফাইড H_2S, হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড HCl, সালফিউরিক অ্যাসিড H_2SO_4, নাইট্রিক অ্যাসিড HNO_3, তুঁতে বা কপার সালফেট $CuSO_4$, খাদ্য-লবণ NaCl, কষ্টিক সোডা NaOH, ক্যালসিয়ম কার্বনেট (মার্বেল পাথর) $CaCO_3$ প্রভৃতি।

যৌগের সংকেতের সাহায্যে জানা যায় কি কি মৌল দিয়ে যৌগটি গঠিত এবং মৌলগুলি কি অনুপাতে কেমনভাবে আছে। এ ছাড়া জানা যায় আণবিক ভার যার কথা তোমরা পরের বছর পড়বে।

যোজ্যতা

যৌগপরমাণুর সংকেত লিখতে হলে মৌলগুলির পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হবার ক্ষমতা জানলে সুবিধা হয়। যে কোন মৌল যে কয়টি হাইড্রোজেন বা সেই রকম অন্য মৌলের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে সেই সংখ্যাকে মৌলটির **যোজ্যতা** বা **ভ্যালেন্সি** বলে। হাইড্রোজেনের যোজ্যতা এক ধরা হয়। উদাহরণস্বরূপ একটি Cl পরমাণু একটি H পরমাণুর সঙ্গে যুক্ত হয়, সুতরাং Cl এর যোজ্যতা এক। একটি O পরমাণুর সঙ্গে দুটি H পরমাণু যুক্ত হয়, তাই O এর যোজ্যতা দুই। যোজ্যতা পরমাণুর একটি রাসায়নিক ধর্ম।

যোজ্যতা এক থেকে সাত হতে পারে। কোন কোন পরমাণুর যোজ্যতা একের বেশি হয়, যেমন নাইট্রোজেন দিয়ে N_2O, NO, N_2O_3, N_2O_4, N_2O_5 যৌগগুলি হয়। মনে রাখার সুবিধার জন্য যোজ্যতার একটি তালিকা দেওয়া হল।

যোজ্যতা	মৌলের নাম
1	H, F, Cl, Br, I, Na, K, Ag, N
2	N, O, Mg, Fe, Ca, Zn, S, Pb...

যোজ্যতা	মৌলের নাম
3	N, Al, Fe, Cr, Au, P, B··
4	N, C, Si, Sn, Pb······
5	N, P, As, Sb······
6	S, Br
7	Mn
8	Os

যে সব মৌল নিষ্ক্রিয় তাদের যোজ্যতা শূন্য ধরা হয়—যেমন, হিলিয়ম, নিয়ন, আরগন, ক্রিপটন, জিনন প্রভৃতি—এইগুলি সবই সাধারণ তাপ ও চাপে গ্যাস অবস্থায় থাকে।

মূলক : যৌগের সংকেত ঠিক মত লিখতে ও তাদের নাম জানতে আরও একটি বিষয় জানলে সুবিধে হয়। কয়েকটি মৌলের পরমাণু নিজেদের মধ্যে জোট বেঁধে থাকে। এগুলি ঠিক যৌগ নয়, কিন্তু যৌগ তৈরির সময় অংশ নেয়। যৌগটিকে বিশ্লেষণ করার সময় এরা একসঙ্গেই আলাদা হয়। রাসায়নিক বিক্রিয়াতেও এরা জোট হিসাবে কাজ করে। এদের বলা হয়—**মূলক** বা র‍্যাডিকাল। সব থেকে সাধারণ উদাহরণ : **OH** (হাইড্রক্সাইড), NO_3 (নাইট্রেট), NH_4 (অ্যামোনিয়ম), CO_3 (কার্বনেট), PO_4 (ফসফেট) ইত্যাদি। যৌগ তৈরির সময় **OH** মূলক K-র সঙ্গে যুক্ত হয়ে তৈরি করে **KOH** (পট্যাসিয়ম হাইড্রক্সাইড বা বাজারের কষ্টিক পটাশ) এবং Na-র সঙ্গে যুক্ত হয়ে হয় NaOH (সোডিয়ম হাইড্রক্সাইড বা বাজারের নাম কষ্টিক সোডা)। OH এর যোজ্যতা এক। সিলভার নাইট্রেট $AgNO_3$, অ্যামোনিয়ম নাইট্রেট NH_4NO_3, ক্যালসিয়ম কার্বনেট $CaCO_3$, সোডিয়ম ফসফেট $Na_3 PO_4$। সুতরাং NO_3, NH_4 মূলকগুলির যোজ্যতা দুই এবং PO_4 মূলকের যোজ্যতা তিন।

পরমাণুর গঠন সম্বন্ধে যখন বিস্তারিতভাবে পড়বে তখন জানতে পারবে যে যোজ্যতা, মূলক গঠন ইত্যাদি বিষয়ে ইলেকট্রনের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং যৌগের সংকেত লেখাও তখন তোমাদের কাছে সহজ অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যাবে।

রাসায়নিক সমীকরণ

বীজগণিতে **সমীকরণ** তোমরা পড়েছ এবং অনেক সমীকরণের সমাধানও করেছ। রসায়নে সমীকরণ বলতে কি বোঝায়? তোমরা রাসায়নিক পরিবর্তনের কথা পড়েছ। ধরা যাক দুটি রাসায়নিক বস্তু A এবং B মিলিত হবার পর রাসায়নিক পরিবর্তনে C এবং D বস্তুতে পরিণত হল। তাহলে রাসায়নিক সমীকরণে লেখা যাবে

$$A+B=C+D$$
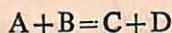
যে প্রক্রিয়াতে পরিবর্তনটি হল তাকে বলে **রাসায়নিক বিক্রিয়া**। এখন নিশ্চয় বুঝতে পারছ যে একমাত্র বিক্রিয়া দিয়েই রাসায়নিক পরিবর্তন সম্ভব। যে সমীকরণ, সংকেতের সাহায্যে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী বস্তুদের ও বিক্রিয়ালব্ধ বস্তুদের বর্ণনা করে, তাকেই **রাসায়নিক সমীকরণ** বলে। H এবং Cl মিলে HCl হয় তাহলে সেই বিক্রিয়ার রাসায়নিক সমীকরণ হবে

$$H_2+Cl_2=2HCl।$$

আরও কয়েকটি রাসায়নিক সমীকরণের উদাহরণ

$2H_2+O_2=2H_2O$

$N_2+3H_2=2NH_3$ (অ্যামোনিয়া)

$4P+5O_2=2P_2O_5$ (ফসফরাস পেন্টক্সাইড

$Zn+H_2SO_4=ZnSO_4+H_2$

$NH_3+H_2O=NH_4OH$ (অ্যামোনিয়ম হাইড্রক্সাইড)
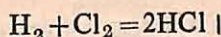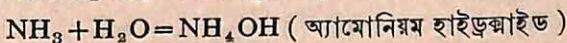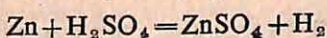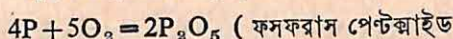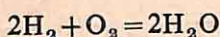
সমীকরণে সমতা রক্ষা—রাসায়নিক সমীকরণ শুদ্ধ করে লিখতে হলে মনে রাখতে হবে—(1) যে বিক্রিয়াটি বর্ণনা করা হচ্ছে, সেটি বাস্তব হতে হবে, (2) বিক্রিয়ায় অণুরা অংশ গ্রহণ করে, সুতরাং মৌলদের ক্ষেত্রে আণবিক সংকেত ব্যবহার করতে হবে, (3) সমান চিহ্নের দুই দিকে মৌলদের পরমাণুর সংখ্যা সমান থাকবে। একটি উদাহরণ নেওয়া যাক। জানা আছে যে খাদ্য-লবণ সোডিয়ম ক্লোরাইড সোডিয়ম ধাতু ও ক্লোরিন গ্যাস দিয়ে গঠিত। অতএব সমীকরণ হবে—

সোডিয়ম+ক্লোরিন=সোডিয়ম ক্লোরাইড

$$Na+Cl_2=NaCl।$$
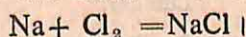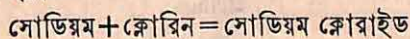
এতে এক নম্বর ও দু নম্বর সর্ত ঠিক আছে, তবু সমীকরণে সমতা নেই,

কারণ সমান চিহ্নের বাঁদিকে ক্লোরিন অণু দুটি এবং ডান দিকে একটি। তাই সমতা রক্ষার জন্য লিখতে হবে

$$2Na + Cl_2 = 2NaCl$$
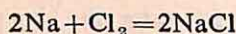
অর্থাৎ প্রতিটি খাদ্য-লবণ অণু তৈরি করতে একটি ক্লোরিন অণু ও দুটি সোডিয়ম অণু প্রয়োজন। এর আগে যে সব সমীকরণের উদাহরণ আছে, সেগুলি মিলিয়ে দেখ একইভাবে সমতা রক্ষা করা হয়েছে। সমীকরণ লেখার সময় যোজ্যতা কত সেটা মনে রাখলে নির্ভুল সমীকরণ লিখতে পারবে। আবার লক্ষ্য করলে দেখবে মূলকগুলি জোট বেঁধেই বিক্রিয়ায় অংশ নেয়। এছাড়াও সমান চিহ্নের দুই দিকের বস্তুর ভর-সাম্যও বজায় রাখতে হবে।

রাসায়নিক সমীকরণে কি কি খবর জানতে পারা যায়—(1) কোন কোন বস্তু পরস্পর বিক্রিয়া করে, (2) কোন কোন বস্তু দ্বারা কোন কোন বস্তু তৈরি হয়, (3) বিক্রিয়ায় অংশ নিচ্ছে যে সব বস্তু তাদের কতগুলি করে অণু দরকার এবং বিক্রিয়ার পর যে সব বস্তু তৈরি হচ্ছে, তাদের কতগুলি করে অণু পাওয়া যায়। পরমাণু ভার ও আণবিক ভার সম্বন্ধে পড়া হলে জানবে (4) সমীকরণের সাহায্যে সমান চিহ্নের দুই দিকের বস্তুদের ভার এবং গ্যাসের ক্ষেত্রে আয়তনও জানা সম্ভব।

সমীকরণে কি কি খবর জানা যায় না—(1) বিক্রিয়াটি তাপগ্রাহী বা তাপমোচী কি না, (2) যে যে বস্তু দিয়ে যা যা তৈরি হচ্ছে তাদের ভৌত অবস্থা—কঠিন, তরল না গ্যাস, (3) চাপ, তাপ ইত্যাদির কোন বিশেষ অবস্থায় বিক্রিয়াটি ঘটে, (4) কি হারে বিক্রিয়াটি ঘটে।

চার নম্বর খবরটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কয়লা পুড়ে তাপ সৃষ্টি হয়। আবার বারুদ পুড়েও তাপ সৃষ্টি হয়। কয়লা পোড়ে আস্তে আস্তে তাই কয়লা জ্বালানি। আবার বারুদ পোড়ে এক নিমেষে তাই বারুদ বিস্ফোরক।

মৌলদের নাম ও প্রতীক চিহ্ন

1	হাইড্রোজেন	Hydrogen	H
2	হিলিয়ম	Helium	He
3	লিথিয়ম	Lithium	Li
4	বেরিলিয়ম	Beryllium	Be
5	বোরন	Boron	B

6	কার্বন	Carbon	C
7	নাইট্রোজেন	Nitrogen	N
8	অক্সিজেন	Oxygen	O
9	ক্লোরিন	Fluorine	F
10	নিয়ন	Neon	Ne
11	সোডিয়াম	Sodium	Na
12	ম্যাগনেসিয়াম	Magnesium	Mg
13	অ্যালুমিনিয়াম	Aluminium	Al
14	সিলিকন	Silicon	Si
15	ফসফরাস	Phosphorus	P
16	সালফার, গন্ধক	Sulphur	S
17	ক্লোরিন	Chlorine	Cl
18	আর্গন	Argon	Ar
19	পটাসিয়াম	Potassium	K
20	ক্যালসিয়াম	Calcium	Ca
21	স্ক্যাণ্ডিয়াম	Scandium	Sc
22	টাইটেনিয়াম	Titanium	Ti
23	ভ্যানেডিয়াম	Vanadium	V
24	ক্রোমিয়াম	Chromium	Cr
25	ম্যাংগানিজ	Manganese	Mn
26	আয়রন, লোহা	Iron	Fe
27	কোবাল্ট	Cobalt	Co
28	নিকেল	Nickel	Ni
29	কপার, তামা	Copper	Cu
30	জিংক, দস্তা	Zinc	Zn
31	গ্যালিয়াম	Gallium	Ga
32	জার্মেনিয়াম	Germanium	Ge
33	আর্সেনিক	Arsenic	As
34	সেলেনিয়াম	Selenium	Se
35	ব্রোমিন	Bromine	Br
36	ক্রিপটন	Krypton	Kr
37	রুবিডিয়াম	Rubidium	Rb
38	স্ট্রনসিয়াম	Strontium	Sr
39	ইট্রিয়াম	Yttrium	Y

40	জারকোনিয়ম	Zirconium	Zr
41	নায়োবিয়ম	Niobium	Nb
42	মলিবডেনম	Molybdenum	Mo
43	টেকনিসিয়ম	Technetium	Tc
44	রুথেনিয়ম	Ruthenium	Ru
45	রোডিয়ম	Rhodium	Rh
46	প্যালেডিয়ম	Palladium	Pd
47	সিলভার, রুপো	Silver	Ag
48	ক্যাডমিয়ম	Cadmium	Cd
49	ইণ্ডিয়ম	Indium	In
50	টিন	Tin	Sn
51	অ্যান্টিমনি	Antimony	Sb
52	টেলুরিয়ম	Tellurium	Te
53	আয়োডিন	Iodine	I
54	জিনন	Xenon	Xe
55	সিজিয়ম	Caesium	Cs
56	বেরিয়ম	Barium	Ba
57	ল্যানথানম	Lanthanum	La
58	সিরিয়ম	Cerium	Ce
59	প্রেসিওডিমিয়ম	Praseodymium	Pr
60	নিওডিমিয়ম	Neodymium	Nd
61	প্রমিথিয়ম	Promethium	Pm
62	স্তামারিয়ম	Samarium	Sm
63	ইউরোপিয়ম	Europium	Eu
64	গ্যাডোলিনিয়ম	Gadolinium	Gd
65	টাবিয়ম	Terbium	Tb
66	ডিসপ্রোসিয়ম	Dysprosium	Dy
67	হোলমিয়ম	Holmium	Ho
68	আরবিয়ম	Erbium	Er
69	থুলিয়ম	Thulium	Tm
70	ইটারবিয়ম	Ytterbium	Yb
71	লুটেসিয়ম	Lutetium	Lu
72	হাফনিয়ম	Hafnium	Hf
73	ট্যান্টালম	Tantalum	Ta

74	টাংস্টেন	Tungsten	W
75	রিনিয়ম	Rhenium	Re
76	অসমিয়ম	Osmium	Os
77	ইরিডিয়ম	Iridium	Ir
78	প্ল্যাটিনম	Platinum	Pt
79	গোল্ড, সোনা	Gold	Au
80	মার্কারি, পারদ	Mercury	Hg
81	থ্যালিয়ম	Thallium	Tl
82	লেড, সীসা	Lead	Pb
83	বিসমাথ	Bismuth	Bi
84	পোলোনিয়ম	Polonium	Po
85	অ্যাসটেটাইন	Astatine	At
86	রেডন	Radon	Rn
87	ফ্রান্সিয়ম	Francium	Fr
88	রেডিয়ম	Radium	Ra
89	অ্যাকটিনিয়ম	Actinium	Ac
90	থোরিয়ম	Thorium	Th
91	প্রোটোঅ্যাকটিনিয়ম	Protoactinium	Pa
92	ইউরেনিয়ম	Uranium	U
93	নেপচুনিয়ম	Neptunium	Np
94	প্লুটোনিয়ম	Plutonium	Pu
95	আমেরিসিয়ম	Americium	Am
96	কুরিয়ম	Curium	Cm
97	বার্কেলিয়ম	Berkelium	Bk
98	ক্যালিফোর্নিয়ম	Californium	Cf
99	আইনস্টাইনিয়ম	Einsteinium	Es
100	ফার্মিয়ম	Fermium	Fm
101	মেণ্ডেলেভিয়ম	Mendelevium	Md
102	নোবেলিয়ম	Nobelium	No
103	লরেন্সিয়ম	Lawrencium	Lw
104	রাদারফোর্ডিয়ম	Rutherfordium	R
105	হানিয়ম	Hahnium	Ha

১৩ তড়িৎ বিশ্লেষণ

বিদ্যুৎ বা তড়িৎ তোমাদের কাছে অজানা নয়। কোন কোন বস্তু তড়িৎ চলাচলের পক্ষে উপযোগী আবার কোন কোন বস্তু উপযোগী নয়। সাধারণত ধাতব বস্তু তড়িৎ প্রবাহের উপযোগী। তড়িৎ পরিবাহী হিসেবে সর্বশ্রেষ্ঠ রুপো, তার পর তামা। রুপো মূল্যবান ধাতু। আমাদের দেশে তামা ও রুপো সুলভ নয় তাই এদের পরিবর্তে অ্যালুমিনিয়মের তার ব্যবহার হয়। অধাতুগুলি তড়িৎ অপরিবাহী। উপযোগী না হলেও সকল বস্তুতেই তড়িৎ প্রবাহিত হয়। মাত্রা খুবই সামান্য হলেও। তরলের ভিতর দিয়েও তড়িৎ প্রবাহিত হয়। নানা জাতীয় অ্যাসিড, ক্ষার বা দ্রবণের ভিতর দিয়ে তড়িৎ প্রবাহিত করা যায়। আবার রবার, তারপিন তেল, পেট্রল প্রভৃতি খনিজ তেল, অনেক ধরনের জৈব তেলের মধ্যে তড়িৎ চলাচল করে না বললেই চলে। যে সব বস্তুর ভেতর দিয়ে তড়িৎ চলাচল করে না, তাদের **অন্তরক** বা ইন্সুলেটর বলে।

দেখা গেছে যে, কয়েক রকমের তরলে তড়িৎ প্রবাহিত করলে তড়িতের প্রভাবে তরলটিতে রাসায়নিক পরিবর্তন হতে থাকে এবং তরলটি উপাদান মৌল এবং মূলকে বিশ্লিষ্ট হয়। অনেক দ্রবণে এই প্রভাব দেখা যায়। খাদ্য লবণ জলে দ্রবীভূত করে, সেই দ্রবণে তড়িৎ প্রবাহ পাঠালে খাদ্য লবণ Na এবং Cl উপাদান মৌলে বিশ্লিষ্ট হয়। আবার এও দেখা গেছে যে NaCl গরম করে গলিয়ে ফেললে তরল NaClএ তড়িৎ প্রবাহিত করলেও সেটি Na ও Cl এ বিশ্লিষ্ট হয়। যে সকল যৌগ দ্রবণে বা তরল অবস্থায় তড়িৎ প্রবাহে বিশ্লিষ্ট হয়, তাদের **তড়িদ্‌বিশ্লেষ্য** বা ইলেকট্রোলাইট বলে। ইলেকট্রোলাইটের উদাহরণ NaCl, $AgNO_3$, $CuSO_4$, HCl, HNO_3, H_2SO_4, NaOH, KOH, ইত্যাদি।

যে সকল যৌগ দ্রবণে বা তরল অবস্থায় তড়িৎ প্রবাহে বিশ্লিষ্ট হয় না তাদের **তড়িদ্-অবিশ্লেষ্য** বা নন্-ইলেকট্রোলাইট বলে। চিনি, গ্লুকোজ, অ্যালকোহল, ইউরিয়া ইত্যাদি নন-ইলেকট্রোলাইট।

তড়িৎ প্রবাহের সাহায্যে দ্রবণে বা তরল অবস্থায় যৌগের রাসায়নিক বিশ্লেষণকে **তড়িদ্-বিশ্লেষণ** বা ইলেক্‌ট্রোলিসিস বলে।

আয়ন ও আয়নন

তড়িদ্-বিশ্লেষণ যে হয় এই সত্য পরীক্ষা করে জানা গেছে। কিন্তু কেন হয় এবং কি করে হয় এর ব্যাখ্যা প্রথম করেন সুইডিশ বিজ্ঞানী আরহেনিয়স 1884 খ্রীস্টাব্দে। আরহেনিয়সের বয়স তখন মাত্র পঁচিশ বছর। আরহেনিয়স বলেন যে সকল বস্তু তড়িদ্-বিশ্লেষ্য বা ইলেক্‌ট্রোলাইট তাদের মধ্যে তড়িৎ ধর্ম বর্তমান। দ্রবণে বা তরলে এরা পজিটিভ ও নেগেটিভ—এই দুটি বিপরীত তড়িৎ-ধর্মী উপাদানে বিয়োজিত হয় (চিত্র 13.1)। বিয়োজিত হলেও একেবারে আলাদা হয় না এবং তখনও তড়িৎ ধর্ম দেখা দেয় না। কিন্তু তরলে তড়িদ্-দ্বারের সাহায্যে তড়িৎ ক্ষেত্র প্রয়োগ করলে পজিটিভ অংশটি নেগেটিভ তড়িদ্-দ্বারের দিকে এবং নেগেটিভ অংশটি পজিটিভ তড়িদ্-দ্বারের দিকে আকৃষ্ট হয়। তড়িদ্-বিভব যথেষ্ট হলে পজিটিভ ও নেগেটিভ অংশগুলি সম্পূর্ণ বিযুক্ত হয়ে বিপরীতধর্মী তড়িদ্-দ্বারের দিকে চলে যায়। আয়নগুলি প্রবাহিত হয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহ সৃষ্টি করে। যতক্ষণ পর্যন্ত সমস্ত পজিটিভ অংশ নেগেটিভ তড়িদ্-দ্বারে এবং নেগেটিভ অংশ পজিটিভ দ্বারে না যাবে ততক্ষণ তড়িৎ প্রবাহ চলবে। দ্রবণে বা তরলে বিয়োজন হলে বিয়োজিত তড়িদ্-ধর্মবিশিষ্ট অংশগুলির আরহেনিয়স নাম দেন **আয়ন**। যে আয়নগুলি নেগেটিভ তড়িদ্-দ্বার বা ক্যাথোডের দিকে যায় তাদের বলা হয় **ক্যাটায়ন** এবং এগুলি + চিহ্ন দিয়ে দেখান হয়। আর যেগুলি পজিটিভ তড়িদ্-দ্বার বা অ্যানোডের দিকে যায় তাদের বলা হয় **অ্যানায়ন** এবং এগুলি − চিহ্ন দিয়ে দেখান হয়।
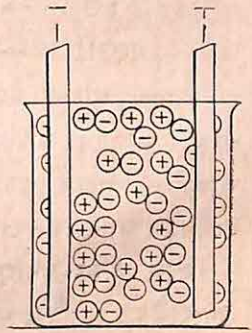
চিত্র 13.1

দ্রবণে বা তরলে যৌগের বিপরীতধর্মী আয়নে বিয়োজনকে বলা হয় **আয়নন**।

আয়ন বা আয়নন কথাগুলি প্রথম ব্যবহৃত হয় তড়িদ্-বিশ্লেষণ ব্যাখ্যা করার জন্য। পরে অবশ্য এর ব্যবহার অনেক ব্যাপক হয়েছে, তোমরা ক্রমে ক্রমে জানতে পারবে।

নানা রকমের দ্রবণে ও তরলে তড়িৎ প্রয়োগ করে কোনটি ক্যাটায়ন বা অ্যানায়ন জানা গেছে। আয়নগুলি মৌল ও মূলক। তোমাদের পরিচিত যৌগ, যারা তড়িদ্-বিশ্লেষ্য, তাদের আয়ন পরিচিতি দেওয়া হল।

$NaCl$	→	Na^+	Cl^-
$CuSO_4$	→	Cu^{++}	$(SO_4)^-$
$AgNO_3$	→	Ag^+	$(NO_3)^-$
NH_4Cl	→	$(NH_4)^+$	Cl^-
HCl	→	H^+	Cl^-
HNO_3	→	H^+	$(NO_3)^-$
H_2SO_4	→	$2H^+$	$(SO_4)^-$
H_2O	→	H^+	$(OH)^-$
$NaOH$	→	Na^+	$(OH)^-$
KOH	→	K^+	$(OH)^-$

আয়ন, আয়নন ইত্যাদি আরও পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারবে পরমাণুর গঠনে ইলেকট্রনের ভূমিকা জানার পর। কিন্তু মনে রেখ আরহেনিয়স যখন আয়ন ও আয়নন প্রচলন করেন তখনও ইলেকট্রনের আবিষ্কার হয়নি। ইলেকট্রন আবিষ্কার করেন জে. জে. টমসন, 1897 খ্রীস্টাব্দে।

জলে তড়িৎ-প্রবাহের প্রভাব : বিশুদ্ধ জল তড়িৎ প্রবাহের খুব উপযোগী নয়। কিন্তু অল্প পরিমাণ লবণ বা অ্যাসিড দিলে তড়িৎ প্রবাহের উপযোগী হয়। একটি বীকারে জল নিয়ে তাতে কয়েক ফোঁটা সালফিউরিক অ্যাসিড দাও। তারপর দুটি লম্বা জলভর্তি টেস্ট টিউব উলটো করে বীকারের মধ্যে দাঁড় করাও (চিত্র 13.2)। দুটি ধাতব দণ্ড বা সরু প্লেট টিউব দুটির মধ্যে পুরে সে দুটি অন্তরক তারের সাহায্যে জলের বাইরে এনে তড়িৎ বর্তনীতে যোগ কর। এখন বর্তনীতে চাবি বা সুইচ দিলেই জলের মধ্যে দিয়ে তড়িৎ প্রবাহিত হবে। ফলে নেগেটিভ তড়িদ্-দ্বারে হাইড্রোজেন গ্যাস এবং
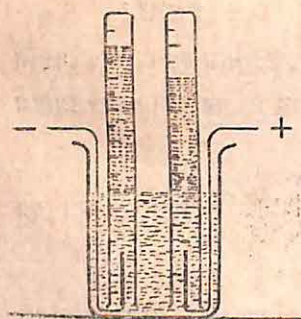
চিত্র 13.2

পজিটিভ তড়িদ্-দ্বারে অক্সিজেন গ্যাস জমা হতে থাকবে। টেস্ট টিউবগুলি যদি অংশাঙ্কিত হয় তবে দেখা যাবে প্রতি দুই ভাগ হাইড্রোজেন গ্যাস যে সময়ে জমা হয় সেই সময়ে এক ভাগ অক্সিজেন গ্যাস জমা হবে।

আয়ননের সাহায্যে জলের বিশ্লেষণ খুব সরল নয়। প্রথমে $H_2O = H^+$ এবং OH^- হয়। H^+টি নেগেটিভ তড়িদ্-দ্বারে গিয়ে H_2 গ্যাস হিসেবে আহরিত হয়। $(OH)^-$ মূলকটি পজিটিভ তড়িদ্-দ্বারে এসে প্রশমিত হয়। পরে চারটি (OH) মূলক নিজেদের মধ্যে বিক্রিয়ায় জল ও অক্সিজেন তৈরি করে এবং O_2 গ্যাস পজিটিভ তড়িদ্-দ্বারে জমা হয়।

তড়িৎ প্রয়োগে জল বিশ্লেষিত হয়, কিন্তু জল কি ইলোক্ট্রোলাইট ? জল অতি মৃদু ইলেকট্রোলাইট। বিশুদ্ধ জলে প্রতি এক কোটি অণুতে একটি H^+ আয়ন হয়। সাধারণ তড়িৎ পরিবাহীর সঙ্গে ইলেক্ট্রোলাইটের পার্থক্য এই যে, পরিবাহীতে ইলেকট্রনের প্রবাহ তড়িৎ প্রবাহ সৃষ্টি করে আর ইলেকট্রো-লাইটে আয়ন প্রবাহ তড়িৎ প্রবাহ সৃষ্টি করে। পরিমাণে অত্যন্ত কম হলেও জলে তড়িৎ আয়ন দ্বারা প্রবাহিত হয়। সেই হিসেবে জল ইলেকট্রোলাইট।

তড়িৎ প্রবাহের ব্যবহারিক সংজ্ঞা: তড়িদ্-বিশ্লেষণের সাহায্যে তড়িৎ প্রবাহের আন্তর্জাতিক ব্যবহারিক সংজ্ঞা দেওয়া হয়। $AgNO_3$র দ্রবণ তড়িদ্ বিশ্লেষণে নেগেটিভ তড়িদ্-দ্বারে Ag গচ্ছিত করে। সিলভার নাইট্রেটের দ্রবণে যে প্রবাহ প্রতি সেকেণ্ডে 0·001118 g সিলভার নেগেটিভ তড়িদ্-দ্বারে গচ্ছিত করে তাকে এক অ্যাম্পিয়র বলে। সংজ্ঞাটি লক্ষ্য করে দেখ কেবলমাত্র ভর ও সময় মেপে তড়িৎ প্রবাহের মান নির্ণয় করা হয়।

তড়িৎ লেপন

তড়িদ্-বিশ্লেষণের নানাবিধ ব্যবহারিক প্রয়োগের একটি হল তড়িৎ লেপন বা **ইলেকট্রোপ্লেটিং** করা। যে সমস্ত ধাতুর উপরিতল হাওয়ার বা জলের সংস্পর্শে এলে অক্সাইড তৈরি হয়ে অমলিন হয়ে পড়ে এবং ক্ষয়ে যেতে থাকে, সেগুলির উপরে হাওয়া বা জলে মলিন হয় না এমন ধাতু লেপন করা হয়। তড়িদ্-বিশ্লেষণের সাহায্যে ধাতুলেপনকে **তড়িৎ লেপন** বলে। যে কোন শহরে খোঁজ করলেই কোথায় ইলেকট্রোপ্লেটিং হয় জানতে পারবে এবং পারলে

গিয়ে দেখে এসো। সাধারণত লোহা, তামা, পিতল প্রভৃতি দিয়ে তৈরি বস্তুকে ক্ষয় থেকে বাঁচাবার জন্য এবং দেখতে সুন্দর করার জন্য অনেক সময় নিকেল, ক্রোমিয়ম, রুপো বা সোনা দিয়ে লেপন করা হয়। স্টেনলেস স্টীলে মরচে পড়ে না বা দাগ ধরে না। কিন্তু অন্য যে কোন ধাতু বা সংকর ধাতু দিয়ে তৈরি কাঁটা, চামচে নিকেল প্লেট করা হয়। অনেক গাড়ির বাম্পার ক্রোমিয়ম প্লেট করা থাকে। অনেক দিন ব্যবহারের পর নিকেল উঠে গেলে আবার নিকেল প্লেটিং করান হয়।

লেপনের জন্য নিকেল, ক্রোমিয়ম, রুপো এবং কোন কোন জিনিসে সোনাও ব্যবহার হয়। সোনা লেপন করাকে গিল্টি করাও বলা হয়। যে ধাতু লেপন করা হবে সেই ধাতুর লবণ ও সুবিধামত অ্যাসিড দিয়ে দ্রবণ তৈরি করা হয়। তড়িদ্-বিশ্লেষণের জন্য ঐ ধাতুরই অ্যানোড ব্যবহার করা হয় এবং যে বস্তুটিতে ধাতুলেপন করা হবে তাকে ক্যাথোড হিসাবে ব্যবহার করা হয়। প্রথমে বস্তুটি কস্টিক দিয়ে ধুয়ে তেল, গ্রীজ ইত্যাদি তুলে ফেলা হয়। তারপর লঘু হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড বা সালফিউরিক অ্যাসিডে চুবিয়ে অক্সাইডের স্তর উঠিয়ে ফেলে ভাল করে জল দিয়ে ধুয়ে মুছে পালিশ করে তারপর ইলেকট্রো-প্লেটিং-এর সলিউশনে চোবান হয়। তারপর পূর্ব অভিজ্ঞতা অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময় ধরে প্রয়োজনীয় প্রবাহ পাঠালে বস্তুটিতে ধাতুলেপন সম্পন্ন হবে। তামা লেপন করতে ব্যবহার করা হয় তামার তৈরি অ্যানোড ও কপার সালফেট সলিউশন। রুপোর জন্য চাই রুপোর তৈরি অ্যানোড ও সিলভার নাইট্রেট অথবা পট্যাসিয়ম আর্জেন্টা সায়ানাইড সলিউশন। নিকেলের জন্য নিকেল অ্যানোড ও বরিক অ্যাসিড মিশ্রিত নিকেল সালফেট দ্রবণ। ক্রোমিয়মের জন্য ক্রোমিয়ম অ্যানোড ও ক্রোমিক অ্যাসিড এবং সোনার জন্য সোনার অ্যানোড এবং পট্যাসিয়ম অরোসায়ানাইড সলিউশন।

অবশ্য হাতে কলমে বড় বড় ইলেকট্রোপ্লেটিং-এর কাজ করতে হলে আরও অনেক খবর জানা দরকার। তার জন্য ইলেকট্রোপ্লেটিং সম্বন্ধে ভাল ভাল বই আছে, সেগুলি পড়ে নেওয়াই ভাল।

১৪ অ্যাসিড, ক্ষারক ও লবণ

পৃথিবীতে সকল যৌগ 92টি মৌল দিয়ে তৈরি। যৌগদের মোটামুটি দুভাগ করা যায়—অজৈব ও জৈব। আমরা অজৈব যৌগের কথা এখানে আলোচনা করছি। প্রায় চল্লিশ হাজার অজৈব যৌগ জানা আছে। এদের তিন ভাগে ভাগ করা যায় : (1) অ্যাসিড, (2) ক্ষারক বা বেস, (3) লবণ বা সল্ট।

অ্যাসিড—অ্যাসিড শব্দের অর্থ অম্ল। প্রাচীন কিমিয়াবিদরা লক্ষ্য করেন যে বেশ কয়েক ধরনের পদার্থকে জলে গুললে দ্রবন অম্ল স্বাদ দেয় এবং কোন ধাতুর সঙ্গে বিক্রিয়ায় হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন করে। তাঁরা এদের নাম দেন অ্যাসিড। এখন জানা গিয়েছে যে, কোন দ্রবণে হাইড্রোজেন আয়নের উপস্থিতিই হচ্ছে সেই বস্তুর অম্লত্বের কারণ। সেইজন্য হাইড্রোজেন আছে এমন কোন যৌগিক পদার্থের জলীয় দ্রবণ বিয়োজিত হয়ে হাইড্রোজেন আয়ন উৎপন্ন করলে সেই যৌগিক পদার্থকে অ্যাসিড বলে। উদাহরণ স্বরূপ—

$$HCl \rightarrow H^+ + Cl^- \; ; \; H_2SO_4 \rightarrow 2H^+ + SO_4^-$$
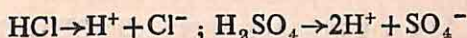
সুতরাং HCl এবং H_2SO_4 যৌগিক পদার্থ দুটি অ্যাসিড। যে অ্যাসিড জলীয় দ্রবণে যত বেশি H^+ আয়ন উৎপন্ন করে সেই অ্যাসিড তত বেশি তীব্র। কয়েক ধরনের অ্যাসিড ও তাদের রাসায়নিক সংকেত দেওয়া হল : হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড HCl, সালফিউরিক অ্যাসিড H_2SO_4, নাইট্রিক অ্যাসিড HNO_3, সালফিউরাস অ্যাসিড H_2SO_3। এগুলি সবই অজৈব বা খনিজ অ্যাসিড।

খেতে টক এমন যে কোন বস্তুতে অ্যাসিড আছে। লেবু, দই, তেঁতুল সবেতেই অ্যাসিড আছে। লেবুতে আছে সাইট্রিক অ্যাসিড, দই-এ আছে ল্যাকটিক অ্যাসিড, তেঁতুলে আছে টারটারিক অ্যাসিড। ভিনিগারও এক ধরনের অ্যাসিড। এগুলি কিন্তু জৈব অ্যাসিডের উদাহরণ।

হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড, নাইট্রিক অ্যাসিড ও সালফিউরিক অ্যাসিডের ধাতু গলাতে, গ্যাস উৎপাদনে এবং বিভিন্ন কাজে ব্যবহার হয়ে থাকে। অ্যাসিডের

ধর্ম ধাতুর সঙ্গে বিক্রিয়ায় হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন করা। একটা বীকারে এক টুকরো দস্তা নাও এবং কিছুটা লঘু হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ঢাল। দেখবে হাইড্রোজেন গ্যাস বুদবুদ আকারে বার হচ্ছে।

$$Zn + 2HCl = ZnCl_2 + H_2 \uparrow$$
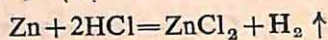
↑ চিহ্ন দিয়ে গ্যাস বোঝান হয়।

ক্ষারক—যে বস্তু অ্যাসিডের সঙ্গে রাসায়নিক বিক্রিয়ার পর লবণ ও জল তৈরি করে তাকে ক্ষারক বলে। যদি সোডিয়ম হাইড্রক্সাইডে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ঢাল দেখবে সোডিয়ম ক্লোরাইড অর্থাৎ খাবার লবণ ও জল পাবে।

$$NaOH + HCl = NaCl + H_2O$$
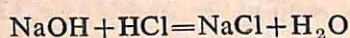
সোডিয়ম হাইড্রক্সাইডের মত ক্যালসিয়ম হাইড্রক্সাইড, জিংক হাইড্রক্সাইড, পট্যাসিয়ম হাইড্রক্সাইডও ক্ষারক। দেখা গিয়েছে বস্তুর ক্ষারত্বের কারণ হচ্ছে OH^- মূলকের আয়নের উপস্থিতি। OH^- আয়নকে **হাইড্রক্সিল** বা **হাইড্রক্সাইড** আয়ন বলে। সুতরাং যে সব যৌগিক পদার্থের জলীয় দ্রবণ বিয়োজিত হয়ে হাইড্রক্সাইড আয়ন উৎপন্ন করে সেই যৌগিক পদার্থকে **ক্ষারক** বলে। প্রায় সকল ধাতুর হাইড্রক্সাইড হচ্ছে ক্ষারক। LiOH, NaOH, KOH প্রভৃতিকে **ক্ষার** বা **অ্যালকালি** বলা হয়। এরা জলে গলে যায়। সুতরাং সব ক্ষারক কিন্তু ক্ষার নাও হতে পারে। $Ba(OH)_2$, $Mg(OH)_2$ প্রভৃতিকে **ক্ষার মৃত্তিকা** বলে। যে কোন ক্ষারের দ্রবণকে **ক্ষারীয় দ্রবণ** বলা হয়।

সূচক—অ্যাসিড বা ক্ষারকের ধর্ম হচ্ছে—কোন কোন জৈব যৌগিক পদার্থের রঙ পাল্টানোর ক্ষমতা। এক কাপ চায়ের গাঢ় রঙে যদি লেবুর রস ঢাল দেখবে রঙ হালকা হয়ে গিয়েছে। আবার চায়ের সেই হালকা রঙে যদি ক্ষারীয় দ্রবণ যোগ কর দেখবে রঙ আবার গাঢ় হয়ে উঠেছে। অ্যাসিড বা ক্ষারের প্রয়োগে যে সব বস্তু রঙ পাল্টায় তাদের বলা হয় **সূচক** বা ইণ্ডিকেটর।

পরীক্ষাগারে লিটমাস দ্রবণ বা লিটমাস কাগজ হচ্ছে অতি পরিচিত সূচক। অ্যাসিড দ্রবণে নীল লিটমাস কাগজ লাল রঙ হয়। ক্ষারীয় দ্রবণে লাল লিটমাস কাগজ নীল রঙে পরিবর্তিত হয়। ফেনফথ্যালিন ও মিথাইল অরেঞ্জ নামে আরও দুটো তরল সূচক পরীক্ষাগারে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এই দুটোই জৈব যৌগিক পদার্থ। অ্যাসিড দ্রবণে ফেনফথ্যালিন বর্ণহীন এবং ক্ষারীয় দ্রবণে

গোলাপী দেখায়। মিথাইল অরেঞ্জের নিজের রঙ কমলা, এক ফোঁটা মেশালে অ্যাসিডকে লাল ও ক্ষারককে হলুদ রঙে পরিবর্তিত করে।

লবণ—লবণ বলতে তোমরা খাবার লবণকেই বোঝ। কিন্তু খাবার লবণই একমাত্র লবণ নয়। অনেক রকম লবণ আছে। লবণ অর্থে কি বোঝায় দেখ। অ্যাসিডের সঙ্গে কোন ধাতুর রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে অ্যাসিডের প্রতিস্থাপন-যোগ্য হাইড্রোজেন সম্পূর্ণভাবে বা আংশিকভাবে ধাতুর দ্বারা প্রতিস্থাপিত হলে যে যৌগ তৈরি হয় তাকে লবণ বা সল্ট বলে। যেমন—

$$Zn + H_2SO_4 = ZnSO_4 + H_2$$

$ZnSO_4$ একটি লবণ।

অ্যাসিড ও ক্ষারকের সংযোগেও লবণ তৈরি হয়।

$$NaOH + HCl = NaCl + H_2O$$

$$NH_4OH + HCl = NH_4Cl + H_2O$$

$$H_2SO_4 + NaOH = NaHSO_4 + H_2O$$
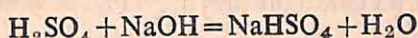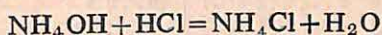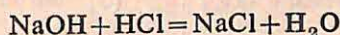
$NaCl$, NH_4Cl এবং $NaHSO_4$ লবণ।

লবণদের তিনভাগে ভাগ করা হয়—(1) অ্যাসিড লবণ, (2) ক্ষারকীয় লবণ এবং (3) শমিত লবণ।

অ্যাসিড লবণ : অ্যাসিডের হাইড্রোজেন আংশিকভাবে ধাতু বা ধাতুমূলক দিয়ে প্রতিস্থাপিত হয়ে যে লবণ তৈরি হয় তাকে **অ্যাসিড লবণ** বলে। $NaCl + H_2SO_4 = NaHSO_4 + HCl$। এখানে $NaHSO_4$ অ্যাসিড লবণ।

ক্ষারকীয় লবণ : অ্যাসিড ও ক্ষারকের বিক্রিয়ায় প্রয়োজনের অতিরিক্ত ক্ষারক ব্যবহৃত হয়ে য়ে লবণ তৈরি হয় তাকে **ক্ষারকীয় লবণ** বলে। $Pb(OH)_2 + HCl = Pb(OH)Cl + H_2O$। $Pb(OH)Cl$ ক্ষারকীয় লবণ।

শমিত লবণ : ধাতু বা ধাতবমূলক দিয়ে অ্যাসিডের হাইড্রোজেন **সম্পূর্ণভাবে** প্রতিস্থাপিত হয়ে যে লবণ তৈরি হয় তাকে **শমিত লবণ** বলে। $H_2SO_4 + 2NaOH = Na_2SO_4 + 2H_2O$। Na_2SO_4 শমিত লবণ।

প্রশমন—অ্যাসিড ও ক্ষারের রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে লবণ ও জল তৈরি হয়। এই রাসায়নিক বিক্রিয়ার পর যদি কোন অ্যাসিড বা ক্ষার অবশিষ্ট না থাকে অর্থাৎ ক্ষারের ও অ্যাসিডের সবটুকুই রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ

করে তবে সেক্ষেত্রে অ্যাসিড ও ক্ষারক একে অন্যকে প্রশমিত বা নিউট্রালাইজ করেছে বলা হয়। এই পদ্ধতিকে **প্রশমন** বা নিউট্রালাইজেশন বলে। প্রশমনের পর দ্রবণের অম্লতা বা ক্ষারত্ব থাকে না এবং সূচকের রঙ পাল্টাতে পারে না।

অ্যাসিড ও ক্ষারকের পার্থক্য

অ্যাসিড	ক্ষারক
(1) জলে গলে এবং জলীয় দ্রবণে বিয়োজনের পর H^+ উৎপন্ন হয়।	(1) জলে গলে এবং জলীয় দ্রবণে বিয়োজনের পর OH^- উৎপন্ন হয়।
(2) স্বাদ অম্ল।	(2) স্বাদ কষা।
(3) ধাতু ও ক্ষারকের সঙ্গে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় লবণ তৈরি করে।	(3) অ্যাসিডের সঙ্গে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় লবণ তৈরি করে।
(4) নীল লিটমাস কাগজ লাল হয়।	(4) লাল লিটমাস কাগজ নীল হয়।
(5) ফেনফথ্যালিন বর্ণহীন থাকে।	(5) ফেনফথ্যালিন গোলাপী হয়।
(6) মিথাইল অরেঞ্জ লাল হয়।	(6) মিথাইল অরেঞ্জ হলুদ রঙের হয়।

১৫ জারণ ও বিজারণ

জারণ

জারণ কথাটিতে বোঝায় অক্সিজেনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগ। কোন পদার্থের সঙ্গে অক্সিজেনের যখন বিক্রিয়া হয় তখন তাকে **জারণ** বা **অক্সিডেশন** বলে। হাইড্রোজেন অক্সিজেনের সঙ্গে মিলিত হয়ে জল তৈরি করে। এক্ষেত্রে হাইড্রোজেন জারিত হয়েছে। যে পদার্থ জারণ করে তাকে **জারক দ্রব্য** বলে। আরও দু-একটি উদাহরণ নাও। যখন কয়লা পোড়ে তখন CO_2 তৈরি হয়। ম্যাগনেসিয়মের একটি তার বাতাসে পোড়ালে ম্যাগনেসিয়ম অক্সাইড MgO তৈরি হয়। প্রথমটি কার্বন ও দ্বিতীয়টিতে ম্যাগনেসিয়ম জারিত হয়েছে। সমীকরণ দুটি নিচে দেওয়া হল:

$$C+O_2=CO_2$$

$$2Mg+O_2=2MgO$$
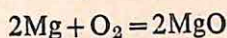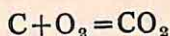
লোহা, গন্ধক, ফসফরাস যখন অক্সিজেনের সঙ্গে বিক্রিয়ার পর নিজেদের অক্সাইড তৈরি করে তখন তাদের জারিত হয়েছে বলা হয়।

জারণ অর্থে হাইড্রোজেনের অপসারণও বোঝায়। যেমন ক্লোরিন গ্যাস তৈরির সময় MnO_2তে গাঢ় HCl অ্যাসিড যোগ করা হয়।

$$4HCl+MnO_2=Cl_2+MnCl_2+2H_2O$$

এখানে MnO_2 জারক দ্রব্য, জারণ করেছে গাঢ় HCl অ্যাসিডকে।

অক্সিজেন একটি অধাতু মৌল। তড়িদ্‌বিশ্লেষণের সময় দেখা গিয়েছে অক্সিজেন তড়িদ্‌বিশ্লেষ্যের ভিতর দিয়ে পজিটিভ তড়িদ্দ্বারের দিকে যায়। এই জাতীয় পদার্থগুলিকে বলা হয় **ইলেকট্রোনেগেটিভ মৌল**। ক্লোরিন, ব্রোমিন, আয়োডিন প্রভৃতি এই জাতীয় মৌল। কোন রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় অক্সিজেনের সংযোজন ছাড়াও অন্য কোন ইলেকট্রোনেগেটিভ পদার্থের সংযোজন ঘটলেও সেই প্রক্রিয়াকে জারণ বলে। উদাহরণস্বরূপ ফেরাসক্লোরাইড ক্লোরিন গ্যাস দিয়ে জারণ করলে ফেরিক ক্লোরাইড উৎপন্ন হয়।

$$2FeCl_2+Cl_2=2FeCl_3$$
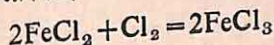
বেশির ভাগ ধাতুই ইলেকট্রোপজিটিভ মৌলিক পদার্থ। হাইড্রোজেনের মত ইলেকট্রোপজিটিভ পদার্থের অপসারণকেও জারণ বলে। যেমন পট্যাসিয়ম আয়োডাইডের সঙ্গে হাইড্রোজেন পেরক্সাইডের সংযোগ ঘটলে ইলেট্রোপজিটিভ পট্যাসিয়ম ধাতু অপসারিত হয়। $2KI + H_2O_2 = I_2 + 2KOH$

সুতরাং জারণ বলতে বোঝায়—(ক) অক্সিজেনের সংযোজন, (খ) হাইড্রোজেনের অপসারণ, (গ) ইলেট্রোনেগেটিভ মৌলের বা মূলকের সংযোজন ও ইলেকট্রোপজিটিভ মৌলের বা মূলকের অপসারণ।

বিজারণ

বিজারণ বিক্রিয়া জারণ বিক্রিয়ার ঠিক বিপরীত। বিজারণ বা রিডাকসন বলতে বোঝায় অক্সিজেনের অপসারণ বা হাইড্রোজেনের সংযোজন। হাইড্রোজেন গ্যাসের পরিবেশে যখন কপার অক্সাইডকে গরম করা হয় তখন কপার অক্সাইড বিজারিত হয়ে তামা পাওয়া যায়। এখানে হাইড্রোজেন গ্যাস বিজারক দ্রব্য বা রিডিউসিং এজেন্ট। ক্লোরিন দ্রবণের ভিতর দিয়ে সালফিউরেটেড হাইড্রোজেন পাঠালে, ক্লোরিন গ্যাসে বিজারিত হয়ে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড তৈরি হয়। নিচের সমীকরণ দুটি দেখলে বুঝতে পারবে।

$$CuO + H_2 = Cu + H_2O \qquad H_2S + Cl_2 = 2HCl + S$$

অক্সিজেনের মত যে কোন ইলেকট্রোনেগেটিভ মৌলের অপসারণ বা হাইড্রোজেনের মত যে কোন ইলেকট্রোপজিটিভ মৌলের সংযোজনকেও বিজারণ বলে। $AlCl_3$-র সঙ্গে সোডিয়মের বিক্রিয়ায় যৌগিক বস্তুটি বিজারিত হয়ে Al ধাতু পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে ইলেকট্রোনেগেটিভ মৌল ক্লোরিন অপসারিত হয়।

$$AlCl_3 + 3Na = Al + 3NaCl$$
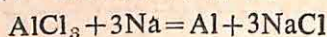
সেইরকম মারকিউরাস ক্লোরাইডের সঙ্গে ইলেকট্রোপজিটিভ পারদের সংযোজনে মারকিউরাস ক্লোরাইড বিজারিত হয়ে মারকিউরিক ক্লোরাইড উৎপন্ন হয়। $HgCl_2 + Hg = Hg_2Cl_2$

সুতরাং বিজারণ বলতে বোঝায়—(ক) হাইড্রোজেনের সংযোজন, (খ) অক্সিজেনের অপসারণ, (গ) ইলেকট্রোনেগেটিভ মৌলের অপসারণ ও ইলেকট্রোপজিটিভ মৌলের সংযোজন।

জারণ বা বিজারণ বস্তুর রাসায়নিক ধর্ম। এটা মনে রেখো জারণ হলেই তার সঙ্গে বিজারণ হবে। কারণ জারক বস্তুটি বিজারিত হয়।

১৬ তরল বায়ু, নাইট্রোজেন চক্র ও কার্বন ডাইঅক্সাইড চক্র

তরল বায়ু

বায়ুমণ্ডলে বাতাস বিভিন্ন গ্যাসের একটি মিশ্রণ। এর একটা বড় অংশ নাই-ট্রোজেন ও অক্সিজেন, অল্প মাত্রায় আরগন ও কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং অতি অল্প মাত্রায় নিয়ন, হিলিয়ম, ক্রিপটন, হাইড্রোজেন, মিথেন ও নাইট্রাস অক্সাইড। অবশ্য জলীয় বাষ্প ত আছেই আবহাওয়ার অবস্থা অনুযায়ী। তরল বায়ু বলতে তরল নাইট্রোজেন ও তরল অক্সিজেনই বোঝায়। বায়ুমণ্ডলে নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন যথাক্রমে আয়তনের 78·048 এবং 20·946 শতাংশ। নানাবিধ শিল্পে নাইট্রোজেন গ্যাস, অক্সিজেন গ্যাস, তরল নাইট্রোজেন এবং তরল অক্সিজেনের চাহিদা প্রচুর। বায়ু তরল করে এই গ্যাস দুটির উৎপাদন অপেক্ষাকৃত কম খরচে করা যায়। ভারতের অনেক বড় শহরে তরল বায়ু তৈরির জন্য ফ্যাক্টরি আছে। কলকাতাতেই একটির বেশি কারখানা তরল বায়ু বিক্রী করেন। দাম প্রতি লিটার প্রায় চার টাকা। অনেক গবেষণাগারে নিজস্ব তরল বায়ু তৈরির প্ল্যাণ্ট আছে।

বায়ু তরল করার জন্য যন্ত্র উদ্ভাবন করেন দুজন বিজ্ঞানী একই সময়ে— 1895 সালে—লিণ্ডে জার্মানিতে এবং হাম্পসন ইংল্যাণ্ডে। যে পদ্ধতিতে যন্ত্রটি কাজ করে, নিচে বলা হল। খুব উচ্চচাপে থাকা অবস্থায় গ্যাসকে যদি হঠাৎ একটি সরু মুখ নলের মধ্যে দিয়ে প্রসারিত করা হয়, তবে গ্যাসটি ঠাণ্ডা হয়ে পড়ে। একে জুল-টমসন প্রভাব বলে। লিণ্ডে যন্ত্রে এই প্রভাবের সাহায্যেই বায়ু তরল করা হয়। প্রথমে বায়ু থেকে ধুলো, জলীয় বাষ্প এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড দূর করা হয়। কার্বন ডাইঅক্সাইড অতি অল্প তাপমাত্রায় জমে যায় বলে বাতাসে থাকলে জমে গিয়ে লিক্‌উইফায়ারের সরু নলের মুখ বন্ধ করে দেবে। C_1 কম্প্রেসরের সাহায্যে বাতাস প্রথমে বায়ুমণ্ডলের অপেক্ষা 20 গুণ চাপে সংনমিত করা হয় (চিত্রে 16.1)। চাপে বায়ুর তাপমাত্রা বেড়ে যায় এবং ঠাণ্ডা জলে ডোবানো T_1 নলের মধ্যে দিয়ে পাঠিয়ে বাতাসের তাপমাত্রা

কমিয়ে আনা হয়। এবারে কষ্টিক সোডাপূর্ণ কক্ষ Pর মধ্যে দিয়ে পাঠিয়ে CO_2 দূর করা হয়। জলীয় বাষ্প দূর করারও প্রয়োজন মত ব্যবস্থা থাকে।
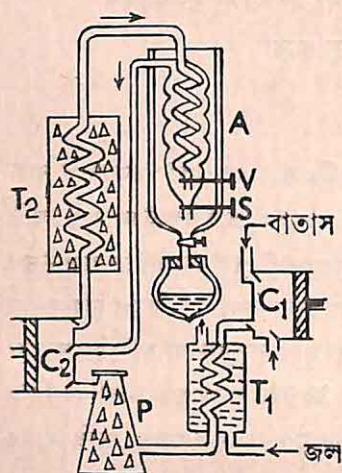
চিত্র 16.1

এরপর বাতাসকে দ্বিতীয় কম্প্রেসর C_2র সাহায্যে বায়ুমণ্ডল অপেক্ষা 200 গুণ বেশি চাপে সংনমিত করা হয়। উচ্চচাপে বাতাসের তাপমাত্রা বাড়ে এবং হিমমিশ্রণে রাখা T_2 নলের মধ্যে দিয়ে এই বাতাস পাঠিয়ে তাপমাত্রা কমান হয়। উচ্চচাপের এই বাতাসকে পরে A প্রসারণ কক্ষে সরুমুখ নল Vর মুখে হঠাৎ প্রসারিত করা হয়। ফলে তাপমাত্রা কমে। এই ঠাণ্ডা বাতাসকে C_2 কম্প্রেসর কক্ষে পুনরায় নিয়ে এনে সংনমিত করা হয় ও T_2 নলের সাহায্যে ঠাণ্ডা করে আবার V সরুমুখ নলে প্রসারিত করা হয়। এই ভাবে তাপমাত্রা ধাপে ধাপে কমতে থাকে। ঐ ঠাণ্ডা বায়ু আবার সংনমিত ও প্রসারিত করা হয়। তাপমাত্রা নামতে নামতে এক সময়ে বায়ু তরল হয় এবং নিচে রাখা পাত্রে জমা হতে থাকে। তাপমাত্রা প্রায় $-200°C$ হয়।

চিত্র 16.2

তরল বায়ু সাধারণ পাত্রে রাখা চলে না। থার্মোফ্লাস্ক জাতীয় পাত্রে রাখতে হয়। সাধারণ থার্মোফ্লাস্ক কাচের তৈরি ও সাধারণত মাপে ছোট বলে উপযোগী নয়। জার্মান সিলভার জাতীয় ধাতুর পাত (যাতে তাপ বিশেষ পরিবাহিত হয় না) দিয়ে তৈরি দুটো দেওয়ালের ফ্লাস্কে তরল বায়ু (চিত্র 16.2) রাখা হয়। দুটি দেওয়ালের মধ্যে ভ্যাকুয়াম করে বন্ধ করা থাকে। ভ্যাকুয়াম নষ্ট হয়ে হাওয়া ঢুকে গেলে পাত্র আর কাজ করবে না। তরল হাওয়া থেকে
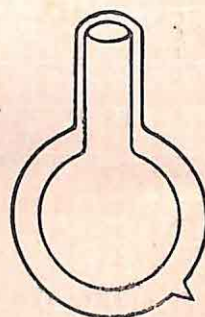
ক্রমাগত বাষ্পায়ন হতে থাকে। তরল নাইট্রোজেনের স্ফুটনাঙ্ক —195·7°C এবং অক্সিজেনের —182·9°C। সুতরাং প্রথমেই নাইট্রোজেন উপে যেতে থাকে। এই গ্যাস ধরে উচ্চচাপে গ্যাস সিলিণ্ডারে ভর্তি করে রাখা যায়। নাইট্রোজেন উপে যাবার পর পড়ে থাকে তরল অক্সিজেন। সেটি থেকেও বাষ্পায়ন চলতে থাকে। অক্সিজেন উচ্চচাপে গ্যাস সিলিণ্ডারে ভর্তি করে বিক্রী করা হয়। এইভাবে প্রস্তুত অক্সিজেন প্রায় 96 শতাংশ শুদ্ধ। নিম্ন তাপমাত্রা সৃষ্টির জন্য ও শিল্পের বহু কাজে, বিজ্ঞানের গবেষণায় তরল নাইট্রোজেন ও তরল অক্সিজেন ব্যবহার হয়। কলকাতায় সাহা ইন্‌স্টিটিউটের গবেষণাগারে একটি ছোট বায়ু তরল করার যন্ত্র আছে।

নিম্ন তাপমাত্রায় বস্তুর ধর্ম বিশেষভাবে পরিবর্তিত হয়। এই তাপমাত্রায় সীসায় স্থিতিস্থাপকতা ধর্ম দেখা দেয়, রবার শক্ত এবং ভঙ্গুর হয়ে পড়ে। একটি আঙুর তরল বায়ুতে ডুবিয়ে রাখলে এত শক্ত হয়ে পড়ে যে তাকে গুঁড়ো করতে হাতুড়ি দিয়ে পেটাবার প্রয়োজন হয়। তাপমাত্রা কমার সঙ্গে পরিবাহী বস্তুর রোধ কমতে থাকে।

নাইট্রোজেন চক্র

উদ্ভিদ ও প্রাণীদের বেঁচে থাকার মূলে যেমন অক্সিজেন যা আমরা প্রতি নিঃশ্বাসে গ্রহণ করি, তেমনি আবার উদ্ভিদ ও প্রাণিদেহ গঠনে নাইট্রোজেন একটি মূল উপাদান। উদ্ভিদ প্রোটিন এবং জীব প্রোটিনে নাইট্রোজেনের ভূমিকা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। ফসল ফলানোর জন্য যে সার দরকার, নাইট্রোজেন তারও একটি মূল উপাদান। প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ টন সার তৈরি হচ্ছে এবং ব্যবহার হচ্ছে। এই নাইট্রোজেনের অনেকটাই আসে বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেন থেকে। বায়ুমণ্ডলে অনেক নাইট্রোজেন আছে বটে, তবে এই হারে খরচ করতে থাকলে ফুরিয়ে যাবার সম্ভাবনা বাতিল করা যায় না। তবে প্রকৃতি সব সময় সমতা বজায় রাখার ব্যবস্থা করে, নাইট্রোজেন যেমন খরচ হচ্ছে, তেমনি আবার তৈরিও হচ্ছে।

নাইট্রোজেন সাধারণত খুব সক্রিয় গ্যাস নয়। বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেনের পাশাপাশি থেকেও তার সঙ্গে কোন বিক্রিয়া করে না। কিন্তু বজ্র ও বিদ্যুৎ সংস্পর্শে এলে বা কিছু কিছু ব্যাকৃটিরিয়ার সংস্পর্শে এলে নাইট্রোজেন সক্রিয় হয়।

আকাশে যখন বিদ্যুৎ ক্ষরণ হয়, তখন নাইট্রোজেন অক্সিজেনের সঙ্গে মিলে হয় নাইট্রিক অক্সাইড $N_2+O_2=2NO$। তারপর সেটি অক্সিজেনের সঙ্গে মিলে হয় $2NO+O_2=2NO_2$ নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড। জলের সঙ্গে মিলে $3NO_2+H_2O=2HNO_3+NO$। নাইট্রিক অ্যাসিড বৃষ্টির জলের সঙ্গে পড়ে
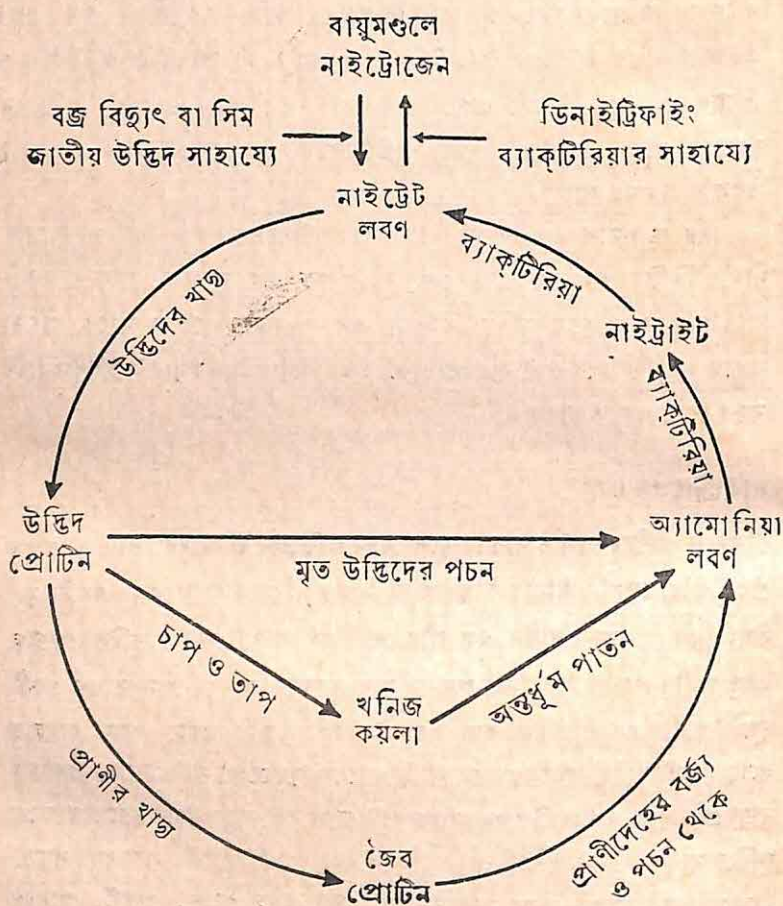
চিত্র 16.3

মাটিতে ক্ষার জাতীয় বস্তুর সংস্পর্শে আসে এবং নাইট্রেটে পরিণত হয়। অনুমান করা হয় যে প্রত্যহ এইভাবে আড়াই লক্ষ টন নাইট্রিক অ্যাসিড বৃষ্টির জলের সঙ্গে মাটিতে পড়ে। এটাই সার, এছাড়া সার আসে চিলির লবণ থেকে ও কৃত্রিম

উপায়ে তৈরি করে। উদ্ভিদ মাটি থেকে এই নাইট্রেট গ্রহণ করে, উদ্ভিদ দেহে প্রোটিন তৈরি করে। শিম জাতীয় কোন কোন উদ্ভিদ সোজাসুজি বায়ুমণ্ডল থেকে নাইট্রোজেন আহরণ করে নিতে পারে। উদ্ভিদ খেয়ে বাঁচে যে সব প্রাণী নাইট্রোজেন তাদের দেহের জীবপ্রোটিনের অংশ হয়ে পড়ে। প্রাণিদেহ থেকে মলমূত্র ও প্রাণিদেহের পচনে তৈরি হয় অ্যামোনিয়া, যা মাটিতে মিশে আবার নাইট্রেটে পরিণত হয়। এর কিছুটা আবার উদ্ভিদ দেহে ফিরে যায়, বাকিটা ডিনাইট্রিফাইং ব্যাকৃটিরিয়ার সাহায্যে নাইট্রোজেন গ্যাসে পরিণত হয়ে বায়ুমণ্ডলে ফিরে যায়। আবার যে সব উদ্ভিদপ্রোটিন প্রচণ্ড চাপে ও তাপে ফসিল হয়ে গিয়েছিল সেগুলি কয়লা হিসেবে খনি থেকে তোলা হচ্ছে। কয়লার অন্তর্ধূম পাতনেও অ্যামোনিয়া তৈরি হয় যার কিছুটা ব্যাকৃটিরিয়ার সাহায্যে নাইট্রোজেনে রূপান্তরিত হয়। 16.3 চিত্রে নাইট্রোজেন চক্র দেখানো হয়েছে। এইভাবেই বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেনের সমতা রক্ষা চলেছে।

কার্বন ডাইঅক্সাইড চক্র

বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাইঅক্সাইড আছে অল্প পরিমাণে, আয়তনের মাত্র 0·033 শতাংশ। কম আছে বলে এর প্রয়োজনীয়তা কিছু কম নয়। কার্বন ডাইঅক্সাইডের একটি বিশেষ ভৌত ধর্ম সূর্যকিরণ থেকে তাপ ধরে রাখা। এর বর্তমান মাত্রা জীবজগতের ঠিক উপযোগী। মাত্রা কমে গেলে সাধারণ তাপমাত্রা এখনকার থেকে কমে যাবে এবং মাত্রা বেড়ে গেলে তাপমাত্রা বাড়বে। সুতরাং খুব বেশি বাড়লে জীবজগতের উপযোগী নাও হতে পারে। গত পঞ্চাশ বছরে পৃথিবীতে কলকারখানা বেড়ে যাওয়ার ফলে প্রতিদিন পরিমাণে অনেক বেশি কয়লা, পেট্রল ও কেরোসিন পোড়ানো হচ্ছে, ফলে বায়ুমণ্ডলে CO_2-র মাত্রা কিছুটা বেড়েছে। অনেকে মনে করেন এজন্য গড় তাপমাত্রাও বেড়েছে।

আবার উদ্ভিদ জগতে খাদ্য প্রস্তুতের প্রধান উপকরণ CO_2। উদ্ভিদ ক্লোরোফিলের সান্নিধ্যে সূর্যালোকে CO_2 ও H_2O থেকে কার্বোহাইড্রেট খাদ্য তৈরি করে—একে বলে **সালোক-সংশ্লেষ** বা ফোটোসিনথেসিস। হিসেব করলে দেখা যাবে পৃথিবীতে যত উদ্ভিদ আছে তাদের বায়ুমণ্ডলের সমস্ত CO_2 খেয়ে ফেলতে লাগবে মাত্র চল্লিশ বছর। কিন্তু তা হয়নি কারণ তার সমতা বজায় রাখার ব্যবস্থা প্রকৃতি করেই রেখেছে। যে হারে CO_2 খরচ হচ্ছে

প্রায় সেই হারেই CO_2 জমা হচ্ছে। খরচ ও জমা কি ভাবে হয় কার্বন ডাইঅক্সাইড চক্রে দেখানো হয়েছে (চিত্র 16.4)।
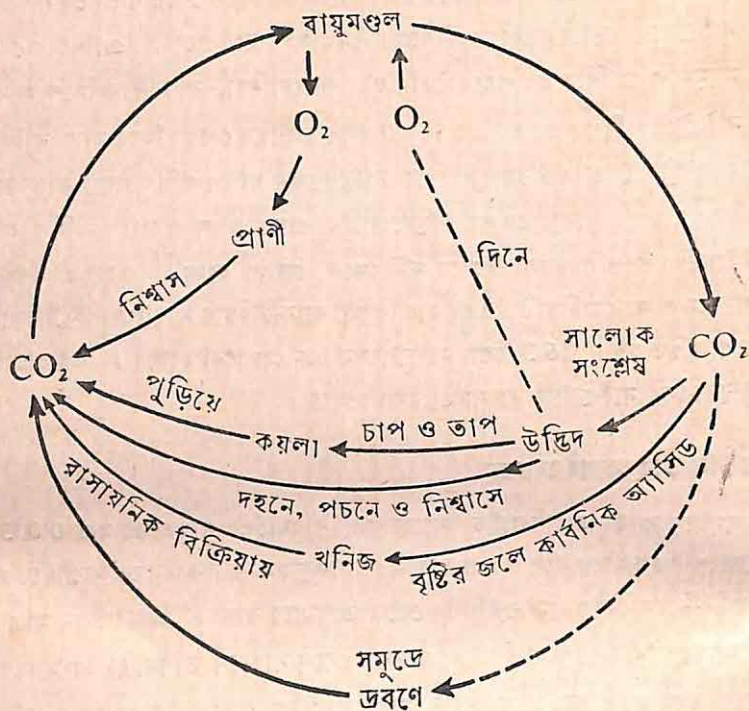
চিত্র 16.4

উদ্ভিদ বায়ুমণ্ডল থেকে CO_2 গ্রহণ করে খাদ্য প্রস্তুত করে। দিনের বেলায় সূর্যালোকে আবার রাতে নিঃশ্বাসের সঙ্গে ছাড়ে, ফলে CO_2 বায়ুমণ্ডলে ফিরে যায়। তাছাড়া উদ্ভিদ দেহ দহনে বা পচনেও CO_2 পরিণত হয়ে বায়ুমণ্ডলে ফিরে যায়। বহু যুগ ধরে উদ্ভিদ দেহে যে কার্বন জমা হয়েছে, চাপে ও তাপে ফসিল কয়লায় পরিণত হয়েছে এবং সেই কয়লা যখন আমরা পোড়াই আবার CO_2 বায়ুমণ্ডলে ফিরে যায়। এছাড়া বায়ুমণ্ডলের থেকে বেশি পরিমাণে CO_2 মজুদ আছে সমুদ্রের জলে দ্রবণে, তার থেকেও CO_2 বেরিয়ে বায়ুমণ্ডলে সমতা বজায় রাখে। অনেক খনিজ যেমন ক্যালসিয়ম কার্বনেট—এগুলি থেকেও কলকারখানায় রাসায়নিক বিক্রিয়ার সময় CO_2 বার হয়ে বায়ুমণ্ডলে মেশে।

তাছাড়া সমস্ত প্রাণী শ্বাস নেয় অক্সিজেন এবং নিঃশ্বাসের সঙ্গে বার করে কার্বন ডাইঅক্সাইড যা বাতাসে ফিরে যায়। এইভাবে বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইডের জমাখরচের সমতা রক্ষা চলে।

বাতাসে বিরল গ্যাস, নিয়ন আলো

বাতাসে আরও কয়েকটি গ্যাসের উপস্থিতির কথা বলা হয়েছে। তাদের মধ্যে আরগন (Ar) বাতাসের আয়তনের 0·934 শতাংশ। এছাড়া আরও কতক-গুলি গ্যাস মৌল অবস্থায় পাওয়া যায়, তাদের শতাংশে প্রকাশ করা হয় না, বলা হয় প্রতি 10 লক্ষ ভাগের হিসাবে অর্থাৎ পার্টস পার মিলিয়ন বা পি পি এম-এ। এই হিসাবে নিয়ন (Ne) 18·18, হিলিয়ম (He) 5·24, ক্রিপটন (Kr) 1·14, জিনন (Xe) 0·087। এত অল্প মাত্রায় পাওয়া যায় বলে এদের **বিরল** বা রেয়ার গ্যাস বলা হয়। তাছাড়া এগুলি নিষ্ক্রিয় অর্থাৎ রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করে না। এই গ্যাসগুলির মধ্যে আরগন খুব দুর্লভ নয়; এটি ইলেকট্রিক বাল্‌বে ব্যবহার করা হয়। একেবারে বায়ুশূন্য করলে বাল্‌বটি ভেঙে যাবার সম্ভাবনা বলে তার মধ্যে অল্প পরিমাণ আরগন গ্যাস দেওয়া হয়। নিষ্ক্রিয় গ্যাস বলে যখন বাল্‌বের ফিলামেণ্ট গরম হয়ে সাদা হয়ে যায় তখনও আরগনের সঙ্গে কোন বিক্রিয়া করে না। নিম্ন চাপে নিয়ন গ্যাসে বিদ্যুৎ ক্ষরণে সুন্দর লালচে আলো হয়। নানান আকারের টিউব তৈরি করে তাতে নিম্নচাপে নিয়ন গ্যাস ভরে বিজ্ঞাপনের কাজে ও সহরের সাজসজ্জায় ব্যবহার হয়। নিয়ন আলো ও ফ্লুরোসেণ্ট আলো কিন্তু এক নয়।

হিলিয়ম সব থেকে নিষ্ক্রিয় গ্যাস। সেইজন্য টাইম ক্যাপসিউল নামে যে সমস্ত পাত্রে ঐতিহাসিক নিদর্শন ভরে মাটির তলায় পোঁতা হয়, সেই পাত্রে হাওয়া সরিয়ে হিলিয়ম গ্যাস ভর্তি করা হয়। হিলিয়ম গ্যাস বাতাসের তুলনায় খুব হালকা। তাই বড় বড় বেলুন আকাশে ওড়ানোর জন্যে ব্যবহৃত হয়। অবশ্য খেলনার বেলুনের জন্য নয়। মহাজাগতিক রশ্মির গবেষণার জন্য যন্ত্রপাতি ও ফোটোগ্রাফিক প্লেট উর্ধ্বাকাশে তোলার জন্য এবং আবহাওয়া সংক্রান্ত নানা গবেষণায় এই ধরনের বেলুন ব্যবহৃত হয়। এখন অবশ্য এর অনেক কাজ রকেটের সাহায্যে করা সম্ভব হয়েছে। হিলিয়ম গ্যাসের স্ফুটনাঙ্ক −269°C এবং হিমাঙ্ক −272·2°C। এর থেকে কম তাপমাত্রায় পৌঁছানো মানুষের পক্ষে

সম্ভব হয়নি। তরল হিলিয়ম যদিও তরল বায়ুর মত ব্যবহার হয় না, তবু দিন দিন এর চাহিদা বাড়ছে। বর্তমানে অনেক গবেষণায় অতি নিম্ন তাপমাত্রার প্রয়োজন হয়। দেখা গেছে তরল হিলিয়মের তাপমাত্রায় পরিবাহীর তড়িৎ রোধ অসম্ভব কমে যায় এবং পরিবাহিতা হাজার হাজার গুণ বাড়ে। এই অবস্থায় তাদের বলে **অতি-পরিবাহী** বা সুপার-কণ্ডাক্টার। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এদের প্রয়োজনীয়তা ক্রমেই বাড়ছে তাই তরল হিলিয়মের চাহিদাও বাড়ছে। কলকাতার সাহা ইন্‌ষ্টিটিউটে গবেষণার উপযোগী হিলিয়ম তরল করার যন্ত্র আছে। বায়ুমণ্ডল ছাড়াও আমেরিকায় প্রাকৃতিক গ্যাসের সঙ্গে হিলিয়ম পাওয়া যায়। তাছাড়া পাওয়া যায় তেজস্ক্রিয় আকরিকে। কলকাতায় ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেসন অফ.সায়েন্সের বিজ্ঞানী ড. শ্যামাদাস চট্টোপাধ্যায় বক্রেশ্বর উষ্ণ প্রস্রবণের মধ্যে হিলিয়ম গ্যাস পেয়েছেন এবং তার থেকে হিলিয়ম আলাদা করার ব্যবস্থা করেছেন।

১৭ কয়েকটি গ্যাসের প্রস্তুত প্রণালী ও তাদের ধর্ম

অক্সিজেন

অক্সিজেন একটি মৌল, সাধারণ তাপমাত্রায় গ্যাস, মুক্ত অবস্থায় বায়ুমণ্ডলে পাওয়া যায়। এছাড়া অন্যান্য মৌলের সঙ্গে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় যৌগ রূপে থাকে। গ্রীক ভাষায় এর অর্থ অ্যাসিড প্রস্তুতকারক। প্রিস্টলি এবং শীলি দুজনেই পৃথকভাবে 1774 খ্রীস্টাব্দে প্রথম অক্সিজেন আবিষ্কার করেন। অক্সিজেনের প্রতীকচিহ্ন O, অণুর সংকেত O_2।

গবেষণাগারে কিভাবে তৈরি হয়—অক্সিজেন তৈরির জন্য যে দুটি যৌগিক পদার্থের প্রয়োজন তাদের নাম পট্যাসিয়ম ক্লোরেট ও ম্যাঙ্গানিজ ডাই-অক্সাইড। বস্তু দুটির সংকেত যথাক্রমে $KClO_3$ এবং MnO_2। এক ভাগ MnO_2 ও পাঁচ ভাগ $KClO_3$ ভালভাবে মিশিয়ে নিয়ে একটি শক্ত কাচের টেস্ট টিউবে রাখ। লক্ষ্য রাখবে কাচের নলটি মিশ্রণে সম্পূর্ণ ভর্তি হয়ে না
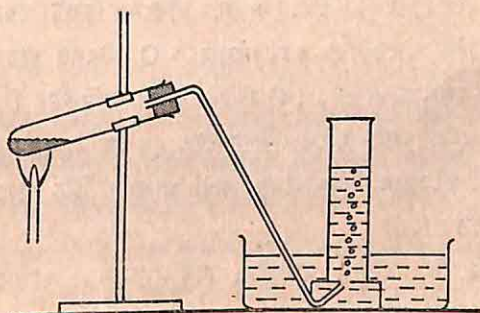
চিত্র 17.1

যায়। টেস্ট টিউবের মুখ ছিপি দিয়ে আটকিয়ে তার ভিতরে একটা নির্গম নল প্রবেশ করাও। নির্গম নলের একটা মুখ জল ভর্তি কাচের পাত্রে রাখ এবং জল ভর্তি একটা গ্যাস জার উলটিয়ে নলের মুখের উপর 17.1 চিত্রে যেভাবে দেখান আছে সে ভাবে রাখ। একটা স্ট্যাণ্ডে টেস্ট টিউব আটকিয়ে রাখ, দেখবে টেস্ট টিউবটা পিছনের দিকে যেন একটু নিচে হেলে থাকে। একটি

বুনসেন দীপের সাহায্যে টিউবের মুখের দিকটা প্রথমে ও পরে আস্তে আস্তে টিউবের সর্বত্র গরম করতে থাক। দেখবে, তাপমাত্রা যখন 200°C – 340°C-এর মাঝে তখন বুদবুদের আকারে নির্গম নলের মুখ দিয়ে গ্যাস বেরিয়ে জারের জল সরিয়ে সেখানে জমা হচ্ছে। গ্যাস যখন জারের জল সম্পূর্ণ সরিয়ে ফেলেছে তখন কাচের একটা ঢাকনির সাহায্যে জারের মুখ বন্ধ করে জারটিকে জল থেকে বার করে এনে সোজা করে বসাও। জারটি এখন অক্সিজেন গ্যাসে ভর্তি।

অক্সিজেন উৎপন্ন হওয়ার সময় $KClO_3$ পরিবর্তনের রাসায়নিক সমীকরণ নিচে দেওয়া হল :

$$2KClO_3 = 2KCl + 3O_2$$
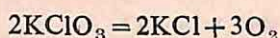
MnO_2 অনুঘটকের কাজ করে অর্থাৎ নিজে পরিবর্তিত হয় না, কিন্তু রাসায়নিক বিক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে। $KClO_3$ কে 370° – 380°C পর্যন্ত উত্তপ্ত করলেও অক্সিজেন পাওয়া যায়, কিন্তু MnO_2 র উপস্থিতিতে এই তাপমাত্রা 200°C – 340°C এর মাঝামাঝি কোন এক তাপমাত্রায় নেমে আসে।

গ্যাস তৈরি করার সময় নিম্নলিখিত বিষয়ে সতর্ক থাকবে— (ক) টিউবের মুখের দিকটা প্রথমে ও পরে পিছনের দিকটা গরম করা উচিত নতুবা পিছনের দিক আগে গরম করলে সেদিকে O_2 উৎপন্ন হয়ে গ্যাসের চাপে নির্গমনলের মুখ বন্ধ হতে পারে। (খ) টিউবটির মুখ খানিকটা পিছনের দিকে ঢালু অবস্থায় রাখা ভাল যাতে নির্গমনলের মুখ বন্ধ না হয়। (গ) MnO_2 বিশুদ্ধ নেওয়া প্রয়োজন। কার্বনের কণা থাকলে উচ্চ তাপে জলে উঠে বিস্ফোরণ ঘটাতে পারে।

ধর্ম—অক্সিজেন বর্ণহীন, স্বাদহীন, গন্ধহীন গ্যাস। বাতাসের চেয়ে অল্প ভারী। প্রাণিজগৎ নিঃশ্বাসের সঙ্গে অক্সিজেন নিয়ে বেঁচে আছে। অক্সিজেন জলে অল্প দ্রবীভুত হয়। এই দ্রবীভূত অক্সিজেন মাছেরা বা অন্য জলজ প্রাণীরা জল থেকে নিয়ে বেঁচে থাকে। সোনা, রুপো প্রভৃতি কয়েক ধরনের ধাতু অতি উচ্চ তাপমাত্রায় অক্সিজেন শোষণ করতে ও নিম্ন তাপমাত্রায় এই গ্যাস আবার বর্জন করতে পারে। হাইড্রোজেন গ্যাসের সঙ্গে যুক্ত হয়ে জল তৈরি করে। $2H_2 + O_2 = 2H_2O$। অক্সিজেন নিজে দাহ্য বস্তু নয় কিন্তু দহন কাজে সাহায্য করে। −183°C তাপমাত্রায় অক্সিজেন গ্যাস নীলাভ তরলে পরিণত হয়

এবং $-218.4^{o}C$ তাপমাত্রায় নীলাভ কেলাসিত কঠিন বস্তুতে পরিণত হয়। আমরা যে খাবার খাই নিঃশ্বাসের নেওয়া অক্সিজেনের সঙ্গে তার রাসায়নিক বিক্রিয়ায় দেহের প্রয়োজনীয় তাপ উৎপন্ন হয়। অক্সিজেন রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অত্যন্ত সক্রিয়। অধিকাংশ বস্তুর সঙ্গে অক্সিজেনের বিক্রিয়া হয়। অক্সিজেন জারক বস্তু। $C+O_2=CO_2$

ব্যবহার—(ক) শ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট হচ্ছে এমন রোগীর জন্য অক্সিজেন ব্যবহার করা হয়। (খ) হাইড্রোজেনের সঙ্গে মিশিয়ে জ্বালালে $2800^{o}C$ তাপমাত্রা উৎপন্ন হয়। এই শিখাকে অক্সি-হাইড্রোজেন শিখা বলে। এই তাপমাত্রায় প্ল্যাটিনম ধাতুও গলে। অক্সি-হাইড্রোজেন শিখা খুব সাবধানে ব্যবহার করতে হয় কারণ বিস্ফোরণের সম্ভাবনা থাকে। (গ) অ্যাসিটিলিন গ্যাসের সঙ্গে মিশিয়ে জ্বালালে প্রায় $3300^{o}C$ তাপমাত্রা উৎপন্ন হয়। অক্সিঅ্যাসিটিলিন শিখা কারখানার ধাতুর মোটা পাত গলিয়ে কাটার কাজে বা ওয়েল্ডিং করতে ব্যবহৃত হয়। (ঘ) বিভিন্ন যৌগ বস্তু তৈরির জন্য অক্সিজেন ব্যবহার করা হয়।

হাইড্রোজেন

হাইড্রোজেন একটি মৌল, সাধারণ তাপমাত্রায় গ্যাসীয় পদার্থ। পদার্থের মধ্যে সবচেয়ে হালকা। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগেই বিজ্ঞানীরা এর খোঁজ পান। 1781 খ্রীস্টাব্দে ব্রিটিশ বিজ্ঞানী ক্যাভেণ্ডিশ দেখান যে অক্সিজেনের সঙ্গে হাইড্রোজেন যুক্ত হয়ে জল তৈরি হয়। তিনি নাম দেন জ্বলন গ্যাস বা ইনফ্ল্যামেবল গ্যাস। 1788 খ্রীস্টাব্দে লাভয়সিয়ে প্রথম হাইড্রোজেন নাম দেন। গ্রীক ভাষায় এর অর্থ জল উৎপাদক। হাইড্রোজেন বায়ুমণ্ডলে মুক্ত অবস্থায় কম পাওয়া যায়। আগ্নেয়গিরি থেকে বেরিয়ে আসা গ্যাসে, খনি অঞ্চলের গ্যাসে পাওয়া যায়। জানা গেছে সূর্য ও অন্যান্য নক্ষত্রদেহে মুক্ত অবস্থায় হাইড্রোজেন থাকে। হাইড্রোজেন জল, অ্যাসিড, ক্ষারক ও অন্যান্য অনেক যৌগিক পদার্থের অন্যতম উপাদান। হাইড্রোজেনের প্রতীক চিহ্ন H, অণুর সংকেত H_2।

গবেষণাগারে কি ভাবে তৈরি হয়—গবেষণাগারে H_2 তৈরির সব থেকে সাধারণ উপাদান অশুদ্ধ অর্থাৎ বাজারে কেনা দস্তা এবং লঘু সালফিউরিক

অ্যাসিড। ছবিতে (চিত্র 17.2) দু মুখের যে বোতল দেখতে পাচ্ছ তার নাম উল্‌ফ বোতল। এই রকম একটা বোতল নাও। এক মুখে একটা দীর্ঘ নল ফানেল অন্যমুখে একটা নির্গম-নল ছিপির সাহায্যে আটকাও। ছিপি বন্ধ করার আগেই বোতলের ভিতর কয়েক টুকরো বাজার থেকে কেনা দস্তার টুকরো রাখ। দীর্ঘ-নল ফানেলের ভিতর দিয়ে বোতলের মধ্যে জল ঢাল যেন ফানেলের নিচের প্রান্ত জলে ডুবে থাকে কিন্তু নির্গম-নলের নিচের প্রান্ত জলের উপরে থাকে। হাইড্রোজেন, অক্সিজেনের সংস্পর্শে এলে বিস্ফোরণ ঘটতে পারে সেজন্য বোতলের মুখ দিয়ে যাতে বাতাস যেতে না পারে তার জন্য
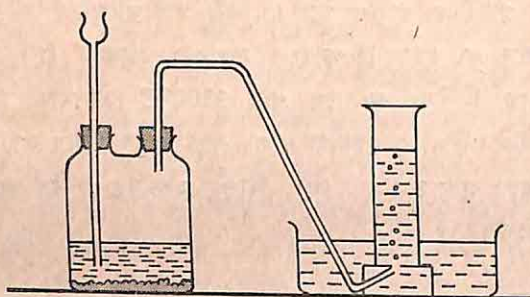
চিত্র 17.2

সব রকম ব্যবস্থা নিতে হবে। বোতলটি বায়ু-নীরন্ধ্র কিনা হাইড্রোজেন উৎপন্ন হওয়ার আগে পরীক্ষা করে দেখে নেওয়া ভাল। নির্গম-নলের মুক্ত প্রান্তে মুখ দিয়ে ফুঁ দিলে দেখতে পাবে দীর্ঘ-নল ফানেলের নল দিয়ে জল কিছুটা উপরে উঠেছে। এই বার হাত দিয়ে মুখপ্রান্ত চেপে ধরে দেখ নলে জলের উচ্চতা নেমে আসছে কিনা। যদি না নামে তবে বোতলটি বায়ু-নীরন্ধ্র। এইবার ফানেলে লঘু সালফিউরিক অ্যাসিড ঢাললেই বুদবুদের আকারে হাইড্রোজেন উৎপন্ন হতে দেখা যাবে। রাসায়নিক বিক্রিয়া

$$Zn + H_2SO_4 = ZnSO_4 + H_2 \uparrow$$
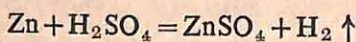
এইবার নির্গম-নলের মুক্ত প্রান্ত একটি জলপূর্ণ পাত্রে রেখে তার উপর একটা জলভরা জার উলটিয়ে রাখলে হাইড্রোজেন গ্যাস জারের জল সরিয়ে ভিতরে এসে জমা হবে। সম্পূর্ণ জল সরে গেলে কাচের একটা ঢাকনি দিয়ে জারের মুখ বন্ধ করে সোজা করে বসাও। জারটি এখন হাইড্রোজেন ভর্তি।

কি বিষয়েসতর্ক হবে—উল্ফ বোতলের ভিতর বায়ুশূন্য আছে কিনা দেখা দরকার। কারণ হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন মিশ্রণ অত্যন্ত বিস্ফোরক।

ধর্ম—হাইড্রোজেন গ্যাস বর্ণহীন, স্বাদহীন এবং গন্ধহীন। সমস্ত মৌলিক পদার্থের মধ্যে সবচেয়ে হালকা। বাতাস হাইড্রোজেনের চেয়ে প্রায় চোদ্দগুণ ভারী। —252·7°C এর নিচে তরল ও —259°C এর নিচে কঠিন বস্তুতে পরিণত হয়। তরল হাইড্রোজেন সমস্ত তরলের মধ্যে সবচেয়ে হালকা। কেলাসিত কঠিন হাইড্রোজেনের ঘনাঙ্ক 0·008 g/cc। H_2 জলে দ্রবীভূত হয় না বললেই চলে। হাইড্রোজেন দাহ্য বস্তু এবং শিখার রঙ অতি হালকা নীল। যখন জলে তখন অক্সিজেনের সঙ্গে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় জল উৎপাদন করে। হাইড্রোজেন অতি উত্তম বিজারক। $CuO + H_2 = Cu + H_2O$। নিকেল, কোবাল্ট, সোনা, রুপো বিশেষ করে প্যালেডিয়ম ধাতু হাইড্রোজেন শোষণ করতে পারে এবং অল্প উত্তাপ দিলে আবার বার করে দিতে পারে। একে অন্তর্ধৃতি বা অক্লুসান বলে।

ব্যবহার—(ক) অক্সি-হাইড্রোজেন শিখা তৈরিতে ব্যবহার হয়, (খ) জৈব ও অজৈব তেলের সঙ্গে ব্যবহার করে বনস্পতি তৈরি করা হয় যা আমরা রান্নায় ব্যবহার করি, (খ) হালকা বলে বেলুনে ব্যবহার করা হয়, (ঘ) বিভিন্ন যৌগিক বস্তু তৈরির কাজে লাগে।

নাইট্রোজেন

নাইট্রোজেন একটি মৌল, সাধারণ তাপমাত্রায় গ্যাস। এই গ্যাসের প্রথম সন্ধান পান ড্যানিয়েল রাদারফোর্ড নামে একজন বিজ্ঞানী 1772 খ্রীস্টাব্দে। নাইট্রোজেন দাহ্য বস্তু নয় এবং নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের কাজে না লাগায় তিনি এর নাম দেন বিষাক্ত বায়ু। একটি ইঁদুর নিয়ে পরীক্ষা করে দেখান এতে প্রাণী বাঁচতে পারে না। লাভয়সিয়ে নাম দেন 'নিষ্প্রাণ বায়ু'। শীলি 1772 খ্রীস্টাব্দে রাদারফোর্ডের সমসাময়িক কালে এর নাম দেন 'অপবায়ু'। সোরা বা নাইটার থেকে এই গ্যাস তৈরি করে প্রথম নাইট্রোজেন নাম দেন চ্যাপটাল নামে একজন বিজ্ঞানী। বাতাসে মুক্ত অবস্থায় নাইট্রোজেন পাওয়া যায়। বায়ুমণ্ডলের প্রায় শতকরা 78 ভাগ নাইট্রোজেন। অনুমান 4×10^{15} টন নাইট্রোজেন বাতাসে মজুত আছে। আগ্নেয়গিরি থেকে বেরিয়ে আসা গ্যাসে ও খনির

ভিতরেও মুক্ত নাইট্রোজেন পাওয়া যায়। এছাড়া অসংখ্য জৈব ও অজৈব পদার্থের সঙ্গে যৌগিক অবস্থায় নাইট্রোজেন থাকে। প্রোটিনের মূল উপাদান নাইট্রোজেন। নাইট্রোজেনের প্রতীক N এবং অণুর সংকেত N_2।

গবেষণাগারে কি ভাবে তৈরি হয়—গবেষণাগারে নাইট্রোজেন যে দুটি যৌগিক পদার্থ থেকে তৈরি হয় তাদের নাম নিশাদল বা অ্যামোনিয়ম ক্লোরাইড ও সোডিয়ম নাইট্রাইট। একটা ছোট ফ্লাস্কে এই দুইটি যৌগিক পদার্থের মিশ্রণের একটি গাঢ় দ্রবণ নাও। ফ্লাস্কের মুখ ছিপি দিয়ে আটকিয়ে তার ভিতর দিয়ে একটা দীর্ঘ-নল ফানেল ও একটা নির্গম নল প্রবেশ করাও (চিত্র 17.3)। লক্ষ্য রাখবে দীর্ঘ-নল ফানেলের নিচের প্রান্ত দ্রবণে ভালভাবে ডুবে থাকে। নির্গমনলের প্রান্ত একটা জলভরা পাত্রে ডুবিয়ে রাখ এবং ফ্লাস্কের ভিতরের প্রান্ত তরলের বেশ উপরে রাখ। এবারে বুনসেন দীপের সাহায্যে ফ্লাস্কটিকে ধীরে ধীরে গরম করতে থাক। নাইট্রোজেন গ্যাস বেরিয়ে
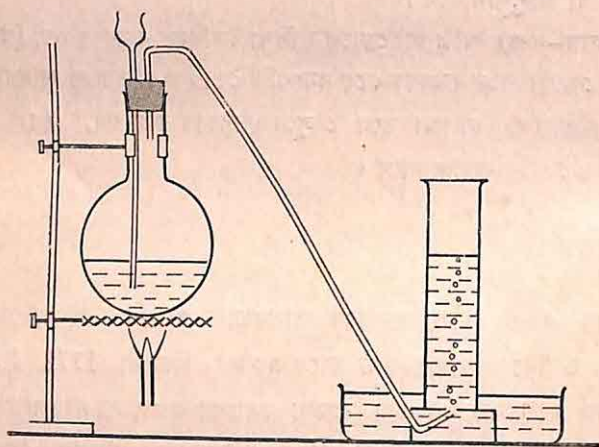
চিত্র 17.3

আসা মাত্র বুনসেন দীপ সরিয়ে নাও। জলভরা গ্যাস জার নির্গম নলের মুখে উলটিয়ে ধরলে নাইট্রোজেন গ্যাস জারের জল সরিয়ে ভিতরে এসে জমা হতে থাকবে। যখন জল সম্পূর্ণ সরে যাবে একটি ঢাকনির সাহায্যে জারের মুখ বন্ধ করে জারটিকে সোজা করে বসাও। জারে এখন যে নাইট্রোজেন গ্যাস সংগ্রহ করা হল তাতে কিছু পরিমাণ জলীয় বাষ্প ও অল্প পরিমাণ নাইট্রিক-অক্সাইড

গ্যাস (NO) থাকবে। গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিডের সাহায্যে জলীয় বাষ্প এবং উত্তপ্ত তামার চোকলার সাহায্যে নাইট্রিক-অক্সাইড গ্যাস দূর করা হয়। নাইট্রোজেন বেরিয়ে আসার সময়ের রাসায়নিক বিক্রিয়া নিচে দেওয়া হল—

$$NH_4Cl + NaNO_2 = NH_4NO_2 + NaCl$$

আবার, $NH_4NO_2 = N_2 + 2H_2O$।
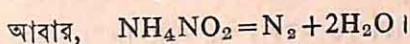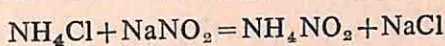
অ্যামোনিয়ম নাইট্রাইট সরাসরি গরম করলেও নাইট্রোজেন পাওয়া যায় কিন্তু রাসায়নিক বিক্রিয়া এত দ্রুত হয় যে বিস্ফোরণ হতে পারে।

কি কি বিষয়ে সতর্ক হবে—(ক) বুনসেন দীপ প্রয়োজন মত ফ্লাস্কের নিচে এনে বা সরিয়ে নিয়ে তাপ নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন। (খ) দীর্ঘ-নল ফানেলের নিচের প্রান্ত তরলে ডুবে থাকা দরকার। গ্যাসের চাপ বেড়ে গিয়ে নলের ভিতর দিয়ে তরল উপরে উঠলে তাপ-নিয়ন্ত্রণ করে চাপ কমানো প্রয়োজন। নতুবা বিস্ফোরণ হতে পারে।

ধর্ম—নাইট্রোজেন বর্ণহীন, গন্ধহীন, স্বাদহীন গ্যাস। বাতাসের চেয়ে অল্প হালকা এবং জলে খুব কম মাত্রায় দ্রবীভূত হয়। নাইট্রোজেন গ্যাস নিঃশ্বাস প্রশ্বাসে সাহায্য করে না তবে নিজে বিষাক্ত নয়। সাধারণ তাপমাত্রায় পদার্থের সঙ্গে যৌগ গঠনের প্রবণতা কম। তবে উচ্চ তাপমাত্রায় অক্সিজেন ক্যালসিয়ম, ম্যাগনেসিয়ম প্রভৃতির সঙ্গে রাসায়নিক ভাবে যুক্ত হয়। 1000°C তাপমাত্রায় নাইট্রোজেন অক্সিজেনের সঙ্গে যুক্ত হয়।

$$N_2 + O_2 \rightleftharpoons 2NO$$।
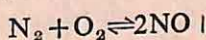
Ca, Mg, Al প্রভৃতি ধাতু লাল উত্তপ্ত অবস্থায় নাইট্রোজেন শোষণ করে।

$$3Ca + N_2 = Ca_3N_2$$।

$$3Mg + N_2 = Mg_3N_2$$।
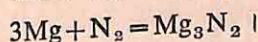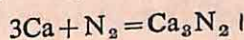
নাইট্রোজেন দাহ্য নয় এবং দহন কাজে সাহায্য করে না। −195·8°C তাপমাত্রায় তরলে এবং −207·8°C তাপমাত্রায় কঠিনে পরিণত হয়।

ব্যবহার—অ্যামোনিয়া, নাইট্রিক অ্যাসিড, জমির সার প্রভৃতি তৈরির কাজে লাগে। কিছু কিছু বিস্ফোরক তৈরির কাজে নাইট্রোজেন ব্যবহার হয়।

অ্যামোনিয়া

মধ্য এশিয়ার আগ্নেয়গিরিগুলি থেকে নিশাদল (NH_4Cl) এবং অ্যামোনিয়ম

সালফেট $(NH_4)_2SO_4$ পাওয়া যেত। প্রাচীনকালে এইগুলি ক্ষারকের সঙ্গে মিশিয়ে গরম করে অ্যামোনিয়া সংগ্রহ করা হত। প্রাচীন মিশর দেশে উটের মলমূত্র পুড়িয়ে অ্যামোনিয়া সংগ্রহ করার রীতি ছিল। 1774 খ্রীস্টাব্দে প্রিস্টলি এই গ্যাস প্রস্তুত করেন ও নাম দেন 'ক্ষারীয় বাতাস'। অ্যামোনিয়া নাম দেন অষ্টিন 1788 খ্রীস্টাব্দে। বাতাসে মুক্ত অবস্থায় অল্প অ্যামোনিয়া পাওয়া যায়। অগ্ন্যুৎপাতের সঙ্গে অ্যামোনিয়ম লবণ পাওয়া যায়। উদ্ভিদে, প্রাণিদেহে, রক্তে, মলমূত্রে খুব অল্প পরিমাণ অ্যামোনিয়া লবণ পাওয়া যায়। জৈব বস্তু যথা হাড়, শিং প্রভৃতি গরম করলে বা জীবজন্তু বা গাছপালা পচলে অ্যামোনিয়া হয়। পচা বস্তু থেকে যে ঝাঁঝালো গন্ধ আসে সেটা অ্যামোনিয়া গ্যাসের। অ্যামোনিয়া লেখা হয় NH_3 সংকেত দিয়ে।

গবেষণাগারে কিভাবে তৈরি হয়—পরীক্ষাগারে যে কোন অ্যামোনিয়া লবণকে যে কোন তীব্র ক্ষারকের সঙ্গে মিশিয়ে গরম করলেই অ্যামোনিয়া গ্যাস পাবে। এক ভাগ নিশাদল অর্থাৎ অ্যামোনিয়ম ক্লোরাইডের সঙ্গে তিন ভাগ গুঁড়ো কলিচুন বা ক্যালসিয়ম হাইড্রক্সাইড $Ca(OH)_2$ মেশাও এবং একটা ফ্লাস্কের মুখ ছিপি দিয়ে আটকাও ও ভিতরে একটা নির্গম নল প্রবেশ করাও।
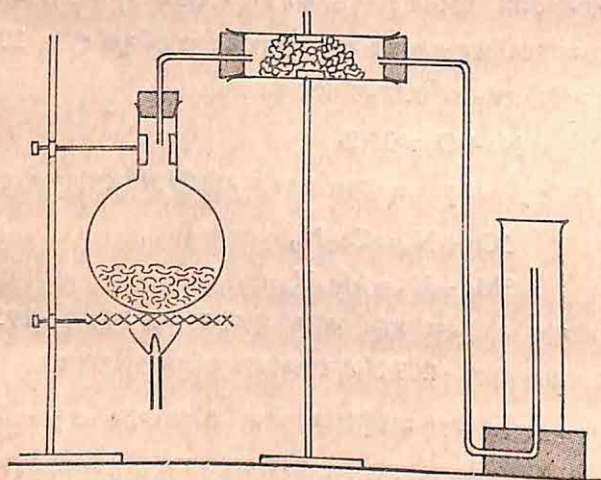
চিত্র 17.4

ফ্লাস্কটি একটা স্ট্যাণ্ডে আটকানো তারের জালের উপর রাখ যাতে নিচে থেকে বুনসেন দীপ দিয়ে গরম করা যায়। নির্গম নলের এক প্রান্ত কর্কের একটু নিচে

প্রবেশ করা অবস্থায় আছে এবং অন্যপ্রান্ত ক্যালসিয়ম অক্সাইডপূর্ণ (CaO) একটি কাচের লম্বা দুমুখো নলে লাগান আছে (চিত্র 17.4)। এই লম্বা নলের অপর মুখে ছিপির ভিতর দিয়ে নির্গমনল বেরিয়ে এসেছে। CaO বা চুনা পাথর NH_3 গ্যাসকে শুষ্ক করে। এইবারে ফ্লাস্কটি বুনসেন দীপ দিয়ে গরম করতে থাক।

গ্যাস উৎপন্ন হয়ে লম্বা পাত্রের ভিতরের ক্যালসিয়ম অক্সাইডের ভিতর দিয়ে বেরিয়ে আসবে। একটি উলটিয়ে রাখা জারে নির্গম নল ধরলে NH_3 গ্যাস বাতাস সরিয়ে সেখানে জমা হতে থাকবে। কিছুক্ষণ পর একটি লাল লিটমাস কাগজ জারের মুখে ধরলে যদি নীল হয় তবে বোঝা যাবে জারটি অ্যামোনিয়া গ্যাসে ভর্তি হয়েছে। এইবার একটা ঢাকনি দিয়ে জারের মুখ ঢেকে উলটিয়ে রাখলেই এক জার NH_3 গ্যাস পাওয়া যাবে। NH_3 উৎপন্ন হওয়ার সময়ে রাসায়নিক বিক্রিয়া নিচে দেওয়া হল।

$$2NH_4Cl+Ca(OH)_2=CaCl_2+2NH_3+2H_2O$$
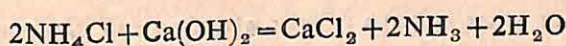
ধর্ম—অ্যামোনিয়ার কোন রঙ নেই, তীব্র ঝাঁঝালো গন্ধ আছে। চোখে লাগলে প্রায় জল আসে। সহজেই জলে দ্রবীভূত হয় এবং দ্রবণ অ্যামোনিয়ম হাইড্রক্সাইডে পরিণত হয়। $NH_3+H_2O=NH_4OH$। সেইজন্য জল সরিয়ে সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। তরলে দ্রবীভূত অবস্থায় স্বাদ ক্ষার সাবানের মত। সহজেই গ্যাস থেকে তরলে পরিণত করা যায়। গলনাঙ্ক $-77{\cdot}7°C$ স্ফুটনাঙ্ক $-33.4°C$। অ্যামোনিয়া দাহ্য বস্তু নয় বা দহনে সহায়তা করে না। অক্সিজেনের সঙ্গে মিশিয়ে জ্বালালে হলুদ রঙের শিখা নিয়ে জ্বলে। $4NH_3+3O_2=6H_2O+2N_2$। অক্সিজেন ও অ্যামোনিয়ার মিশ্রণ বিস্ফোরক। অ্যামোনিয়া একটি ক্ষারক, লাল লিটমাস কাগজ নীল করে এবং অ্যাসিডের সঙ্গে যৌগিক লবণ তৈরি করে।

ব্যবহার—তরল অ্যামোনিয়া বরফ তৈরির কাজে লাগে। জলে দ্রবীভূত অ্যামোনিয়া তৈলাক্ত ময়লা পরিষ্কারের কাজে লাগে। এছাড়া সার, নাইলন, রবার, স্মেলিং সল্ট এবং বহু প্রকার লবণ তৈরির কাজে লাগে।

কার্বন ডাইঅক্সাইড

কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস প্রথম প্রস্তুত করেন ভ্যান হেলমোন্ট 1630 খ্রীস্টাব্দে, কিন্তু গ্যাসটির সঠিক পরিচয় তিনি জানতেন না। 1783 খ্রীস্টাব্দে লাভয়সিয়ে

এটি যে কার্বনের অক্সাইড তা বুঝতে পারেন। কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস মুক্ত অবস্থায় বাতাসে পাওয়া যায়। উনুন, বা বড় বড় চুল্লির ধোঁয়া থেকে প্রাণীদের নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে অনবরত বাতাসে এসে মিশছে। চুনাপাথর কোন রকমে অ্যাসিডের সংস্পর্শে এলে এই গ্যাস তৈরি হয়। জলে কার্বন ডাইঅক্সাইড দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে। পৃথিবীর ভিতর থেকেও কোন কোন জায়গায় কার্বন ডাইঅক্সাইড বেরিয়ে আসে। যবদ্বীপের 'বিষাক্ত উপত্যকায়' এবং নেপলসের একস্থানে এই গ্যাস জমা হয় এবং কোন জীবজন্তু সেখানে গেলে মারা যায়। চিনি ও মদ তৈরির সময়ও কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন হয়। কার্বন ডাইঅক্সাইডের সংকেত CO_2।

গবেষণাগারে কি ভাবে তৈরি হয়—কয়েক টুকরো চুনা পাথর ও কিছু জল একটা উল্ফ বোতলে নাও। বোতলের এক মুখে ছিপির সাহায্যে একটা দীর্ঘ-নল ফানেল আটকাও। লক্ষ্য রাখবে ফানেলের নিচের প্রান্ত জলে ডুবে থাকে। বোতলের অন্য মুখে একটা নির্গম নল ছিপির সাহায্যে আটকাও (চিত্র 17.5)। এইবার ফানেলে লঘু হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ঢাল। দেখবে বুদবুদের আকারে গ্যাস উৎপন্ন হচ্ছে। নির্গম নলের নিচে একটি গ্যাস জারের মুখ ধরলেই জারে কার্বন ডাইঅক্সাইড জমা হতে থাকবে। কার্বন
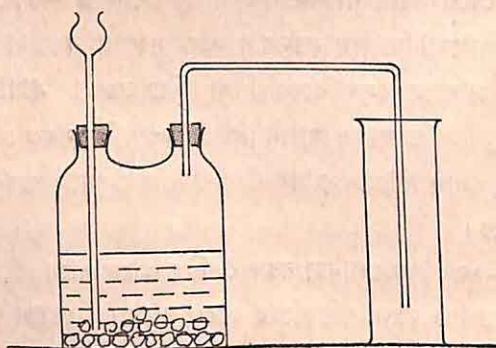
চিত্র 17.5

ডাইঅক্সাইড বাতাসের চেয়ে ভারী হাওয়ায় বাতাস সরিয়ে সেখানে জমা হবে। রাসায়নিক বিক্রিয়া দেওয়া হল :

$$CaCO_3 + 2HCl = CaCl_2 + CO_2 + H_2O$$
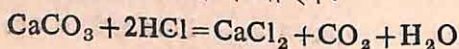
এই গ্যাসে কিছু পরিমাণ HCl বাষ্প থাকে। উৎপন্ন গ্যাসকে সোডিয়ম বাইকার্বনেটের দ্রবণের ভিতর প্রবেশ করিয়ে পরে গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিডের ভিতর দিয়ে প্রবেশ করালে HCl বাষ্প ও জলকণা দূর করা সম্ভব হবে।

ধর্ম—কার্বন ডাইঅক্সাইড একটি বর্ণহীন গ্যাস। অল্প ঝাঁঝালো গন্ধ আছে এবং স্বাদ ঈষৎ অম্ল। বাতাসের চেয়ে 1·53 গুণ ভারী। এই গ্যাস বিষাক্ত নয় কিন্তু এতে শ্বাস গ্রহণ করা সম্ভব নয়। এই গ্যাস নিজে দহনশীল নয় এবং দহনে সাহায্য করে না। এই জন্য আগুন নেভানোর কাজে এই গ্যাস ব্যাপক ভাবে ব্যবহার করা হয়। বড় বড় অফিসে বা কারখানায় লাল রঙের শংকুর মত যে সব আগুন নেভানো যন্ত্র তোমরা দেখতে পাও তার ভিতর প্রয়োজনের সময় কার্বন ডাইঅক্সাইড প্রস্তুত করা হয়। কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস বেশ পরিমাণে জলে দ্রবীভূত হয় এবং কিছুটা কার্বনিক অ্যাসিডে পরিণত হয়। $CO_2+H_2O=H_2CO_3$। এই দ্রবণ নীল লিটমাস কাগজকে লাল করে। তাপ ও চাপের সঙ্গে দ্রবণের পরিমাণ বাড়ে। সোডা ওয়াটারে কার্বন ডাই-অক্সাইড দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে, সোডা নয়। এই গ্যাস তরল ও কঠিন বস্তুতে পরিণত করা যায়। কঠিন কার্বন ডাইঅক্সাইডের নাম 'ড্রাই আইস' বা শুকনো বরফ। মাছ বা পচনশীল বস্তুর পচন বন্ধ করতে ব্যবহার করা হয়। 'ড্রাই আইসের' সুবিধা ঊর্ধ্বপাতনে একেবারে গ্যাসে পরিণত হয়।

ব্যবহার—(ক) কাপড় কাচা সোডা (সোডিয়ম কার্বনেট), সোডা ওয়াটার প্রভৃতি তৈরিতে লাগে। (খ) আগুন নেভানোর কাজে লাগে। (গ) পচনশীল বস্তুকে পচনের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য ড্রাই আইস কাজে লাগে।

সালফার ডাইঅক্সাইড

গন্ধকের ইংরেজী নাম সালফার এবং সালফারের একটি অক্সাইডের নাম সালফার ডাইঅক্সাইড। মৃত মানুষের দেহে পচন বন্ধ করার জন্য এই গ্যাসের ব্যবহারের উল্লেখ হোমারের কাব্যে আছে। প্রাচীনকালে নতুন কাপড়কে বিশুদ্ধ বা বিরঞ্জন করার জন্য সালফার ডাইঅক্সাইড গ্যাস ব্যবহার করা হত। সেকালে এর নাম ছিল হীরাকষ তেল। 1774 খ্রীস্টাব্দে প্রিস্টলি পারদের সঙ্গে গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিড গরম করে এই গ্যাস পান কিন্তু কোন উপাদানে গ্যাসটি

তৈরি তিনি জানতেন না। 1777 খ্রীস্টাব্দে লাভয়সিয়ে এর উপাদানগুলি জানতে পারেন এবং এর রাসায়নিক সংকেত দেন SO_2। বাতাসে গন্ধক পোড়ালেই সালফার ডাইঅক্সাইড গ্যাস পাওয়া যায়।

গবেষণাগারে কিভাবে তৈরি হয়—একটি ফ্লাস্কে কিছু তামার চোকলা ও গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিড নাও (চিত্র 17.6)। ফ্লাস্কটির মুখের ছিপির ভিতর দিয়ে একটি দীর্ঘ-নল ফানেল ও একটি নির্গমনল প্রবেশ করাও। ধীরে ধীরে তাপ দিলে গ্যাস উৎপন্ন হতে শুরু করবে। গ্যাস উৎপন্ন হওয়া মাত্র বুনসেন দীপশিখা সরিয়ে নেওয়া দরকার। নির্গমনলের মুখে একটা গ্যাস জার সোজাভাবে ধরলেই SO_2 সেখানে জমা হতে থাকবে। বাতাসের চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ ভারী হওয়ায় বাতাস সরিয়ে SO_2 গ্যাস সেখানে জমা হবে। এই সঞ্চিত গ্যাসে কিছু পরিমাণ সালফার ট্রাইঅক্সাইড থাকায় প্রথমে জল ও পরে গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিডের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত করতে হয়। ফলে উৎপন্ন গ্যাস বিশুদ্ধ ও শুষ্ক হয়।
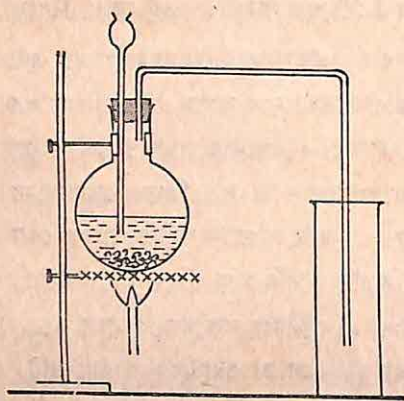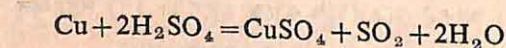
চিত্র 17.6

$$Cu+2H_2SO_4=CuSO_4+SO_2+2H_2O$$

ধর্ম—সালফার ডাইঅক্সাইড বর্ণহীন, পোড়া গন্ধকের মত ঝাঁঝালো গন্ধযুক্ত এবং বিষাক্ত গ্যাস। জলে সহজেই দ্রবণীয় এবং দ্রবণ সালফিউরাস অ্যাসিডে পরিণত হয়। $SO_2+H_2O \rightleftharpoons H_2SO_3$ বাতাসের চেয়ে প্রায় 2·3 গুণ ভারী। নিজে দহনশীল নয় এবং সাধারণত দহনে সাহায্য করে না। তবে উত্তপ্ত পটাসিয়ম, উত্তপ্ত টিন বা লোহার গুঁড়ো এতে জলতে পারে। বরফ ও লবণের হিম মিশ্রণের সাহায্যে $-10°C$ এর নিচে এনে অতি সহজেই তরলে পরিণত করা যায়। $-72·7°C$ এর নিচে কঠিন বস্তুতে পরিণত হয়। তাপের প্রয়োগে SO_2 ভেঙে গিয়ে অক্সিজেন উৎপন্ন হয়। ক্ষারের সঙ্গে বিক্রিয়ায়

যৌগিক লবণ তৈরি করে।

$$NaOH + SO_2 = NaHSO_3$$

$$NaHSO_3 + NaOH = NO_2SO_3 + H_2O$$
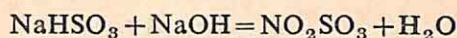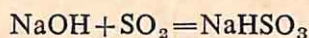
এই গ্যাস একটি বিজারক বস্তু।

ব্যবহার—কীটনাশক হিসেবে ব্যবহার হয়ে থাকে। বসন্ত বা কলেরা রোগীর ঘরে গন্ধকের ধুনো দিতে নিশ্চয়ই দেখেছ। গন্ধক পুড়ে সালফার ডাইঅক্সাইড তৈরি হয়। SO_2 কীটনাশক। জৈব বস্তুর রঙ পালটায় অর্থাৎ বিরঞ্জক বা ব্লিচিং এজেন্ট হিসাবে কাজ করে। একটা জবা ফুলকে গন্ধকের ধুনোয় কিছুক্ষণ ধরলেই দেখাবে লাল রঙ ক্রমশ মিলিয়ে যাচ্ছে। কাপড় জামা বা কাগজ তৈরিতে বিরঞ্জক হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

সালফিউরেটেড হাইড্রোজেন বা হাইড্রোজেন সালফাইড

ডিমের সাদা অংশ বা গন্ধক আছে এমন কোন শাকসবজি কোন জায়গায় পচলে একটা তীব্র গন্ধ নাকে আসে। এটিই হাইড্রোজেন সালফাইড বা সালফিউরেটেড হাইড্রোজেন গ্যাস। আগ্নেয়গিরি থেকে বেরিয়ে আসা গ্যাস ও অনেক ঝরনার জলে সামান্য পরিমাণে দ্রবীভূত অবস্থায় এই গ্যাস পাওয়া যায়। ফুটন্ত গন্ধকের ভিতর হাইড্রোজেন গ্যাস প্রবাহিত করলে এই গ্যাস পাওয়া যায়। লেখা হয় H_2S সংকেত দিয়ে।

গবেষণাগারে কিভাবে তৈরি হয়—একটি উল্ফ বোতলে কিছু ফেরাস সালফাইড নাও। বোতলের এক মুখে একটি দীর্ঘনল ফানেল ও অন্য মুখে একটি নির্গম নল লাগাও। এইবার ফানেলের মুখ দিয়ে ফেরাস সালফাইডের প্রায় তিনগুণ লঘু হাইড্রোক্লোরিক বা লঘু সালফিউরিক অ্যাসিড ঢাল। দেখবে H_2S গ্যাস উৎপন্ন হচ্ছে। রাসায়নিক বিক্রিয়া হল :

$$FeS + 2HCl = H_2S + FeCl_2$$ (ফেরাস ক্লোরাইড)।

$$FeS + H_2SO_4 = H_2S + FeSO_4$$ (ফেরাস সালফেট)।

বাতাসের চেয়ে অল্প ভারী হওয়ায় গ্যাস জারে নির্গমনলের ভিতর দিয়ে এসে জমা হতে থাকবে।

পরীক্ষাগারে রাসায়নিক বিশ্লেষণের জন্য H_2S গ্যাস অত্যন্ত প্রয়োজন হয়।

অধিক পরিমাণে প্রয়োজন মত H_2S গ্যাস পাবার জন্য যে যন্ত্র ব্যবহার করা হয় তার নাম কিপ্‌স অ্যাপ্যারেটাস (চিত্র 16.7)
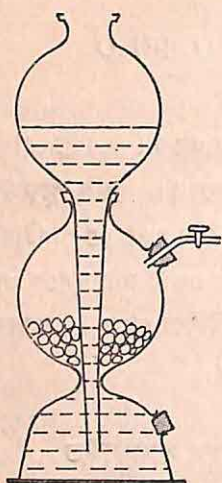
চিত্র 17.7

ধর্ম—সালফিউরেটেড হাইড্রোজেন বর্ণহীন গ্যাস, গন্ধ পচা ডিমের মত, এবং বিষাক্ত। ডিমের সাদা অংশ পচলে H_2S গ্যাস উৎপন্ন হয়। বাতাসের চেয়ে 1·2 গুণ ভারী। ঠাণ্ডা জলে সহজেই দ্রবীভূত হয় কিন্তু তাপমাত্রা বৃদ্ধির সঙ্গে দ্রবণীয়তা কমে। জলীয় দ্রবণের ঈষৎ অ্যাসিড ধর্ম আছে। বাতাসে 364°C তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করলে নীল শিখায় জ্বলে এবং শিখার মধ্যেই হাইড্রোজেন ও সালফাইড বিশ্লিষ্ট হয়ে যায়।

ব্যবহার—পরীক্ষাগারে রাসায়নিক বিশ্লেষণের জন্য H_2S গ্যাস ব্যবহার করা হয়।

প্রশ্নাবলী

প্রথম অধ্যায়

1 ভৌত রাশি বলতে কা বোঝায়? ভেক্টর ও স্কেলার রাশির পার্থক্য উদাহরণ দিয়ে বোঝাও।

2 প্রাথমিক একক ও লব্ধ একক বলতে কী বোঝায়? এস আই পদ্ধতিতে রাশির প্রতীক ও তাদের এককগুলি লেখ।

3 স্কেলের সাহায্যে বস্তুর দৈর্ঘ্য মাপার সময় কি ভাবে ভুল আসতে পারে? ভুল দূর করতে কি করবে?

4 একটি দাঁড়িপাল্লার দুই বাহু অসমান। একটি বাহু 10 cm অন্যটি 12 cm। একটি 10 g ওজনের সাহায্যে পাল্লার উভয় প্রান্ত থেকে যদি অন্য একটি বস্তুর ওজন নাও তবে দুটি মাপের পার্থক্য কত হবে?

5 নিচের লেখাগুলিতে কোনটি মাপ ও কোনটি একক বল :

10 cm, 5 ft, 100 km, 30 yd, 10^{-6}m.

6 একটি স্কেল নিয়ে তোমার হাতের মাপ নাও পরে তোমার বন্ধুর হাতের মাপ নাও। মাপগুলি কি এক? ঠিক সেইভাবে তোমার পা ও বিঘতের মাপ নাও ও বন্ধুদের পা এবং বিঘতের মাপের সঙ্গে মিলিয়ে দেখ।

7 তোমার ক্লাসঘরের পিছনের দেয়াল কত মিটার লম্বা? চোখের আন্দাজে বল। এবার একটি স্কেল নিয়ে মেপে দেখ তোমার আন্দাজ ঠিক কি না।

8 কুতব মিনারের উচ্চতা 72 m হলে কত কিলোমিটার হবে?

9 কয়েকটি পোষ্টকার্ড নিয়ে প্রত্যেকটির দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ মাপ। তাদের মাপ কি সমান?

10. নিচের দূরত্বগুলি 10-এর ঘাতে দেওয়া আছে। এগুলি 1 এর পরে শূন্য বসিয়ে প্রকাশ কর।

পৃথিবীর সবচেয়ে কাছের তারার দূরত্ব $=10^{13}$km
পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব $=1{\cdot}5\times10^{8}$km
পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরত্ব $=4\times10^{5}$km
পৃথিবীর ব্যাস $=1{\cdot}3\times10^{4}$km

11 তোমাকে একটি স্কেল দেওয়া হল। যে কোন বই-এর প্রতিটি পাতা কতখানি পুরু কি করে বলবে? (মলাট বাদ দাও।)

দ্বিতীয় অধ্যায়

1 পদার্থ ও শক্তি কাকে বলে? শক্তি কি কি রূপে প্রকাশ পেতে পারে? শক্তি এক রূপ থেকে অন্য রূপে রূপান্তরিত হতে পারে উদাহরণের সাহায্যে বল।

2 ভর ও ভার কাকে বলে? এদের মধ্যে পার্থক্য কোথায়? ভরের নিত্যতা সূত্র বলতে কি বোঝ?

3 গ্রাম এককে ভর, আর্গ এককে শক্তি এবং প্রতি সেকেণ্ডে সেণ্টিমিটারে আলোর গতিবেগ ধরে এক গ্রাম বস্তু বিলুপ্ত হলে কত শক্তি পাওয়া যাবে বার কর।

তৃতীয় অধ্যায়

1 পদার্থের তিন অবস্থা কি কি? এদের মধ্যে পার্থক্য কোথায়? 'জল, বরফ এবং জলীয় বাষ্প—একই পদার্থের তিনটি পৃথক অবস্থা মাত্র'—এই উক্তি আলোচনা কর।

2 বস্তুর গলন ও গলনাঙ্ক এবং হিমায়ন ও হিমাঙ্ক বলতে কি বোঝায়? বরফের গলনাঙ্ক এবং ন্যাপথালিনের হিমাঙ্ক কি ভাবে নির্ণয় করবে? নির্দিষ্ট গলনাঙ্ক নেই এমন কয়েকটি বস্তুর নাম কর।

3 বাষ্পীভবন বলতে কি বোঝায়? কি কি ভাবে বাষ্পীভবন হতে পারে উদাহরণসহ আলোচনা কর। যে যে কারণে বাষ্পায়ন প্রভাবিত হতে পারে তার উল্লেখ কর।

4 লীন তাপ কী, গলনের এবং স্ফুটনের লীন তাপ বলতে কি বোঝায়?

5 কি কি কারণে পদার্থের অবস্থার পরিবর্তন হতে পারে উদাহরণসহ বল।

6 যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা কর:

(a) কোন বস্তুর হিমাঙ্ক এবং গলনাঙ্ক—এই দুয়ের তাপমাত্রা এক।

(b) শীতের দেশে খুব বেশি ঠাণ্ডা পড়লে জলের পাইপ ফেটে যায়।

(c) গলনাঙ্ক, হিমাঙ্ক ও লীন তাপের উপর চাপের প্রভাব সম্বন্ধে যা জান লেখ।

7 সংক্ষেপে আলোচনা কর:

(a) বাতাস করলে বা ফুঁ দিলে গরম বস্তু তাড়াতাড়ি ঠাণ্ডা হয়। (b) হিমমিশ্রণ, (c) বাষ্পায়ন, (d) ঊর্ধ্বপাতন, (e) উদ্বায়ী বস্তু, (f) লীন তাপ

চতুর্থ অধ্যায়

1 দূরত্ব ও সরণে তফাৎ কী? দ্রুতি ও বেগে তফাৎ কী? একটি ট্রেনের গতিকে দ্রুতি বলবে না বেগ বলবে? কেন?

2 তুমি ও তোমার বন্ধু একই দিকে একই বেগে ছুটছ। প্রত্যেকের মাথায় একটি মৌমাছি বসে আছে। তোমাদের ছুটন্ত অবস্থায় মৌমাছি দুটো একে অন্যকে কিভাবে দেখতে পাবে? যদি তোমরা একই বেগে উলটো দিকে ছুটতে থাক তবে তাদের মধ্যে গতির সম্পর্ক কেমন হবে?

3 পিছল মাটিতে চলা কষ্টকর কেন ?

4 ঘোড়ার গাড়ির ঘোড়া গাড়িকে টানে, গাড়িও ঘোড়াকে টানে। তবে ঘোড়া হাঁটতে থাকলে গাড়ি চলতে থাকে কেন ?

5 লোক ভর্তি বাস খুব জোরে চলতে চলতে হঠাৎ থেমে গেলে কী হতে পারে ?

6 এক নিউটন কত ডাইনের সমান ? এক পাউণ্ডাল কত ডাইনের সমান ?

7 সরণ, বেগ, দ্রুতি ও ত্বরণ কাকে বলে ? প্রত্যেকটির একক লেখ।

8 নিউটনের গতিসূত্র কী ? উদাহরণ দিয়ে ব্যাখ্যা কর।

9 নিউটন কিসের একক ? নিউটনের সঙ্গে কিলোগ্রামের সম্পর্ক কী ?

পঞ্চম অধ্যায়

1 কাজ, ক্ষমতা ও শক্তির সংজ্ঞা লেখ। কাজের সঙ্গে শক্তির পার্থক্য কী ? জুল কাকে বলে ?

2 স্থিতিশক্তি ও গতিশক্তি বলতে কী বোঝায় উদাহরণ দিয়ে বোঝাও।

3 সমান ভরের দুটি বস্তুর একটি h এবং অপরটি 2h উচ্চতায় রাখা আছে। তাদের স্থিতি শক্তির অনুপাত কত ?

4 সমান ভরের দুটি বস্তু সমবেগে চলছে। একটির বেগ অপরটির দ্বিগুণ হলে তাদের গতিশক্তির অনুপাত কত ?

5 যন্ত্র কাকে বলে উদাহরণ দিয়ে বোঝাও। যে কোন শ্রেণীর লিভার বর্ণনা কর এবং কিভাবে যান্ত্রিক সুবিধা হয় দেখাও।

6 চাকা ও অক্ষদণ্ড এবং নত তলের কার্যপ্রণালী ছবির সাহায্যে বোঝাও।

7 এক জুল কত আর্গের সমান।

8 এক ফুট-পাউণ্ডাল কত আর্গের সমান।

9 মনে কর তুমি যেখানে আছ সেখান থেকে পৃথিবীর ব্যাস বরাবর একটি দু'ফুট ব্যাসের গর্ত করা হল, অপর প্রান্ত পর্যন্ত। একটি 5 kg ওজনের লোহার গোলক যদি ঐ গর্ত দিয়ে ফেলে দেওয়া হয় তবে গোলকটি কোথায় যাবে ?

ষষ্ঠ অধ্যায়

1 তাপমাত্রা কাকে বলে ? তাপ ও তাপমাত্রায় প্রভেদ কী উদাহরণ দিয়ে বোঝাও।

2 ডিগ্রি সেলসিয়াস মানে কী ? তাপমাত্রার অন্যান্য এককগুলি ও তাদের সম্পর্ক লেখ।

3 বস্তুর তাপগ্রাহিতা, জলতুল্যাঙ্ক এবং আপেক্ষিক তাপের মধ্যে সম্পর্ক আলোচনা কর।

4 তাপ যে শক্তির একটি রূপ উদাহরণ দিয়ে বোঝাও। তাপশক্তি থেকে যান্ত্রিক শক্তি কিভাবে পেতে পার ?

সপ্তম অধ্যায়

1 আলো কী? অপসারী ও অভিসারী রশ্মি কাকে বলে? ছবি এঁকে বোঝাও।

2 আলোর প্রভব কী? স্বপ্রভ ও অপ্রভ বস্তু কাকে বলে? নিচের বস্তুগুলির কোনটি অপ্রভ এবং কোনটি স্বপ্রভ?

(ক) শুকতারা (খ) নক্ষত্র (গ) চাঁদ (ঘ) হীরার টুকরো (ঙ) জোনাকি।

3 প্রতিফলন কাকে বলে? প্রতিফলনের সূত্র বল।

4 প্রতিফলনের সূত্র দুটি প্রমাণ করতে তোমাকে একটি সমতল দর্পণ ও দুটি দেশলাইএর কাঠি দেওয়া হল। কি ভাবে প্রমাণ করবে?

5 প্রতিফলন ও প্রতিসরণ কাকে বলে? প্রতিফলন ও প্রতিসরণের মধ্যে প্রভেদ কী?

6 নিয়মিত ও বিক্ষিপ্ত প্রতিফলন কাকে বলে? কোন ধরনের তলে আলোর প্রতিফলন বেশি?

7 কোন বস্তু যদি আলো প্রতিফলিত না করে তবে কি বস্তুটিকে দেখা যাবে?

8 (a) যদি দর্পণকে স্থির রেখে তুমি দর্পণের দিকে এগিয়ে যাও তবে প্রতিবিম্ব কোন দিকে ও কি বেগে এগিয়ে যাবে? ছবি এঁকে উত্তর দাও।

(b) যদি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে দর্পণকে তোমার দিকে নিয়ে আস তবে প্রতিবিম্ব কোন দিকে ও কত বেগে এগিয়ে যাবে? ছবি এঁকে উত্তর দাও।

9 লেন্স কাকে বলে? লেন্সের সঙ্গে সমতল কাচের তফাৎ কোথায়? উত্তল ও অবতল লেন্স কাকে বলে? তোমাকে একটি উত্তল ও একটি অবতল লেন্স দেওয়া হল। লেন্সের গায়ে হাত না বুলিয়ে কি ভাবে বলবে কোনটি কি লেন্স?

10 বক্রতা-কেন্দ্র, আলোক-কেন্দ্র, প্রধান অক্ষ, ফোকস, ফোকস-দূরত্ব কাকে বলে? ছবি এঁকে বোঝাও।

11 একটি উত্তল লেন্সের ফোকস দূরত্ব ছবি এঁকে দেখাও।

তোমাকে একটি উত্তল লেন্স ও একটি স্কেল দেওয়া হল। কি ভাবে ফোকস-দূরত্ব বার করবে?

12 শক্তি কাকে বলে? আলো এক ধরনের শক্তি, উদাহরণ দিয়ে বল।

13 তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য কাকে বলে? তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের এককের নাম কী ও এককটির মিটার এককে মান কত? কম্পাঙ্ক কাকে বলে? আলোর গতিবেগ কত?

14 বর্ণালী কাকে বলে? বিচ্ছুরণ কি কারণে ঘটে? পরীক্ষাগারে কি ভাবে বর্ণালী তৈরি করতে পারবে?

15 স্বচ্ছ ও অনচ্ছ বস্তু কি কারণে রঙীন দেখায়? লাল আলোয় একটি লাল ও একটি হলুদ ফুলকে কেমন দেখাবে?

অষ্টম অধ্যায়

1 কেলাসিত ও অকেলাসিত বস্তু কাদের বলে? বন্ধনশক্তি বলতে কি বোঝ?

2 'কোন কেলাসিত বস্তুর গলনাঙ্ক ও হিমাঙ্ক একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রা'—আলোচনা কর ; অকেলাসিত বস্তুর নির্দিষ্ট গলনাঙ্ক বা হিমাঙ্ক নেই কেন?

নবম অধ্যায়

1 অজানা কোন পদার্থকে কিভাবে সনাক্ত করা যেতে পারে? পদার্থের ভৌত এবং রাসায়নিক ধর্ম বলতে কি বোঝায়?

2 পদার্থের ভৌত এবং রাসায়নিক পরিবর্তন সম্পর্কে উদাহরণসহ আলোচনা কর।

3 ভৌত এবং রাসায়নিক পরিবর্তনের তুলনা কর।

4 উদাহরণসহ আলোচনা কর :

(a) অনুঘটক ও তার কাজ, (b) তাপগ্রাহী ও তাপমোচী রাসায়নিক বিক্রিয়া।

দশম অধ্যায়

1 মৌল বা মৌলিক পদার্থ কাকে বলে? চোখের সামনে আমরা যেসব পদার্থ দেখি, তারা সবই কি মৌলিক? আজ পর্যন্ত পাওয়া গিয়েছে এমন মৌলের সংখ্যা কয়টি?

2 যৌগ বা যৌগিক পদার্থ কাকে বলে? যৌগের সঙ্গে মিশ্রণের পার্থক্য কী? মিশ্রণ এবং দ্রবণ কি এক? বায়ু মিশ্রণ মৌল না যৌগ?

3 ধাতু এবং অধাতু বলতে কি বোঝ? এদের পার্থক্যগুলি বল। সংকর ধাতু কী? 'পান' দেওয়া কাকে বলে?

4 উদাহরণ সহ আলোচনা কর :

(ক) যোজ্যতা, (খ) মূলক, (গ) অণু ও পরমাণু।

একাদশ অধ্যায়

1 দ্রবণ বলতে কি বোঝায়? দ্রবণ কত রকম হতে পারে? দ্রবণের সঙ্গে দ্রাব ও দ্রাবকের সম্পর্ক কী? জলকে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ দ্রাবক বলা হয় কেন?

2 সম্পৃক্ত ও অসম্পৃক্ত দ্রবণ কাকে বলে? সম্পৃক্ততার সঙ্গে দ্রবণীয়তার কোন সম্পর্ক আছে? লবণের দ্রবণীয়তা 36·3 বলতে কি বোঝায়? দ্রবণীয়তার উপর তাপের প্রভাব সম্পর্কে কী জান?

দ্বাদশ অধ্যায়

1 প্রতীক-চিহ্ন ও সংকেত বলতে কি বোঝায়? কয়েকটি রাসায়নিক সমীকরণের উদাহরণ দাও। এই সমীকরণে কিভাবে প্রতীক-চিহ্ন এবং সংকেতের ব্যবহার হয়েছে তার আলোচনা কর।

2 রাসায়নিক সমীকরণে কিভাবে সমতা রক্ষা করা হয় উদাহরণ সহ আলোচনা কর।

3 রাসায়নিক সমীকরণের সাহায্যে কি কি বিষয় জানান যায় এবং কি কি প্রকাশ করা যায়না?

4 উদাহরণ সহ আলোচনা কর :

(ক) যোজ্যতা (খ) মূলক

ত্রয়োদশ অধ্যায়

1 তড়িৎ পরিবাহী হিসাবে তামা সর্বশ্রেষ্ঠ—এই কথা বললে কি বোঝায়? তড়িদ্ বিশ্লেষণ কাকে বলে? আয়ন ও আয়নন বলতে কী বোঝ? ক্যাটায়ন এবং অ্যানায়ন—এদের পার্থক্য কোথায়?

2 জলে তড়িৎ প্রবাহের প্রভাব বলতে কি বোঝায়? জলকে ইলেকট্রোলাইট বলা সম্পর্কে তোমার মতামত কি?

3 তড়িৎ লেপন কি ভাবে হয়? গিল্টি করা কাকে বলে?

চতুর্দশ অধ্যায়

1 অ্যাসিডের ধর্ম কী? অ্যাসিডের সঙ্গে ক্ষারকের কি সম্পর্ক আছে? কোনটা অ্যাসিড এবং কোনটা ক্ষারক কিভাবে জানা যায়? অ্যাসিড ও ক্ষারকের পার্থক্য কি কি?

2 লবণ বলতে সাধারণত আমরা কি বুঝি? কিভাবে লবণ তৈরি হয়? কয়েকটি খুব পরিচিত লবণের নাম কর। প্রশমন কাকে বলে?

3 দোলের সময় তোমরা অনেকেই 'ভ্যানিশিং কালার' ব্যবহার কর। এই রঙ তৈরি হয় অ্যামোনিয়ম হাইড্রক্সাইডের সঙ্গে ফেনফথ্যালিনের বিক্রিয়ায়। রঙ উবে যায় কেন—বল দেখি?

পঞ্চদশ অধ্যায়

1 জারণ ও বিজারণ বলতে কি বোঝায়? এদের মধ্যে পার্থক্য কি কি তুলনামূলকভাবে দেখাও।

ষোড়শ অধ্যায়

1 তরল বায়ু বলতে কি বোঝায়? তরল বায়ু তৈরির যন্ত্র প্রথম কে আবিষ্কার করেন? কি ভাবে বায়ুকে তরল করা হয়?

2 বায়ুমণ্ডলে নাইট্রোজেনের সমতা রক্ষার সার্থকতা কি? কি ভাবে সমতা রক্ষা হয়?

3 কি ভাবে বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাইঅক্সাইডের সমতা রক্ষা চলে? সমতা রক্ষা না হলে কি হত?

4 বিরল গ্যাস কি? বায়ুমণ্ডলের কি কি বিরল গ্যাস আমাদের কোন্ কোন্ প্রয়োজনে লাগে?

সপ্তদশ অধ্যায়

1 কি উপায়ে নিচের লেখা গ্যাসগুলি প্রস্তুত করা হয়? তাদের ধর্ম এবং ব্যবহার লেখ।
(ক) অক্সিজেন, (খ) নাইট্রোজেন, (গ) অ্যামোনিয়া, (ঘ) কার্বন ডাইঅক্সাইড, (ঙ) সালফার ডাইঅক্সাইড (চ) সালফিউরেটেড হাইড্রোজেন।

2 উদাহরণ সহ সংজ্ঞা নির্দেশ কর:
(ক) অনুঘটক, (খ) অক্সি-হাইড্রোজেন শিখা, (গ) অন্তর্ধৃতি, (ঘ) নিষ্প্রাণ বায়ু বা তাপবায়ু, (ঙ) স্মেলিং সল্ট (চ) বিষাক্ত উপত্যকা, (ছ) সোডা ওয়াটার, (জ) বিরঞ্জক পদার্থ।

———

পরিশিষ্ট

বৈজ্ঞানিক শব্দকোষ

অকেলাসিত noncrystalline
অক্ষ axis অক্ষদণ্ড axle সমাক্ষ cc-axial
অজৈব inorganic
অণু molecule
অধাতু nonmetal
অনচ্ছ opaque
অনুঘটক catalyst
অনুপাত ratio
অনুভূমিক horizontal
অন্তর্ধৃতি occlusion
অপচয় dissipation
অপসারী divergent
অপ্রভ nonluminous
অবস্থা state
অবস্থার রূপান্তর change of state
অভিলম্ব normal
অভিসারী convergent
আর্কিমিডিস Archimedes (287-212 B. C,)
আর্গ erg
আপতন incidence.—বিন্দু point of incidence
আরহেনিয়াস Arrhenius, Svante August (1859—1927)
আলবার্ট আইনষ্টাইন Einstein, Albert (1879—1955)
আলম্ব fulcrum
আলোক কেন্দ্র optical centre
আলোক চক্র optical disc
আলো, আলোক light. —রশ্মি ray of light. —গুচ্ছ beam of light. —সঞ্চরণ propagation of light
আয়তন volume
আয়ন ion
আয়নন ionisation. তাপ—thermal—
অ্যানায়ন anion
অ্যামরফাস amorphous
অ্যাম্পিয়র Ampere
অ্যাসিড acid. খনিজ —mineral—. গাঢ়—concentrated—. লঘু—dilute—
ইণ্টারন্যাশনাল ব্যুরো অফ ওয়েটস অ্যাণ্ড মেজারস International Bureau of weights & measures
ঈষদচ্ছ translucent
উদ্বায়ী volatile
উপগ্রহ satellite
উল্ফ বোতল Woulf's bottle
উর্ধ্বপাতন sublimation
একক unit. প্রাথমিক—fundamental—, ব্রিটিশ থার্মাল— British Thermal—. লব্ধ — derived—. সি জি এস ইলেক্‌ট্রোম্যাগনেটিক— C. G. S. electromagnetic—. সি জি এস ইলেকট্রোষ্ট্যাটিক— C. G. S. electrostatic—.
একক পদ্ধতি System of units. এফ পি এস— F. P. S.—. এম কে এস এ— M. K.S.A.—. এস আই—S.I. —. জর্জি— Georgi—. মেট্রিক— Metric—. সি. জি এস— C G. S.—

ওজন, ভার weight
ওজনের বাক্স—weight box
ওলাউ রোমার Roemer, Olau (1644—1710)
ওলন দড়ি plumb line
ওয়াট watt
ওয়েল্ডিং welding
কম্পাঙ্ক frequency
কাউন্ট রামফোর্ড Rumford, Count Benjamin Thompson (1753-1814)
কিউসেক cusec
কিপস অ্যাপ্যারেটস Kipps apparatus
কিলোওয়াট-ঘণ্টা kilo-watt-hour
কেন্দ্রীণ বিক্রিয়া nuclear reaction
কেলভিন kelvin
কেলাস crystal
কোণ angle. আপতন— incident—. চ্যুতি— angle of deviation. প্রতিফলন— —of reflection. প্রতিসরণ— —of refraction. সংকট— critical—
কোষ cell তড়িৎ— electric—. আলোক-তড়িৎ— photo-electric—
ক্যাণ্ডেলা candela
ক্যালরিক মতবাদ caloric theory
ক্যাটায়ন cation
ক্যালিপার্স callipers. অন্তর্মুখী—inside—. বহির্মুখী— outside—
ক্লোরোফিল chlorophyll
ক্রান্তীয় বছর tropical year
ক্রিষ্টিয়ান হয়গেনস্ Huygens, Christian (1625-95)
ক্রিয়া action. প্রতি— reaction
ক্ষমতা power. অশ্ব— horse—
ক্ষার alkali. —মৃত্তিকা alkaline earth
ক্ষারক base
ক্ষারীয় দ্রবণ alkaline solution
ক্ষুরধার ত্রিভুজ knife edge
ক্ষেত্রফল area
গতি motion. আপেক্ষিক— relative—. পরম— absolute—. —শক্তি kinetic energy
গলন melting
গলনাঙ্ক melting point
গোলক sphere
গ্যালন gallon
গ্রাফাইট graphite
চক্র cycle. কার্বন— carbon—. নাইট্রোজেন— nitrogen—.
চোঙ নল cylinder
ছক কাগজ graph paper
জন ড্যাল্টন Dalton, John (1766-1844)
জন লক Locke, John (1632-1704)
জল-তুল্যাঙ্ক water equivalent
জড়তা inertia
জারণ oxidation
জাড্য inertia
জাড্য ভর inertial mass
জুল Joule
জেমস প্রেস্কট জুল Joule, James Prescott (1818-1889)
জৈব organic
ডিভাইডার divider
তরঙ্গ wave
তরঙ্গদৈর্ঘ্য wave length. তড়িচ্চুম্বকীয় —electromagnetic—. রেডিও—radio—
তল plane. অনুভূমিক— horizontal—. উল্লম্ব—vertical —. নত— inclined—
তড়িৎ লেপন electroplating.
তড়িদ্-অবিশ্লেষ্য non-electrolyte
তড়িদ্-দ্বার electrode
তড়িদ্-প্রবাহ electric current

তড়িদ্-বিশ্লেষণ electrolysis

তড়িদ্-বিশ্লেষ্য electrolyte

তাপ heat. আপেক্ষিক— specific—.

তাপগ্রাহিতা thermal capacity

তাপমাত্রা temperature

তামার চোকলা copper turnings

তুলা/যন্ত্র balance সাধারণ— common—.
স্প্রিং— spring—. সুবেদী— sensitive—.
ফিজিক্যাল— physical—

তুল্যমূল্যতা equivalence

ত্বরণ acceleration. অসম— non-uniform—. গড়— average—. সম— uniform—.

ত্রুটি error. ব্যক্তিগত— personal—.
যান্ত্রিক— instrumental—

থার্ম therm

থার্মোকাপল thermocouple

থার্মোপাইল thermopile

থার্মোমিটার thermometer. ডাক্তারী— clinical—.

দীপ lamp, burner. বুনসেন— Bunsen—.
স্পিরিট— spirit—.

দীপন শক্তি luminous intensity

দ্রবণ solution. অসম্পৃক্ত— unsaturated—. সম্পৃক্ত— saturated—

দ্রবণীয়তা solubility

দ্রুতি speed. অসম— nonuniform—.
গড়— average—. সম— uniform—.

দ্রাব solute

দ্রাবক solvent

ধর্ম property. ভৌত— physical—.
রাসায়নিক— chemical—.

ধাতু metal. অ— non—. সংকর—alloy—.

নব knob

নভশ্চর astronaut

নল tube. নির্গম— delivery—.

নিত্যতা সূত্র law of conservation.
ভরের— —of mass. শক্তির— —of energy
ভর ও শক্তির— — of mass and energy.

নিষ্ক্রিয় গ্যাস inert gas

পদার্থ, বস্তু matter

পরমাণু atom

পরিবাহী conductor. অতি— super—

পাতন distillation. অন্তর্ধূম— destructive—. আংশিক— fractional—

পুনঃশিলীভবন regelation

প্রতিফলন reflection. অনিয়মিত— irregular—. আভ্যন্তরীণ পূর্ণ— total-internal—. নিয়মিত— regular—. বিক্ষিপ্ত— irregular—.

প্রতিসরণ refraction

প্রতিসরাঙ্ক refractive index

প্রতিসম symmetrical

প্রতীকচিহ্ন symbol

প্রধান অক্ষ principal axis

প্রমাণ standard.—চাপ—pressure.—তাপমাত্রা—temperature. —মিটার —metre

প্রশমন neutralisation

প্রশমিত neutralised

প্রসারণ expansion

প্রয়োগ বিন্দু point of application

প্রিজম prism

প্লাজমা plasma

প্লেটো Plato (? 427-347 B. C.)

প্রিস্টলি Priestley, Joseph (1733-1804)

ফানেল funnel. দীর্ঘনল— thistle—.

ফারেনহাইট fahrenheit

ফুট পাউণ্ডাল foot poundal

ফ্রান্সিস বেকন Bacon, Francis (1561-1626)

ফ্রেঞ্চ আকাদেমি French Academy
ফেনফথ্যালিন Phenolphthalein
ফোকস focus
ফোকস দূরত্ব focal length
বক্রতা curvature.—কেন্দ্র centre of—
—ব্যাসার্ধ radius of—,
বর্তনী circuit তড়িদ্‌-বর্তনী electric—
বর্ণালী spectrum
বাতচক্র wind mill
বাহু arm, ভার— load—
প্রয়াস— effort—.
বাষ্পায়ন evaporation
বাষ্পীভবন vaporisation
বিকিরণ radiation. —শক্তি —energy
বিক্রিয়া reaction. তাপগ্রাহী —endothermic—. তাপমোচী— exothermic—. পারমাণবিক— nuclear—. রাসায়নিক— chemical—.
বিক্ষেপণ scattering
বিচ্ছুরণ dispersion
বিচ্যুতি deviation
বিজারণ reduction
বিপর্যয় inversion. পার্শ্বীয়— lateral—
বিবর্ধক কাচ magnifying lens
বিবর্ধন magnification. রৈখিক— linear—
বিম্ব image. সদ্‌—real—. অসদ্‌—virtual—
বিরল গ্যাস rare gas
বিরঞ্জক দ্রব্য bleaching agent
বেগ velocity. অসম— non-uniform—. গড়— average— সম— uniform—.
বেভেল্‌ড স্কেল bevelled scale
বৃহস্পতি Jupiter
ভর mass. জাড্য— inertial—. মহাকর্ষজ— gravitational—.
ভরবেগ momentum
ভার weight, load. —বাহু load arm
ভেক্টর রাশি vector quantity
ভৌত physical. —ধর্ম —property
—পরিবর্তন— change
রাশি—quantity
ভ্রামক moment. বলের— — of a force
মন্দন retardation, deceleration
মহাবিষুব বিন্দু vernal equinoctical point
মরীচিকা mirage
মাইকেলসন Michelson, Albert Abraham (1852-1931)
মান magnitude, value. গড়— mean—
ম্যাগনেটো হাইড্রোডাইনামিক পাওয়ার বা এম এচ ডি magneto-hydrodynamic power or M H D
মিথাইল অরেঞ্জ Methyl orange
মিশ্রণ mixture
মূলক radical
মোল mole
মৌল element
যান্ত্রিক তুল্যাঙ্ক mechanical equivalent
যান্ত্রিক মতবাদ mechanical theory
যান্ত্রিক সুবিধা mechanical advantage
যোজ্যতা valency
যৌগ compound
রবার্ট হুক Hooke, Robert (1635-1703)
রশ্মি ray. অতিবেগুনি— ultraviolet—. অপসারী—diverging—. অবলোহিত—infrared—. অভিসারী— converging—. আপতিত— incident—. একবর্ণ—monochromatic—.
একস্‌-রে—X-ray. গামা— gamma—. প্রতিফলিত— reflected—

প্রতিসৃত— refracted—. মহাজাগতিক— cosmic—. একবর্ণ— monochromatic—, সমান্তরাল— parallel—.
রাদারফোর্ড Rutherford, Ernest (1875-1937)
রাশি quantity. ভেক্টর— vector.— ভৌত— physical—.স্কেলার— scaler—.
রাসায়নিক chemical.—ধর্ম —property— পরিবর্তন —change
রিঅ্যাক্টর reactor
লবণ Salt
লাপ্লাস Laplace, Pierre Simon (1749-1827)
লাভয়সিয়ে Lavoisier, Antoine Laurent (1743-94)
লিভার lever
লীন তাপ latent heat
লেখ graph.
লেন্স lens. অবতল— concave—.অপসারী — diverging—. অবতল— convex—. অভিসারী—converging—. —পাওয়ার power of the lens.
লিটার litre
শক্তি energy. গতি— kinetic—. স্থিতি —potential—. বন্ধন—binding—
শংকু cone
শিখা flame, অক্সি-অ্যাসিটিলিন— oxy-acetylene—. অক্সি-হাইড্রোজেন— oxy-hydrogen—.
শীলি Scheele, Karl Willhelm (1742-1786)
সমীকরণ equation
সরণ displacement
সংকুচিত compressed
সংকেত formula
সংনমিত compressed
সান্দ্র viscous
সার্ভেয়ার চেন surveyor's chain
সি ভি রামন: Raman, C. V. (1888-1970)
সূচক (প) pointer
—(র) indicator
সূত্র law
নিউটনের গতিসূত্র – Newton's laws of motion
সেলসিয়াস celcius
সোরা nitre
স্কেলার রাশি scaler quantity
স্টপ ওয়াচ stop watch. —ক্লক —clock
স্ট্যাণ্ডার্ড ডিপার্টমেন্ট অফ বোর্ড অফ ট্রেড Standard Department of Board of Trade
স্পন্দন vibration
স্ফুটন boiling
স্ফুটনাঙ্ক boiling point
স্বচ্ছ transparent
স্বপ্রভ luminous
স্থিতি rest. আপেক্ষিক— relative—. পরম— absolute—.—শক্তি potential energy
স্থিতিস্থাপক elastic
স্থিতিস্থাপকতা elasticity
স্থিরাঙ্ক fixed point. উচ্চ— upper— নিম্ন—lower—
হামফ্রে ডেভি Davy, Humphrey (1778-1829)
হিম মিশ্রণ freezing mixture
হিমায়ন freezing
হিমাঙ্ক freezing point
হিমোগ্লোবিন haemoglobin